পটুয়া সংস্কৃতি
পরম্পরা ও পরিবর্তন

ড. দীপককুমার বড় পণ্ডা

• পরিবেশক •

পুস্তক বিপণি

২৭ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা ৭০০ ০০৯

দূরভাষ ঃ ২৪১৬৯৮৯

PATUA SANSKRITI : PARAMPARA-O-PARIBARTAN
(A unique volume of Anthropological, Sociological, Historical & Folklore Studies on Pat Patua & Pater Gan of West Bengal)
by Dr. Dipak Kumar Bara Panda, Ph.D

প্রথম প্রকাশ ঃ আগস্ট, ১৯৯৯

প্রকাশক ঃ কমলাপ্রসাদ ভট্ট

প্রচ্ছদ ঃ আশিস দত্ত

আলোকচিত্র ঃ লেখক

মুদ্রণ ঃ গণ প্রকাশনী

১৭৬-এইচ, নেতাজী কলোনি

কলিকাতা-৯০

ফোন ঃ ৫৫৭-০৫৪৮

উৎসর্গ

ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী

ব্রজমোহন বড় পণ্ডা, ননীগোপাল রায়

ডঃ শচীন্দ্রনাথ বড় পণ্ডা

—শ্রীচরণেষু

পরিচায়িকা

নিয়মিতভাবে যে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লেখে, বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যে সক্রিয়ভাবে যুক্ত, নানা সভা-সমিতিতে যাকে নিয়মিত দেখা যায় অংশগ্রহণ করতে, তাকে আলাদা করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। কেন না নিজের কাজের সুবাদেই সে ইতিমধ্যে-পরিচিতি করায়ত্ত করেছে। তবু শ্রীমান দীপক বড় পণ্ডার সম্বন্ধে দ্'চার কথা লিখতে উদ্বুদ্ধ হয়েছি কেন, তা বলি।

শ্রীমান দীপক বড় পণ্ডা কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসংস্কৃতি বিভাগের একেবারে প্রথম দিকের ছাত্র। কৃতী ছাত্র সে। অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং অনুসন্ধিৎসু। প্রথমাবধিই তার মধ্যে একটা গবেষক-সুলভ মানসিকতার পরিচয় জাগ্রত থাকতে দেখেছি। লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানে এম এ করে সে অনিবার্যভাবে বাংলার পটশিল্প নিয়ে গবেষণায় ব্রতী হয়। আবাল্য পট-প্রেম তাকে এই বিষয়ে গবেষণায় প্রণোদিত করেছে। এ নিছক পি এইচ ডি ডিগ্রী শিকার নয়, কোনো বৈষয়িক তাড়নাও এক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল না, অবিমিশ্র পট শিল্পের অনুরাগই শ্রীমান বড় পণ্ডাকে এই বিষয়ে আকৃষ্ট করেছে।

আমরা জানি পট শিল্প সুপ্রাচীন। তবু নির্মম সত্য হল পট শিল্পের উদ্ভবের কারণ অদ্যাবধি অজ্ঞাত রয়ে গেছে। অবশ্য বৈদিক ভাষায় পট শব্দটি উল্লিখিত রয়েছে, অবশ্যই তা 'বস্ত্র' অর্থে. চিত্র অর্থে শব্দটির প্রয়োগ পাই খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে, মহাভারতে এবং কাত্যায়ন সূত্রে। বৈয়াকরণ পাণিনির 'অষ্টম অধ্যায়ী'তে পটুয়ার প্রসঙ্গ এসেছে। খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকে পরিব্রাজক ফা-হিয়েন তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে কাপড়ে চিত্রিত ভগবান বুদ্ধের যে চিত্রের উল্লেখ করেছেন তা যে আসলে পটচিত্র তা বলাবাহুল্য মাত্র। অষ্টম শতকে রচিত বিশাখ দত্তের 'মুদ্রারাক্ষসে' উল্লিখিত রয়েছে চন্দ্রগুপ্তের মহামন্ত্রী চাণক্য কিছু সাপুড়িয়া ও পটুয়াকে গুপ্তচর রূপে নিয়োগ করেছিলেন। চাণক্য যখন এই নিয়োগ করেন, সেটা গুপ্ত যুগের ব্যাপার অর্থাৎ খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের ঘটনা। এহেন প্রাচীন পটচিত্রের বিষয়ে বহু গবেষক, অনুসন্ধিৎসু দীর্ঘকালব্যাপী আলোচনা করে আসছেন। প্রথমত গুরুসদয় দত্তের 'পটুয়াসঙ্গীত' (১৯৩৯), পটুয়াসঙ্গীত ও পটশিল্প নিয়ে রচিত প্রথম গ্রন্থ। পট শিল্প নিয়ে অথবা পটুয়া সঙ্গীত নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন পল্লীকবি জসীমউদ্দীন, সমাজতাত্ত্বিক বিনয় ঘোষ, শিল্পী যামিনী রায়, লোকসংস্কৃতিবিদ্ আশুতোষ ভট্টাচার্য, লোকশিল্প সমালোচক কল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, সুধাংশু কুমার রায়, প্রদ্যোত ঘোষ, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয় ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ ঘোষ, অশোক ভট্টাচার্য প্রমুখ। তালিকা বাড়িয়ে আর লাভ নেই। এখন প্রশ্ন হল এমন বহু আলোচিত বিষয় নিয়ে শ্রীমান বড় পণ্ডা পুনরায় একটি গ্রন্থ রচনা করলেন কেন? এই প্রথম পটশিল্প নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা গ্রন্থ রচিত হল। দ্বিতীয়ত এ পর্যন্ত পট শিল্প সম্পর্কিত আলোচনায় কেউ বা জোর দিয়েছেন পট শিল্পের উপর, কেউ বা পটুয়া সঙ্গীতের উপর, অথচ পট পটুয়া-পটের গান এই ত্রি বিষয়ে আলোচনা না করেকে কখনই পট সম্পর্কিত

আলোচনা পূর্ণতা পেতে পারে না। সুখের বিষয় শ্রীমান দীপক মূলত এই ত্রি-বিষয়কে সামনে রেখে আনুপূর্বিক সমস্ত বিষয়ে আলোকপাত করেছে। লোকশিল্পের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে আলোচনার সূত্রপাত তার সমাপ্তি টানা হয়েছে বাংলার বাইরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের পটচিত্র সম্পর্কিত আলোচনায়। দীপক পটশিল্পের প্রাচীনত্ব নিরূপণ করেছে, পটের শ্রেণীবিভাগ ও প্রস্তুতি কৌশল, পটের শিল্পশৈলী, কালীঘাট পটের বৈশিষ্ট্য, পটের নান্দনিকতা, পটচিত্রের আলোকে সমাজজীবন, গণমাধ্যম রূপে পটের ভূমিকা, যামিনী রায়ের চিত্রে পটের প্রভাব এসব আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আলোচিত হয়েছে পট সম্পর্কিত আলোচনার ইতিহাস। বিভিন্ন সংগ্রহশালায় পটের সংগ্রহ বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে।

পটুয়াদের বাদ দিয়ে পট শিল্পের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকতে বাধ্য। লেখক তাই এই বিষয়েও সমধিক গুরুত্ব দিয়েছে। পটুয়াদের নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে। প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েকজন পটুয়ার কথাও উপস্থাপিত হয়েছে। পটুয়া সঙ্গীতের সাহিত্যিক ও সাঙ্গীতিক আলোচনাও স্থান পেয়েছে বর্তমান গ্রন্থটিতে। কিছু পটুয়া সঙ্গীতও সংকলিত হয়েছে গ্রন্থটিতে। এককথায় একটি গ্রন্থে পট পটুয়া পটের গান সম্পর্কিত সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদত্ত হওয়ায় লেখক একটি গুরুতর প্রয়োজন মিটিয়েছে স্বীকার করতে হয়। নবীন গবেষকের কৃতিত্ব এইখানে যে কেবল প্রয়োজনীয় তথ্যসম্ভার উপস্থিত করেই কর্তব্য শেষ করেনি, নিজ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত সে সব তথ্য বিচার ও বিশ্লেষণ করেছে। এক্ষেত্রে গবেষক ও রসিকের দ্বৈত সত্তার অসাধারণ সমন্বয় সাধিত হয়েছে। প্রসন্ন চিত্তে তাই এই নবীন গবেষককে সাধুবাদ জানাই। লোকশিল্পপ্রেমী মানুষের কাছে গ্রন্থটি সাদরে গৃহীত হবে বলে বিশ্বাস পোষণ করি।

জন্মাষ্টমী, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ

বরুণকুমার চক্রবর্তী
বিভাগীয় প্রধান
লোকসংস্কৃতি বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

নিবেদন

পট ও পটুয়ার উৎপত্তি এবং বিকাশ সুদূর অতীতের গভীরে নিহিত থাকলেও এই শিল্প ও শিল্পীদের সম্পর্কে প্রাজ্ঞজনের সামগ্রিক চেতনা কিন্তু দীর্ঘদিনের নয়। কালের ঢেউ—রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি উপপ্লবের ঢেউ বয়ে চলেছে পট এবং পটুয়াদের উপর দিয়ে। বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনায় পটুয়াদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টিও খুব বেশি দেখা যায়নি। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে Rishley রচিত The People of India-তে পটুয়াদের কোন উল্লেখই নেই। পরবর্তীকালের উল্লেখযোগ্য পুস্তক J. H Hutton রচিত Caste In India (১৯৪৬) -তেও চিত্রকর জাতি সম্পর্কে কোন কথাই বলা হয়নি, যদিও এই পুস্তকটি ভারতীয় জাতি এবং জাতিভিত্তিক পেশাসমূহের উপর রচিত হয়েছিল। তবে এর পরবর্তীকালের জনগণনার বিবরণগুলোতে পটুয়া জাতিদের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। বর্তমানকালেও পটুয়াদের প্রতি বঞ্চনার শেষ নেই। নানাদিক থেকে তাঁরা অত্যাচারের শিকার। পটুয়ারা ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন তাঁদের পৈতৃক ভিটে, বাড়ি, আত্মীয়-স্বজন। অথচ তাঁরা শিল্পী—বাংলার পল্লীর পর্ণকুটির থেকে শহর-নগরের পল্লীতে-পল্লীতে পটশিল্পীর তুলির টান আজও অব্যাহত। পটুয়াদের প্রতি এই সমাজের অমানবিকতা আমাকে পীড়া দিয়েছিল। তাঁরা শিল্পী—তাঁরা মানুষ—তাঁরা তাঁদের প্রাপ্য সম্মান পাবেন—এই ছিল আমার আশা। এর জন্য পটশিল্পের উৎকর্ষ বিচারের সঙ্গে সঙ্গে পটুয়াদের সমাজ-সাংস্কৃতিক জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবলীর প্রতি আলোকপাত-এর আবশ্যিকতা উপলব্ধি করেছিলাম। এই বাসনার ফসল এই গ্রন্থ।

গবেষণাকার্য চালানোর সময় আমরা পূর্ববর্তী গবেষক ও পটপ্রেমীদের দেওয়া তথ্য, মন্তব্য, কিছু জীবিত পটুয়ার পট ও বিভিন্ন কর্মশালায়, সংগ্রহশালায় প্রদর্শিত, আলোচিত পট ইত্যাদি থেকে সাহায্য নিয়েছি। আমাদের আলোচনার সর্বত্রই সেই আলোচক মনীষীদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছি ও তাঁদের ঋণ সশ্রদ্ধচিত্তে স্বীকার করেছি। তাঁদের প্রয়াস আমাদের উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছে।

পরবর্তীকালে হয়ত সুপ্রাচীন পট আবিষ্কৃত হবে; পট, পটুয়া সংক্রান্ত আলোচনায় হয়ত আরো অনেকে অগ্রসর হবেন। এই মৃতপ্রায় শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার উৎসাহে ও ইচ্ছায় যদি কেউ এগিয়ে আসেন তবেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা জরুরি মনে করি। আজ ভারতবর্ষ সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে মত্ত। এক সম্প্রদায় আর এক সম্প্রদায়ের বিষয়ে অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছে। কিন্তু পটুয়া সম্প্রদায়—তাঁরা তো সাংস্কৃতিক সংঘাত সমন্বয়ের ধারায় নিজেদের টিকিয়ে রেখেছেন। হিন্দু মুসলমান সব ধর্মের মানুষকেই আপন করে নিয়েছেন। নিজেদের ব্যবহারিক জীবনেও বিশেষ কোন সম্প্রদায় তেমন প্রভাব ফেলেনি। যিনি নামাজ পড়তে মসজিদে যান, তিনিই আবার শীতলার পূজা করেন। এই হিন্দু মুসলমান দ্বিমুখী জীবনদর্শনের দ্যোতনা আমাদের কি কোনভাবেই ভাবায় না? একটি ক্ষুদ্র পটুয়া সম্প্রদায়ের থেকে কি এই বৃহৎ ভারতবর্ষ কোন শিক্ষা নিতে পারে না? আবার নতুন করে ভাবার সময় এসেছে—আর সংঘাত নয়, পটুয়ারা হোক আমাদের পথপ্রদর্শক।

একটি ক্ষেত্রানুসন্ধাননির্ভর গবেষণার পেছনে অনেকের অবদান থাকে। বাস্তবিক এই গবেষণা কাজটি করতে গিয়েও আমাকে অনেকের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। প্রথমেই আমি যাঁদের সম্বন্ধে গবেষণা, সেই পটুয়াদের কথা বলব—দিনের পর দিন যাঁদের সঙ্গে থেকেছি—বিভিন্ন প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেছি—যখন তখন পটের গান শুনতে চেয়েছি, কিন্তু তাঁরা বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি, বিব্রত হননি। বরং খুশি হয়েই আপন করে নিয়েছেন, নিজের অজান্তে কখন ওদেরই একজন হয়ে গেছি। সারা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সবকটি পটুয়া পল্লীতেই ক্ষেত্রানুসন্ধানে যেতে হয়েছে! সর্বত্রই একই চিত্র। অনেক জায়গাতেই পটুয়াদের সঙ্গে রাত্রিবাসও করেছি। এই সুযোগে সেই পটুয়াদের, আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই। আর এক জনের কথা বলব যাঁর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা এবং তত্ত্বাবধান ছাড়া এ গ্রন্থ প্রকাশ হত না, তিনি হলেন আমার শিক্ষাগুরু কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসংস্কৃতি বিভাগের প্রধান ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী। তাঁর তৎপরতায় আমার পক্ষে এই কাজ শেষ করা সম্ভব হল। এই গবেষণায় আমার পিতৃব্য ড. শচীন্দ্রনাথ বড় পণ্ডার অবদান অনেকখানি।গবেষণার পক্ষে উপযুক্ত একটি পরিবেশে বসবাসের সুযোগ দিয়ে গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে যিনি আমাকে সব থেকে বেশি সাহায্য করেছেন, তিনি হলেন আলিপুর বার্তা এবং নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র সম্পাদক তরুণভূষণ গুহ। এই সূত্রে শ্রীমতী সুজাতা গুহ-র কথাও সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি। এঁরা নিরন্তর উৎসাহ জুগিয়েছেন। ঠাকুরপুকুরে গুরুসদয় সংগ্রহশালার গ্রন্থাগারটি ব্যবহার করার সুযোগ করে দেওয়া ছাড়াও নানাভাবে সাহায্য করেছেন এখানকার কিউরেটর আশিস চক্রবর্তী। অন্য কর্মীরাও বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। এছাড়াও বিভিন্নভাবে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁরা হলেন ঃ ড. দুলাল চৌধুরী, ড. সৌমেন সেন, ড. রেবতীমোহন সরকার, ড. দিব্যজ্যোতি মজুমদার, শ্রীহর্ষ মল্লিক, জে. এন . দাস, ড. অমিয় চৌধুরী, ড. সুভাষচন্দ্র ঘোষাল, ড. বিরাট বৈরাগ্য প্রমুখ। অনেকক্ষেত্রেই ক্ষেত্রানুসন্ধানের সাথী হয়েছেন আমার ভ্রাতৃসম তিন বন্ধু—তমালতরু দাস মহাপাত্র, অলককুমার নন্দ, তারাশঙ্কর সৎপথী।

বইটি মুদ্রণের বিষয়ে আমি কৃতজ্ঞ গণ প্রকাশনীর কর্ণধার হিমাংশু হালদার, বিজয় সাধা-র কাছে। এর বাইরেও অনেকে থেকে গেলেন—যাঁদের নাম করা গেল না। প্রত্যেককেই আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

অনবধানতাবশত কিছু মুদ্রণপ্রমাদ রয়ে গেলে, সুধী পাঠক ক্ষমা করবেন।

দীপককুমার বড় পণ্ডা

রাখী পূর্ণিমা, ১৪০৬
বিবেক নিকেতন
সামালী, পোঃ ন'হাজারী
জেলা ঃ দঃ ২৪ পরগণা



লেখক পটুয়া আনন্দ চিত্রকরের সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন

একটি পৌরাণিক পট



সূচীপত্র

	● পরিচায়িকা	
	● নিবেদন	
প্রস্তাবনা	● সমীক্ষা পদ্ধতি	
প্রথম অধ্যায়	● লোকশিল্প ঃ স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, শ্রেণীবিভাগ, লোকচিত্রকলা	পৃঃ ১১
	● পটশিল্পের প্রাচীনত্ব ঃ প্রাচীন পুঁথিভিত্তিক এবং পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনভিত্তিক কালনির্ণয়	পৃঃ ২৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	● পটকেন্দ্রিক আলোচনার ইতিহাস	পৃঃ ৩০
তৃতীয় অধ্যায়	● পটের শ্রেণীবিভাগ এবং প্রস্তুতি কৌশল	পৃঃ-৪৭
	● পটের শিল্পশৈলী	পৃঃ-৫৪
	● নান্দনিক তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে পটের শৈল্পিক গুণগত মান সম্পর্কে আলোচনা	পৃঃ ৬৯
চতুর্থ অধ্যায়	● পটচিত্রে বর্ণিত সমাজচিত্র	পৃঃ-৭৫
	● পটচিত্রে কৌতুকধর্মিতা	পৃঃ ৭৯
	● গণমাধ্যমরূপে পটশিল্পের ভূমিকা	পৃঃ-৮১
	● যামিনী রায়ের ছবিতে পটচিত্রের পভাব	পৃঃ-৮৫
	● দুর্গা পট ঃ পট-পূজা	পৃঃ-৮৭
	● পট ও পটেশ্বরী	পৃঃ ৮৮
পঞ্চম অধ্যায়	● সাহিত্যে পট পটুয়া প্রসঙ্গ	পৃঃ [illegible]
ষষ্ঠ অধ্যায়	● বিভিন্ন সংগ্রহশালায় পটের সংগ্রহবিষয়ক আলোচনা	পৃঃ-৯৭
সপ্তম অধ্যায়	● পটশিল্পের ভবিষ্যৎ	পৃঃ-১০১
অষ্টম অধ্যায়	● পটুয়া বা পট-চিত্রকরদের নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয়	পৃঃ-১০৬
	● প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েকজন পটুয়া এবং হারানো পটের গ্রাম	পৃঃ-১১৭
নবম অধ্যায়	● পটসঙ্গীত বিষয়ক আলোচনা ও সাহিত্য মূল্য	পৃঃ ১২৮
	● সংগৃহীত পটের গান ও তার আলোচনা	

পরিশিষ্ট

১	● বাংলার বাইরে অন্য রাজ্যের পটচিত্র	পৃ ১৫৭
২	● বিভিন্ন জায়গার পটুয়াদের নাম, ঠিকানা এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	পৃ ১৬৪
৩	● প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ এবং পত্রিকাপঞ্জি	পৃ
৪	● বিশেষজ্ঞদের মতামত	পৃ



পাশাপাশি দুটি জড়ানো পট। বামদিকের পটটি বেহুলা লখীন্দরের কাহিনী, ডানদিকের পটটি আধুনিক স্বামী-স্ত্রীর কাহিনী অবলম্বনে চিত্রিত



শাড়িতে অঙ্কিত পটের চিত্র

প্রস্তাবনা

সমীক্ষা পদ্ধতি (Methodology)

'সব চেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে
তার কোনো পরিমাপ নাই বাইরের দেশে কালে,
সে অন্তরময়,
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।'

—রবীন্দ্রনাথ

সমাজকে জানতে হলে প্রয়োজন সামাজিক গবেষণার। আমাদের এই গবেষণার মূল লক্ষ্য একটি সম্প্রদায় এবং তাঁদের সৃষ্ট শিল্প ও সঙ্গীত। এই উদ্দেশ্যসাধনে আমরা সমাজ-বিজ্ঞান এবং মানববিদ্যাকে সমন্বিত করার চেষ্টা করেছি। উন্নয়নশীল ভারতবর্ষে সামাজিক অনুসন্ধান অত্যন্ত জরুরী। ভারতীয় জনজীবন ও সংস্কৃতির প্রাণ গ্রাম। তাই আঞ্চলিক সংস্কৃতি সমীক্ষার ক্ষেত্রে গ্রামজীবনকে গুরুত্ব দিতেই হয়। সামাজিক গবেষণার সাহায্যে গ্রামজীবনের গতি প্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করা সম্ভব। একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ জানতে ব্যাপক ক্ষেত্রানুসন্ধানের প্রয়োজন। পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্ষেত্রসমীক্ষা ছাড়া কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের সমস্যা জানা সম্ভব নয়। সমাজব্যবস্থাকে সুস্থ রাখতে দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির মূলে পৌঁছতে হবে। টান দিতে হবে তার শেকড়ে। অমঙ্গলজনক পরিস্থিতির স্বরূপ উদঘাটনে সামাজিক অবক্ষয় রোধ করা সম্ভব। এর জন্য সামাজিক গবেষণার প্রয়োজন। সমাজের বিজ্ঞানভিত্তিক বিচার বিশ্লেষণের জন্য সামাজিক গবেষণার একটি পদ্ধতি (Methodology) রয়েছে। আমাদের অনুসৃত সেই পদ্ধতিগুলি আলোচনা করা হল।

● **উদ্দেশ্য নির্ধারণ ঃ** আমাদের উদ্দেশ্য পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী পটুয়াদের সাংস্কৃতিক পরম্পরা ও পরিবর্তন অনুসন্ধান। এই প্রসঙ্গে পটুয়াদের সৃষ্ট পট শিল্প এবং পটের গান সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ।

● **ক্ষেত্র নির্বাচন ঃ** পশ্চিমবঙ্গের যে জেলাগুলিতে পটুয়ারা অতীতে বাস করতেন অথবা এখনও করেন সেগুলিকে ক্ষেত্রসমীক্ষার স্থান হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে।

● **ক্ষেত্রীয় সম্পর্কস্থাপন ঃ** সমীক্ষার সাফল্যের জন্য উত্তরদাতাদের সঙ্গে সুন্দর একটি বন্ধুত্বপূর্ণ' পরিবেশ তৈরি করতেই হয়েছে। এটি আমাদের সামাজিক দায়িত্বও বটে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'সে অন্তরময়, অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।'

● **ক্ষেত্রীয় অবস্থান ঃ** ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে পটুয়া পল্লীতেই অবস্থান করেছি। এর ফলে পুনঃ পুনঃ সংযোগের ক্ষেত্রে সুবিধা পাওয়া গিয়েছে। পল্লীর বাইরে থেকে এই সুবিধা পাওয়া যেত না। এতে গবেষণা ত্বরান্বিত হয়েছে।

● **তথ্যদাতা নির্বাচন ঃ** অতীত জানার জন্য সংবাদদাতা হিসেবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বৃদ্ধ পটুয়াদের। বর্তমান জানতে নির্ভর করতে হয়েছে মধ্য বয়সীদের ওপর। নব প্রজন্মের ওপর একটি সমীক্ষা চালিয়ে ভবিষ্যৎ জানা অনেক সুবিধে হয়েছে। এখানে বলে রাখা দরকার গণিতের সূত্রের মতন এই নিয়ম সবক্ষেত্রে অনুসৃত হয়নি। নিয়ম বদলেছে।

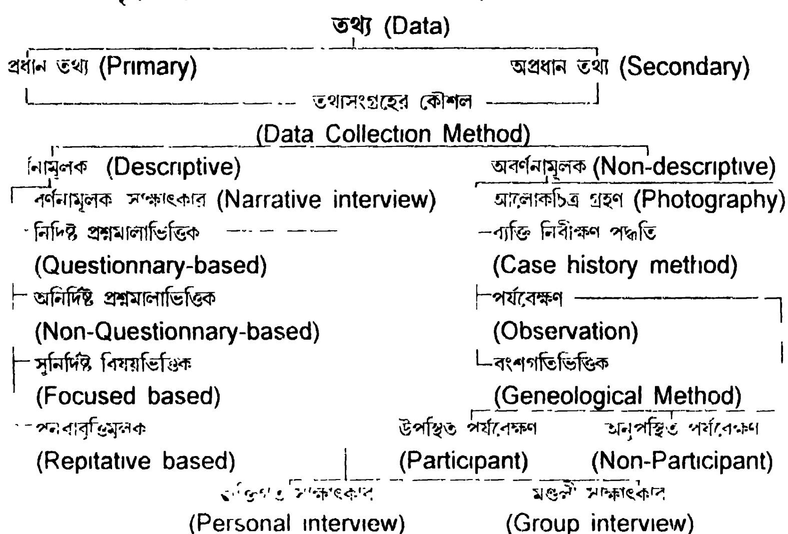
● **সমীক্ষা ঃ** সমীক্ষা দুটি পদ্ধতিতে হয়েছে। (ক) প্রত্যক্ষ সমীক্ষা (খ) পরোক্ষ সমীক্ষা। যে ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত থাকা যায় নি, সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই পরোক্ষ

পদ্ধতিতে 'প্রশ্নমালা'র সাহায্যে প্রত্যাশিত তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হয়েছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সমীক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সমীক্ষার পূর্বে একটি প্রশ্নপত্র তৈরি কবা হয়েছিল। এক সময় এই প্রশ্নপত্র তৈরির বিষয়ে অনেক গুরুত্ব থাকলেও বর্তমানে এবে একঘেয়ে ও সীমিত বলা হচ্ছে। 'The questionnaire method at one time a advocat for anthropology has only a limited utility [Notes and queries in Anthropology (Ed. 1951)] Schedules and questionnaires are beneficial as supplementary and extending devices in observation, in interviews, and in evaluating personal behaviour and social situations [Scientific Social surveys and Research. (4th Ed.) Paul V young.]

● **তথ্যাবলীর প্রকার এবং উৎস ঃ** সামাজিক গবেষণায় বিভিন্ন তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়। সেই সংগৃহীত তথ্যকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—১. প্রধান তথ্য ঃ প্রশ্নমালা, সাক্ষাৎকার, অনুসূচি (Schedule) এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যে তথ্যগুলি সংগৃহীত হয়েছে সেগুলি প্রধান তথ্য।

২. অপ্রধান তথ্য ঃ সাধারণতঃ যে তথ্যগুলি প্রকাশিত কিংবা অপ্রকাশিত সংগ্রহ থেকে পাওয়া গেছে সেগুলি এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই তথ্যগুলি পাওয়া গেছে বিভিন্ন দৈনিক কিংবা সাময়িক পত্র-পত্রিকা, সমীক্ষা-প্রতিবেদন, ব্যক্তিগত দিনলিপি, চিঠিপত্র প্রভৃতি থেকে।

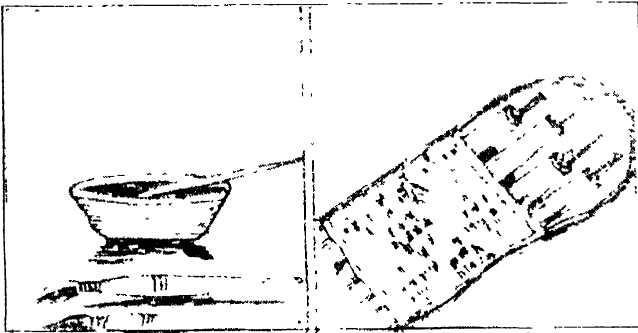
প্রকৃতি অনুযায়ী উৎসগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে ঃ ক. লেখ্যমূলক উৎস (Documentary Source) খ. ক্ষেত্র উৎস (Field Source)। লেখ্যমূলক উৎসের পর্যায়ে পড়ে বিভিন্ন পুস্তক, সরকারি প্রতিবেদন, পুলিশ রিপোর্ট প্রভৃতি। সরাসরি যা সমীক্ষাক্ষেত্র থেকে পাওয়া গেছে তাই ক্ষেত্র উৎস। সামাজিক গবেষণায় এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তথ্যকেন্দ্রিক (Data base) গবেষণা বিজ্ঞাননির্ভর। সেই তথ্যগুলি যে পদ্ধতিতে সংগৃহীত হয়েছে তাব একটি ছক দেওয়া হল।



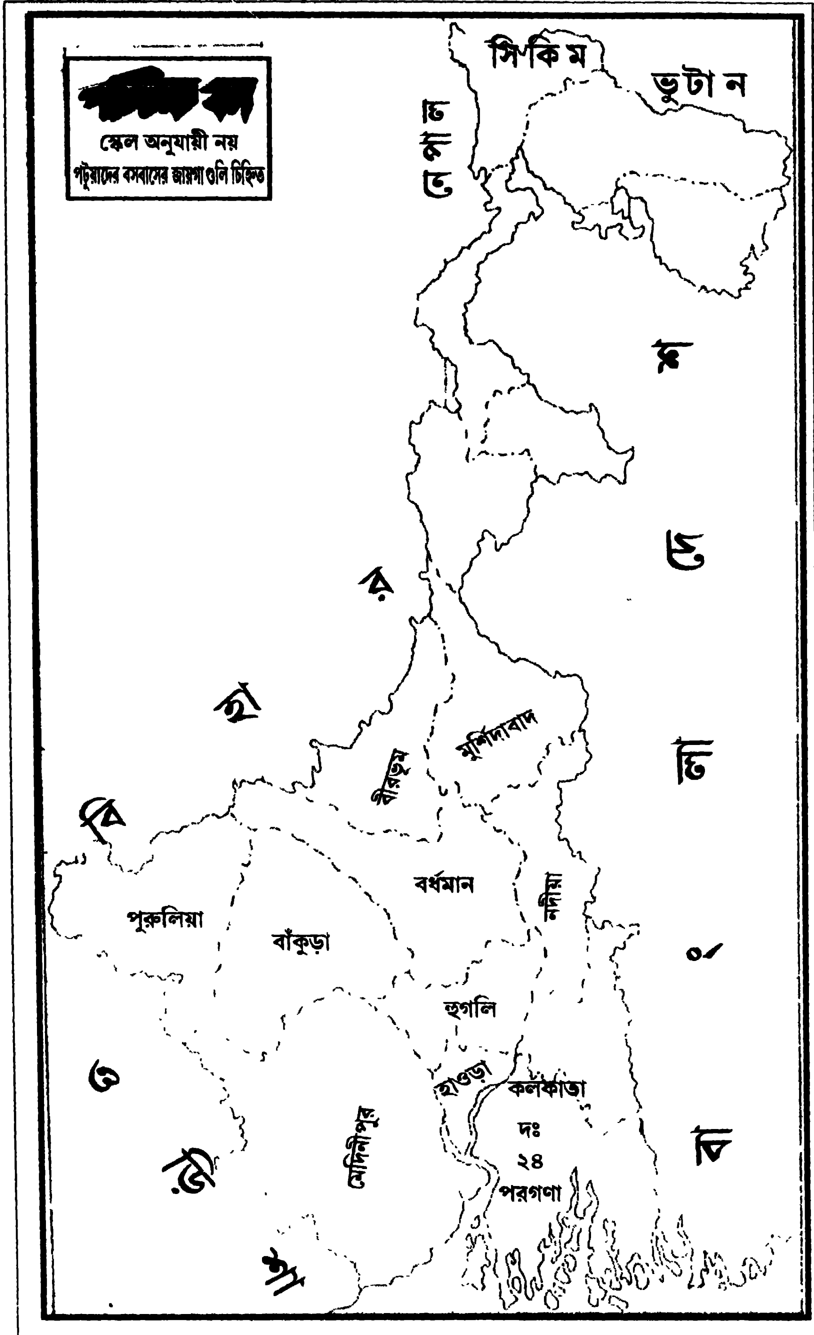
সমীক্ষা পদ্ধতি

এই গবেষণায় রাশিতথ্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখ বা লেখচিত্রের (graph) সাহায্য নিতে হয়েছে। রাশিতথ্য বিশ্লেষণে লেখচিত্রের সাহায্য নেওয়াটা জরুরী, কারণ এটাই একমাত্র শক্ত রাশিগুলির অবস্থান সহজে বুঝিয়ে দেয়। বৈজ্ঞানিক তথ্য ও সত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত সমাজসমীক্ষায় এই লেখচিত্র খুবই প্রয়োজনীয়। তথ্যের সঞ্চালন ও চলন নির্ধারণে এর ভূমিকা অনেকটাই। এই প্রসঙ্গে বলা যায় মানচিত্র একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। ক্ষেত্র এলাকা (Field area) এবং যে সমাজের উপর গবেষণা তাদের বিস্তৃতি বোঝাতে মানচিত্র খুব গুরুত্বপূর্ণ। মানচিত্রের সাহায্যে অবস্থানগুলি বোঝান যায়। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি লেখচিত্র কিংবা মানচিত্রের তথ্যগুলি পটুয়াদের থেকে সংগৃহীত। পটুয়াদের মধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে যে পরিসংখ্যান (statistic) এবং স্থান-নাম পাওয়া গেছে তা এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে। কোন জেলায় কত পটুয়া আছেন তার শতকরা হিসেবটা পটুয়ারাই জানিয়েছেন। পূর্বে পশ্চিমবঙ্গে পটুয়াদের বিস্তৃতি অনেক জেলাতেই ছিল। দিনে দিনে সেই বিস্তৃতি কমেছে। বর্তমানে অনেক জেলাতেই পটুয়ারা থাকলেও পট আঁকেন না—আলাদাভাবে সেই জায়গাগুলো চিহ্নিত করা হয়নি। শুধুমাত্র পটুয়া সম্প্রদায়ের বিস্তৃতিটা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

পটুয়াদের মূল্যবান গানগুলি টেপরেকর্ডারের সাহায্যে সংগৃহীত হয়েছে। এব দ্বারা সুরের বৈচিত্র্য আস্বাদ করা গেছে। কিছু গান অবশ্য পটুয়াদের খাতা থেকে সংগৃহীত হয়েছে। কোনক্ষেত্রেই আমরা গানের পরিবর্তন ঘটাইনি। ওঁরা যা গেয়েছেন কিংবা লিখেছেন সেটাই সঙ্কলিত হয়েছে। বোঝার সুবিধার জন্য গানের শেষে কোন কোন ক্ষেত্রে সেগুলির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পটুয়াদের জীবনযাত্রা, বিশেষ বিশেষ পটের ছবি, পটুয়ার ছবি, এছাড়াও প্রাসঙ্গিক আরো কিছু ছবি ক্যামেরাবন্দী করা হয়েছে গবেষণার সুবিধার্থে।



পট আঁকার তুলি এবং রং রাখার পাত্র (বাম দিকে)
পট রাখার ব্যাগ (ডান দিকে)


স্কেল অনুযায়ী নয়
পটুয়াদের বসবাসের জায়গাগুলি চিহ্নিত
সিকিম
ভুটান
বীরভূম
মুর্শিদাবাদ
বর্ধমান
নদীয়া
পুরুলিয়া
বাঁকুড়া
হুগলি
হাওড়া
কলকাতা
দঃ
২৪
পরগণা
মেদিনীপুর



বেহুলা লক্ষ্মীন্দরের পট



মনসামঙ্গলের পট



রামায়ণ কাহিনী



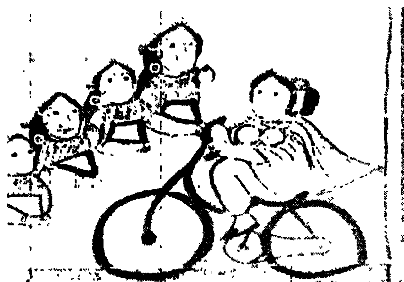
রাম লক্ষ্মণ এবং রাবণের যুদ্ধ



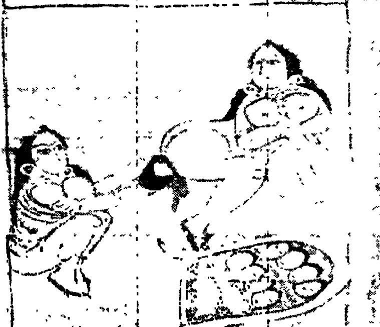
একটি
সামাজিক
পট



রামায়ণ কাহিনী



একটি সামাজিক পট





একটি চৌকো পট

● প্রথম অধ্যায় ●

লোকশিল্প ঃ স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, শ্রেণী বিভাগ, লোকচিত্রকলা

প্রকৃতির কোলে, পৃথিবীর ওপর, ছড়ানো আছে অসংখ্য বস্তু, দৃশ্য, দেহাবয়ব ইত্যাদি, কত কী! সেগুলির রূপ, রঙ ও রস মানবমনে ভাব ও রস সৃষ্টি করে। শিল্পচেতনাসমৃদ্ধ মানুষ তার আপন মনের ভাব ও রসের মাধুরী মিশিয়ে, বিভিন্ন আধারে, উপকরণে ও শিল্পকৌশলের দ্বারা সে সব বস্তু ও দৃশ্যগুলির অভিনব রূপ দান করে। শিল্প চেতনাসমৃদ্ধ মানুষ—জীবনশিল্পী, তাঁর জীবনের ক্ষেত্রে লব্ধ কোনও কিছুই— তা যত ক্ষুদ্র, তুচ্ছ হোক— অবহেলা করেন না। সাধারণ মানুষও তার দৈনন্দিন জীবনচর্চায়, প্রতিটি কর্মে ও আচরণে, শিল্পসৌন্দর্য ও শিল্পরস রক্ষা করে চলে—এটাই মানবজীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সাধারণ মানুষও যখনই কোনও ব্রত-পার্বণ পালন করে, উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন করে—বিভিন্ন ঋতুতে, বিভিন্ন উপলক্ষে, তখনও সে শিল্পকে অবহেলা করে না। বলা যায়, মানুষের জীবন শিল্প নিয়েই; জীবনের বিকাশ ও গঠন শিল্পের মতোই। শিল্প যেহেতু মানবজীবনের সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠ, সেহেতু লোকসাধারণের হাতে লোকশিল্পের সৃষ্টি ও বিকাশ, অস্বাভাবিক বা অকল্পনীয় ব্যাপার নয়। স্পষ্টই প্রতীয়মান হলো যে, শিল্পের সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের ও লোকসাধারণের জীবনের সম্পর্ক নিবিড়। যুগ-যুগ ধরে যে-লোকসাধারণ বাস করে দেশের সর্বত্র—গ্রাম-জনপদে, শহরে-গঞ্জে, পর্বতের উপত্যকায়, সমুদ্রের কিনারায়, চিরকাল সেই লোকসাধারণের চোখে থাকে জগৎ, জীবন ও প্রকৃতির রূপ ও রহস্যদর্শনের নেশা এবং তাদের অনেকের মধ্যে আছে শিল্প-সৃষ্টির গভীর শিল্প-চেতনা। এই চেতনা আর আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তারা গড়ে তোলে লোকশিল্প।

শিল্প কি?

লোকশিল্পের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য এবং গুরুত্ব জানবার আগে, লোকসাধারণের হাতে তৈরি লোকশিল্পদ্রব্য কিংবা তার শৈল্পিক-উৎকর্ষ কবে থেকে, কোথায় এবং কীভাবে সৃষ্টি হলো, অর্থাৎ লোকশিল্পের ইতিহাস সম্পর্কে কৌতূহল জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। এ বিষয়ে আলোকপাত করতে গেলে, আদিম যুগ ও তার শিল্প সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। প্রাগৈতিহাসিক যুগ, হয়তো তখন সবেমাত্র অগ্নি প্রজ্বলন-প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হয়েছে; পশু শিকার তখনও একমাত্র জীবিকা; দিকে দিকে গোষ্ঠী-সংঘর্ষ চলছে অবিরাম, অস্ত্র-শস্ত্র শুধুই প্রস্তর— দেখা যায়, তখনই আদিম যুগের মানুষ নয়ন-মনোহর সুন্দরের পূজা শুরু করেছে। হয়তো সচেতনভাবে নয়—স্থূল পদ্ধতিতে। তা হোক, তবু তাদের অস্ত্র-শস্ত্রগুলো, তাদের নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, নানান নক্‌শায় আকর্ষণীয় হয়ে উঠতো। তখনই তারা তাদের শিকারের দেবতাকে খুশি করতে গুহা-প্রাচীরে আঁকতো কল্পিত দেবতার চিত্র। সেই সঙ্গে তাদের চমৎকার অঙ্গ সজ্জা। সে যুগটা ছিল বেঁচে থাকবার জন্য প্রাণপণ সংগ্রামের যুগ। নৃবিজ্ঞানীদের মতে—সেটি ছিল চারপাশে-ছড়ানো অজানা, অজস্র রহস্য, অলৌকিকতা ও যাদুবিদ্যায় মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস ও সংস্কার, সংস্কারজাত ধর্মীয়

লোকশিল্পের ইতিহাস

চেতনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অলৌকিক যাদু ক্রিয়াভিত্তিক নানা আচার অনুষ্ঠানের যুগ। এক কথায় বলা যায়, যুগটা বশীভূত ছিল বিশ্বাস ও সংস্কারে। পশু-শিকারের দেবতার চিত্র অঙ্কন করলেই তিনি নাকি খুশি হন — এই সংস্কারের বশে পর্বত্রগাত্রে খোদিত হয়েছিল দেবতার চিত্র। আমরা বলতে পারি এই সংস্কারের সূত্র ধরেই পার্বত্য গুহাচিত্রাঙ্কনের রীতিটি দেখা দিয়েছিল। সময় এগিয়ে চললো। শুধু দেবচিত্র নয়, অন্যান্য চিত্রও অঙ্কিত হলো এবং লোকসাধারণ তাতে অংশ নিল। ক্রমে ক্রমে আদিম সংস্কার ও বিশ্বাসের বাহু-বন্ধন থেকে জীবনযুদ্ধ বিচ্যুত হলো। দৈনন্দিন জীবনে—ব্যবহারিক প্রয়োজন পূরণের তাগিদই তখন বড় হয়ে উঠলো। শিল্পে এলো লোকায়ত ভাব অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতা। এইভাবে আদিম শিল্প ধীরে ধীরে লোকশিল্পে রূপান্তরিত হলো।

লোকশিল্প নির্মিত হতে লাগল লোকসাধারণের কাঁচা হাতে বটে, কিন্তু সৌন্দর্যবর্জিত ছিল না। ক্রমশ শুরু হয়েছে অগ্নি-প্রজ্বলন। তার আগেই অবশ্য শুরু হয়েছিল মাটির হাঁড়ি-কুঁড়ির ব্যবহার এবং সূর্যের উত্তাপে সেগুলোকে শুকিয়ে নেবার রীতি। তখনই সেগুলিতে নানা রঙের মাটি ব্যবহৃত হতো। এবং সেগুলিকে নানা রঙে রঙীন করা হতো। পরে যখন বেত, বাঁশ, কাঠ ইত্যাদির দ্বারা গৃহ-ব্যবহার্য্য নানা আসবাবপত্র নির্মিত হয়েছে, তখন সেগুলিকে শিল্পগুণে আকর্ষণীয় করতে কত না চেষ্টা হয়েছে! আরও পরে দেখা গেছে লজ্জা নিবারণের জন্য বস্ত্রাদি এবং বসবাসের জন্য গৃহাদি—সর্বত্র সৌন্দর্যসাধনের কী গভীর প্রয়াস! ঐতিহাসিকেরা আরও জানিয়েছেন—পর্বতকন্দরের অন্ধকারে বসে কাঠ, বেত ও বাঁশ দিয়ে সেদিন যে ধনুক নির্মিত হতো তা ছিল যেমন ব্যবহার উপযোগী, তেমনি বেতের বাঁধনে, সরল রঙের রেখার স্পর্শে সুদৃশ্য ছিল সেগুলি। এই সূত্রে উল্লেখ করা যায়, আদিমযুগে অবিমিশ্র রঙের ব্যবহার এবং মোটা তুলিতে সবল রেখার অঙ্কন-রীতি প্রায়ই দেখা যেতো। আজও চোখে পড়ে কাগজের মন্ডে তৈরি নানান রকমের মুখোশ-শিল্প এবং কাগজ, কাঠ বা মাটির তৈরি পুতুল, কৌটা, রঙীন পাত্র ইত্যাদি শিল্পবস্তুতে সরল, মোটা, পুষ্ট ও দৃঢ় রেখার টান।

সময় নদীস্রোতের মতো এগিয়ে চললো। আদিম গুহামানব সমাজবদ্ধ ও গৃহবাসী মানুষে উন্নীত হলো। আদিম শিল্পও মূলতঃ ধর্মীয় বন্ধন ছিঁড়ে সমাজের ব্যাপক-বিস্তারে গতিবিধি শুরু করল। তখন থেকেই দেবতার কল্পিত-প্রতীক গাছ, পাথর ইত্যাদিব গৃহদেবতা বা গ্রামদেবতার মর্যাদাপ্রাপ্তি এবং মানুষ তাঁদেরকে, শিল্পে, সৌন্দর্যে ও অলঙ্করণে সচেষ্ট হলো।

এখন লোকশিল্পের উদ্ভব-কাল এবং উদ্ভাবকদের সম্পর্কে একটা আনুমানিক সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। তখন ভারতের সুপ্রাচীনকাল। তখনও কুলীন, অকুলীন কথাগুলির উৎপত্তি হয় নি। জাত বা শ্রেণীবিভাগ ছিল অকল্পনীয়; কৃষি-শিল্পের সৃষ্টি হয় নি — কৃষক-পল্লী গড়ে ওঠে নি; শ্রম-বিভাজন শুরু হয় নি; কারুশিল্প গড়ে ওঠে নি। তখনও এদেশের কিছু মানুষ ছুতারের দারুশিল্প, কুমোরের মৃৎশিল্প, কামারের ধাতুশিল্প ইত্যাদিতে যুক্ত ছিল। উক্ত শিল্পগুলি দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় এবং নান্দনিকও ছিল। পরবর্তীকালে এই সূত্রে সৃষ্টি হয়েছে গ্রামীণ আসবাবপত্র, মৃৎশিল্প, পোড়ামাটির মূর্তি, সূচী শিল্প, বয়নশিল্প। তাছাড়াও দেওয়াল চিত্র; ঢোকরা শিল্প, মুখোশশিল্প, অলংকার শিল্প, বস্ত্রশিল্প, বেত-বাঁশ শিল্প, দারুশিল্প, আলপনাশিল্প, মন্দির-মসজিদ অলংকরণ, কববীরচনা শিল্প, ডাক-শোলার শিল্প

ইত্যাদি কত কী! এগুলি সমগ্র জনসমাজের সৃষ্ট বলে প্রকৃত অর্থে এগুলিকে লোকশিল্প বলতে হয়।

অতঃপর লোকশিল্পের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় আমরা এগিয়ে যেতে পারি। লোকসাধারণের সৃষ্ট হলেও লোকশিল্প কিন্তু নানা গুণে অসাধারণ। যে-লোকশিল্প একটি জাতি বা মানবগোষ্ঠীর সভ্যতা, সংস্কৃতি, মন ও মননের পরিচয় বহন করে, তার অজস্র প্রকাশের বুদবুদে জনচিত্তের সত্ত্বা উদ্‌ঘাটিত হয়। যে-কোনো জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্রষ্টা যে মন ও মনন, তা যেন এককথায় ভাসমান বরফস্তূপ, যার বৃহত্তর অংশ থাকে দৃষ্টির আড়ালে, জলের তলায়। সেইরূপ লোকশিল্পের অজস্র বিকাশের বুদবুদে জাতির সমষ্টিগত মন ও মননের সেই বৃহত্তর অংশেরই অস্তিত্ব থাকে, কিন্তু তা দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু মার্জিত বা অভিজাত শিল্পে তা কতটুকু থাকে? লোকশিল্পের অসাধারণত্বের অন্যতম কারণ এর মঙ্গলকর দিক। মানুষের দৈনন্দিন গার্হস্থ্যজীবন স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল করতে লোকশিল্প সর্বদাই প্রস্তুত। কখনও কখনও মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, লোকহিতসাধনই বুঝি এর উদ্দেশ্য। পূর্বেই বলা হয়েছে মানুষ আনন্দপিপাসু, রূপ-রস-শব্দ ও গন্ধের পূজারী। এগুলি তাকে আনন্দ যোগায়। লোকশিল্প, মানবজীবনে এই নির্মল আনন্দের বার্তা বহন করে আনে।

স্বরূপ বৈশিষ্ট্য

লোকসাধারণকে শিক্ষাদানে — নৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি বিষয়ে লোকশিল্পের ভূমিকাও প্রবল। লোকসাধারণকে উন্নত রুচি ও সৌন্দর্যজ্ঞানের শিক্ষা দিতে, মনে হয়, এর যেন জুটি নেই। আরও, লোকসাধারণের সুখ-দুঃখ, ভয় ইত্যাদি বিচিত্র অনুভূতির এমনতর স্বতঃস্ফূর্ত অনুরূপ প্রকাশ-মাধ্যম অতি স্বল্পই আছে। তাছাড়াও, বলা যায়, লোকশিল্প অলৌকিক সৃষ্টির মতো এক আশ্চর্য বস্তু। অলৌকিক বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মার সঙ্গে লোকশিল্পীর তুলনা চলে না। ব্রহ্মা ঈশ্বরীয় ক্ষমতাসম্পন্ন স্রষ্টা, যাঁর ইচ্ছামাত্র সৃষ্টি ঘটে। কিন্তু মানুষতো অলৌকিক শক্তির অধিকারী নয়, বিনা আয়াসে সে কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। তবু প্রজাসৃজনকর্মের সঙ্গে লোকশিল্প সৃষ্টির মিল বা সাযুজ্য দেখে আমরা বিস্মিত হই। ব্রহ্মার সৃষ্ট এই বিশ্ব অপূর্ব সুন্দর, সংশয় নেই; এবং তাঁর বিনা আয়াসেই সব ঘটে। কিন্তু মানুষ ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী না হয়েও প্রায় অলৌকিক সৃষ্টির মতো অতুলনীয় শিল্পসম্পদ সৃজন করে। এক্ষেত্রে অনলস দীর্ঘ-সাধনা, সহজাত শিল্পবোধ, সৌন্দর্যজ্ঞান বিশেষ সহায়ক হয়। এখানেই লোকশিল্পের স্বাতন্ত্র, বৈশিষ্ট্য এবং বিস্ময়করতা।

লোকশিল্প স্বতঃপ্রবৃত্ত, সজীব—পরিবর্তনশীল; ঐতিহ্য-অনুসারী শাস্ত্রীয় শিল্পরীতি; নিরপেক্ষ, সমষ্টিগত আচার, চেতনা ও ইতিহাসসমৃদ্ধ এসব বৈশিষ্ট্য উল্লেখ্য। স্ব স্ব প্রাণের প্রেরণায়, প্রয়োজনের তাড়নায়, লোকসাধারণ লোকশিল্প গড়তে বসে—কোনো উচ্চপদস্থের মর্জি বা নির্দেশে নয়। স্বতঃপ্রবৃত্ত শিল্প বলেই, মনে হয়, লোকশিল্প গতানুগতিক কোনো শাস্ত্রীয় শিল্পরীতির অনুকরণ পছন্দ করে না। তবে পারিবারিক পেশায় ও ব্যক্তিগত শিল্পবিশেষের ঐতিহ্য অনেক ক্ষেত্রেই স্বীকার করে নেয়। এই কারণেই আমাদের এই লাভ ঘটে যে, আমরা এর মধ্যে থেকে প্রচুর ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক ও পুরাতাত্ত্বিক উপাদান খুঁজে পাই। এর ভেতর থেকে নানা ঐতিহাসিক তথ্যাদি পাই বলে, এটি যে অতীতমুখী, তা বলা যায় না। বরং বলা যায় — সজীবতা এর বৈশিষ্ট্য; সজীবতা এর সর্বাঙ্গে। আনুমানিক চার হাজার

বছর আগে গ্রাম গড়ে উঠলো—গ্রামে-গ্রামে সাংস্কৃতিক-বিচ্ছিন্নতা নিয়ে। তারও অনেক পরে, শহর-নগর নির্মিত হলো শিক্ষা ও শিল্প নিয়ে। ভাঙা-গড়ার নিত্য খেলায়, পারিপার্শ্বিক শহুরে প্রভাবে, গ্রামে, জনজাতিজীবনে ও শিল্পে উপাদানগত এবং শিল্পরীতিগত কিছুটা পরিবর্তন এলো — গ্রহণ-বর্জন ঘটলো। এতো সজীবতার লক্ষণ, যা লোকশিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

লোকশিল্পের সঙ্গে অভিজাত ও আদিম শিল্পের তুলনা করতে বসলে, উক্ত শিল্পগুলির এবং লোকশিল্পেরও কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে যায়। পূর্বেই বলা হয়েছে, লোকশিল্প ও আদিমশিল্প অনভিজাত সমাজ-সৃষ্ট, শাস্ত্রীয় শিল্পরীতি-অনুসারী নয়; পক্ষান্তরে অভিজাত শিল্প সীমিত, উচ্চস্তরের মানবসমাজ-সৃষ্ট। লক্ষণীয় যে, লোকশিল্প লোকমানসের স্পষ্ট প্রতিমূর্তি। কেননা, লোকশিল্প সমগ্র লোকসমাজ-ও-জীবনাশ্রয়ী। লোক-সমাজও জীবনাশ্রয়ী বলে লোকশিল্প হয় প্রত্যক্ষ, জীবিত, খাঁটি, কষ্টসাধ্য-আড়ম্বর শূন্য, একেবারে প্রাণের কাছের বস্তু। এত গুণের আধার যে-লোকশিল্প, তার সর্বাঙ্গে নাই-বা থাকলো আড়ম্বরের আতিশয্য, চাকচিক্যময়তা, কৃত্রিমতার আকর্ষণ! তাতে ক্ষতি কি?

দেশের জলবায়ু, ভূগোল ও প্রকৃতির দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে লোকসাধারণের যে-জীবনধারা চিরকাল প্রবাহিত হয়ে চলে, লোকশিল্প তার সঙ্গে সম-বিস্তৃত, অগ্রসরশীল ও ঘনিষ্ঠ। এ-কারণে জলবায়ু, ভূগোল ও প্রকৃতিকে লোকশিল্পের পরোক্ষ জন্মদাতা বলতে বাধা কোথায়? আর এ কারণেই লোকশিল্পকে বুঝতে হলে দেশের জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি ও প্রকৃতিকে জানা দরকার হয়। এবং সেই সঙ্গে দেশের লোকসাধারণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গঠন-বৈশিষ্ট্যও জানা জরুরী। একথাটি স্পষ্ট করা যায়, লোকশিল্পের ক্রেতা-ভোক্তা ও বিক্রেতার চাহিদার ও যোগানের সূত্র ধরে ক্রেতা ধনী বা দরিদ্র যে-স্তরেরই হোন না কেন বিক্রেতাকে ক্রেতার মানসিক ও সাংস্কৃতিক গঠন অনুযায়ী শিল্পদ্রব্য যোগান দিতে হয়। কাজেই সেক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতাকে একই মানসিক স্তরের অধিকারী হতে হয়। এবং এ কারণেই লোকশিল্পকে লোকমানসের প্রতিচ্ছবি বলা হয়।

লোকশিল্পের অপর বৈশিষ্ট্য — লোকশিল্প জাতির হারিয়ে-যাওয়া মানসিক গুণাবলীর আধার এবং সেগুলির পুনর্জাগরণের উপায়-স্বরূপও বটে। লোকশিল্পের সর্বাঙ্গে থাকে প্রাচীনকালের সরলতার ভাব, অনাবিলতা, স্বতঃস্ফূর্ততা, প্রাণখোলা হাস্যভাব, আন্তরিকতার লাবণ্য, জীবন্তভাব, সহজ স্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদি, যেগুলি বর্তমান কৃত্রিম সভ্যতার প্রভাবে জীবন থেকে প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। লোকশিল্প ক্ষণকালের জন্য হলেও সেগুলিকে আমাদের মনের মধ্যে পুনরায় জাগিয়ে দেয়। মন স্ফূর্তিলাভ করে। তাই বা কম কি? লোকশিল্প জাতির হারিয়ে-যাওয়া গুণাবলীর পুনর্জাগরণ ঘটায়; জাতির প্রতিভার সংরক্ষণ এবং প্রতিভার বিকাশেও সহায়ক। কোন জাতির প্রতিভা ও সৃষ্টি-কল্পনা — তা উন্নততর কিংবা ক্ষীণতর যাই হোক — তাকে রক্ষা করার মহৎ কর্মটি লোকশিল্পের অন্যতম কাজ। জাতির উন্নততর প্রতিভা ও কল্পনাশক্তি যদি কোনো ঐতিহাসিক বা জাতীয় উপপ্লবে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখন লোকশিল্পের কাজ কী? তখন জাতিকে উন্নত করবার জন্য সৃজনশীল কর্মে উদ্দীপ্ত করতে প্রেরণা যোগানো লোকশিল্পের কাজ হয়।

পুনরায় লোকশিল্পের কাজের কথায় আসা যাক। বর্তমান সভ্যতাসংকটে যখন জীবন

নিরানন্দে ভরে যাচ্ছে ক্রমে-ক্রমে, সৌন্দর্য ও শৈল্পিক আনন্দধারা ক্ষীয়মান, চারদিকে কৃত্রিমতার বাহুল্য, আন্তরিকতা ও সহজ সরলভাব প্রায় অন্তর্হিত, স্বার্থে স্বার্থে বাধছে সংঘাত পরিশীলিত শিল্প থেকেও সারল্য, অকৃত্রিমতা ক্রমে-ক্রমে অদৃশ্য হচ্ছে, তখন সরল, সহজ, লোকসাধারণের অকৃত্রিম লোকশিল্পকে আশ্রয় করা ছাড়া উপায় কী? আন্তরিকতা, অকৃত্রিমতা, উদারতা ও আনন্দধারা পুনরুদ্ধারের কাজে লোকশিল্প বড় সহায়ক।

লোকশিল্পের সঙ্গে জলবায়ু, ভূগোল ইত্যাদির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা আগেই বলা হয়েছে। এগুলি ছাড়াও, দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস লোকশিল্পের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। তবে স্বীকার করতে হবে যে প্রভাবশালী রাজনীতি ও রাজদরবারও ততটা গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না এরওপর। রাজায়-রাজায় কিংবা রাজায়-প্রজায় যুদ্ধ চলতে থাকে, শহর-নগরের কিংবা শাসকেরও বদল হয়ে যেতে পারে, লোকশিল্প কিন্তু অবিরাম, অব্যাহত। এই নির্বিকারত্ব লোকশিল্পের এক আশ্চর্য ক্ষমতা। দেশকালের সীমানা ছাড়িয়ে, আইন-কানুনের হাত এড়িয়ে দূরে — বহুদূরে ছড়িয়ে-যাওয়া লোকশিল্পের আর এক বৈশিষ্ট্য। লোকশিল্পের আছে আরও কত বৈশিষ্ট্য।

সামগ্রিকভাবে — ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গীতে, লোকশিল্পের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা গেল। মোটামুটি একটা আদল খুঁজে পাওয়া কষ্টকর হবে না। লোকশিল্প সম্পর্কে ধারণা আরও স্পষ্ট করার জন্য, তার শ্রেণীবিভাগ নির্ণয় করা দরকার।

লোকসংস্কৃতিধারার মধ্যবর্তী হলো আমাদের লোকশিল্প। গঠন-প্রকৃতির ভিন্নতা অনুসারে লোকশিল্পের দু'টি ভাগ— বস্তুকেন্দ্রিক ও বাক্‌কেন্দ্রিক। লোকশিল্প বাক্‌কেন্দ্রিক। তার আছে বিচিত্র রূপ— বিভিন্ন বিভাগ। একটি ক্ষুদ্র উপমার সাহায্যে তার বিভাগের ভিন্নতা দেখানো যেতে পারে। বাহারী ও রকমারি ফুলের একটি পুষ্পস্তবকে থাকে ফুলে-ফুলে সৌন্দর্য্য-লাবণ্য কিন্তু ফুলের আকারে-প্রকারে ভিন্নতা। তেমনি, বিচিত্র ভূ-প্রকৃতি, নদ-নদী ও জলবায়ুর দেশ এই ভারতবর্ষে বিচিত্র লোকশিল্পের কয়েকটি মাত্র বিভাগ আছে যা সর্বত্রই চোখে পড়ে। এবং সে বিভাগগুলি তার উপাদানের ভিন্নতার ভিত্তিতে নির্ণীত। যেমন—(১) ধাতু শিল্প, (২) মৃৎ শিল্প, (৩) দারুশিল্প, (৪) প্রস্তরশিল্প (৫) শোলাশিল্প, (৬) বস্ত্রশিল্প (৭) বাঁশ-বেত শিল্প, (৮) মাদুর শিল্প, (৯) কাগজ মণ্ড শিল্প। পটচিত্র শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। আবার, কোনো কোনো শিল্পের উপকরণ বাহুল্যের জন্য তাদের উপবিভাগ করা যায়। যেমন মৃৎশিল্পের উপবিভাগ — (১) কাঁচা মাটির মৃৎ শিল্প এবং (২) পোড়া মাটির মৃৎশিল্প, এবং ধাতুশিল্পের— কাঁসা, পিতল, সোনা ইত্যাদি। নির্মাণ-কৌশলগত দিক থেকেও উপবিভাগ করা যায়। যেমন — (১) চিত্রশিল্প, (২) খোদাই শিল্প, (৩) বয়ন শিল্প এবং (৪) রূপসজ্জা শিল্প।

শ্রেণী বিভাগ

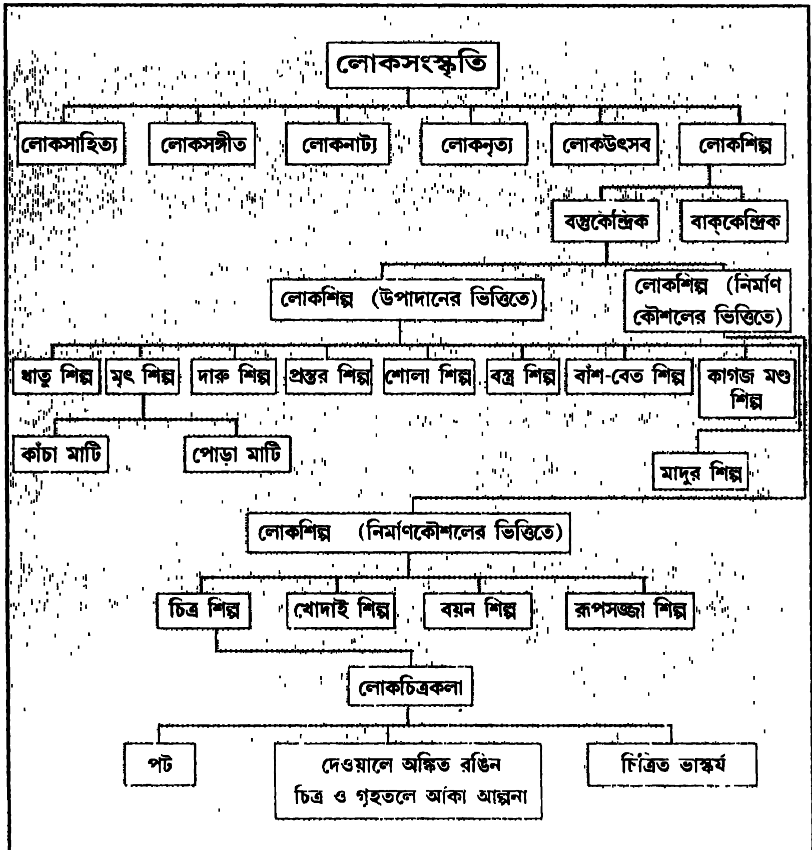
লোকশিল্পীরা এখন তাঁদের শিল্পকে রুজিরোজগারের অবলম্বন হিসেবে নিতে পারছেন। লোকশিল্প তার পুরনো গৌরবের মধ্যে টিঁকে থাকার চেষ্টা করছে। আধুনিক প্রকরণকেও তারা আত্মস্থ করছে। লোকশিল্পের সঙ্গে চিত্রশিল্পের সম্পর্কের নিবিড়তা কে অস্বীকার করবে? লোকশিল্পের অন্তর্গত চিত্রশিল্প। আমাদের অনুমান—চিত্রশিল্প আবির্ভূত হয়েছে

সর্বাগ্রে। আজ চিত্রশিল্পের ব্যাপক প্রসার; বড় কদর। এই কদর তখনও ছিল। কখন? মানুষ তখন অরণ্যে, গুহায় বাস করতো, পশু-পাখি শিকার করে বেড়াতো বনে-বনে, শিকার থেকে ফিরে গুহার ভেতর বসে গল্প করতো পশু শিকারের, সঙ্গীকে পশু-পাখির গতিবিধি জানাত, ছবি আঁকত পশু-পাখির অন্য উপায় ছিল না। মনের ভাব প্রকাশের উপযুক্ত ভাষাই তৈরি হয়নি তখন। তাছাড়াই চৈনিক প্রবাদ — ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে কথার চেয়ে ছবি হাজার গুণ শক্তিশালী— মিথ্যা তো নয়। লোকশিল্পের অন্যতম শাখা লোকচিত্রকলার তিনটি প্রধান ভাগ ঃ

(১) পট বা বহুবিধ জড়ানো পটচিত্র

(২) দেওয়ালে অঙ্কিত রঙিন চিত্র ও গৃহতলে আঁকা আল্পনা

(৩) চিত্রিত কাষ্ঠ ও মাটির পুতুল শিল্প। গ্রামীণ মানুষদের দ্বারা অদ্যাবধি অনুশীলিত এই তিনটি চিত্রসংক্রান্ত শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ্য হলো, বহুবিধ জড়ানো পট শিল্প, যা বাংলার গ্রামীণ লোকচিত্রের অন্তর্ভুক্ত।



পটশিল্পের প্রাচীনত্ব ঃ প্রাচীন পুঁথিভিত্তিক এবং পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনভিত্তিক কালনির্ণয়

আজকাল, বাংলা 'পট' কথাটা, ব্যাপক অর্থে, চিত্র বোঝায়। শুধু এখন নয়, খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে রচিত গ্রন্থাদিতেও পট অর্থে চিত্র বোঝানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, বিশেষভাবে তৈরি বস্ত্রখন্ডের ওপর অঙ্কিত চিত্র হলো পট। পট কথাটির আদিরূপ এবং মূল-উৎস, নিশ্চয়ই, দূর অতীতের কোনো কিছুতে অবস্থান করছে, একথা নিশ্চিন্তে ভাবা যায়। সর্বাগ্রে প্রাচীন বৈদিক, সংস্কৃত কিংবা পালি ভাষার কথা উঠে আসতে পারে। দেখা যায়, সংস্কৃত-পূর্ববর্তী বৈদিক, পরবর্তী সংস্কৃত এবং পালি ভাষাতে 'পট্ট' কথাটার অস্তিত্ব। যার অর্থ বস্ত্র। চিত্র অর্থে পট কথাটি কবে থেকে প্রচলিত? বৈদিক ভাষায় পট কথাটির অস্তিত্ব সমালোচক প্রদ্যোৎ ঘোষ তাঁর গ্রন্থে[১] উল্লেখ করেছেন —

"The origin and history of Pat painting is unknown The term Pat is found in Vedic Language, meaning mainly cloth. In the sense of picture the word is found in the Mahabharat (5th century B.C.) and Katyana Sutra. The technique of Pat painting is discussed elaborately in Arya-Manjushriz-Mula Kalpa - an ancient Buddhist text, which has already been translated in Tibetan and Chinise."

খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে বৈয়াকরণিক পানিনি-সৃষ্ট সংস্কৃত ভাষায় ও পালি ভাষায় 'পট্ট' কথাটা খুঁজে পাওয়া যায়। সেখানেও এর অর্থ বস্ত্র বা বস্ত্রখন্ড। রবীন্দ্রনাথ হয়তো এই অর্থ ধরেই লিখেছেন—'পটে আঁকা ছবি' কথাংশটি। তিনি চিত্রাঙ্কনে ব্যবহৃত বস্ত্রের কথাই বুঝিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের অর্থবোধ এবং তাঁর দ্বারা স্বীকৃত অর্থকে শিরোধার্য করে—আমরা পটচিত্র কথাটির ব্যবহার, সঙ্গত মনে করি।

বর্তমানে আমাদের আলোচনা — পটশিল্পের প্রাচীনত্ব নির্ণয়—প্রাচীন পুঁথি ও পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন ইত্যাদি অবলম্বন ক'রে। পটশিল্পের অস্তিত্ব, উল্লেখ, বর্ণনা ইত্যাদি কোন যুগের, কোন গ্রন্থে, বা পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনে পাওয়া যায়, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের আলোচনা কালক্রম অনুযায়ী এগিয়ে যাবে।

আমাদের দেশের পটশিল্প কতো প্রাচীন, এ-প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া বড় কঠিন। কারণ, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের বড় অভাব। স্বাভাবিকভাবে পটচিত্রের উদ্ভবকাল — ইতিহাস অজানা থেকে গেছে। অধ্যাত্মবাদী নিরাসক্ত জীবন-প্রত্যয়ী ভারতীয়দের ইতিহাস রচনায় অনাগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। যদিবা রাজা-রাজড়ার জীবনকথা বা ঘটনা নিয়ে কিছু আধুনিক ইতিহাস রচিত হয়েছে, কিন্তু প্রাচীন যুগের সভ্যতা, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদির ইতিহাস নেই বললে চলে। পুরাতাত্ত্বিক খননকার্যের অভাব, বিদেশী, অনভিজ্ঞ ঐতিহাসিকদের দ্বারা এদেশের ইতিহাস রচনা ইত্যাদি আমাদের ইতিহাসের অভাব ও ত্রুটির কারণ। ইতিহাসের যুগ-বিভাগও অনুমান নির্ভর।

খ্রীষ্টজন্মের পাঁচ হাজাব থেকে বিশ হাজার বছর আগেকার কালকে ঐতিহাসিকেরা পুরোপলীয় (প্যালিলিথিক) যুগ বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁরা বলেছেন, — সে-যুগে স্পেন, চীন, দঃ আফ্রিকা, সাইবেরিয়া ইত্যাদি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মানুষ তাদের বাসস্থান গুহার দেওয়ালে, প্রায় একই বিষয় — শিকার দৃশ্য, পশু-পাখি ইত্যাদি, একই অঙ্কনরীতি — মাত্র দু'একটা মোটা, কালো রঙের পোঁচ এবং একই হাতিয়ার — সূক্ষ্মাগ্র প্রস্তর-খন্ড দিয়ে— গুহাচিত্র অঙ্কন করত। এই থেকে ধারণা হয়, সর্বত্রই গুহাচিত্রঅঙ্কনের ধারাটি অনুসৃত হতো। হয়তো সে-যুগেই, এদেশে অঙ্কিত হয়েছিল বিন্ধ্য-পর্বত গুহায় শিকারীবেষ্টিত গন্ডারের চিত্র, সিংহনপুর (রায়গড়, মধ্যপ্রদেশ) গ্রামের গুহাচিত্র, বেতোয়া নদী (বেত্রবতী, চম্বল উপত্যকা, মধ্যপ্রদেশ) তীরস্থ পর্বত-গুহাচিত্র ইত্যাদি। পুরোপলীয় যুগের পরবর্তী খ্রীষ্টপূর্ব নবপলীয় যুগেও সর্বত্র অঙ্কিত হয়েছে চমৎকার গুহাচিত্র। স্পেনে আলটামিরা গুহাচিত্র, রাণা ঘুনডাই (বালুচিস্তান), শাহী টুম্পা (দঃ বেলুচিস্তান) কুল্লি, চানহুদরো, রাজানপুর ইত্যাদি স্থানের সচিত্র শিল্পদ্রব্য থেকে ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন সেযুগটি ছিল প্রাচীরচিত্রের যুগ। তখনও ভারতের সঙ্গে বহির্দেশের যোগাযোগ ও শিল্পাদর্শের আদান-প্রদান ছিল। আরও জানা যায়, তখন দক্ষিণ ভারতে ছিল দ্রাবিড় সভ্যতার অস্তিত্ব। নবপলীয় যুগের পরে তাম্রযুগের সূচনা হয়। মহেঞ্জোদাড়োর হরপ্পার (পাঞ্জাব), ওঙ্গোরিয়ার (মধ্যপ্রদেশ) শিল্পকলা সেই যুগের সৃষ্টি।

এতক্ষণ আমরা প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতের গুহাচিত্রশিল্পের কিছু ইতিহাস আলোচনা করলাম। উদ্দেশ্য এইযে যে গুহাচিত্র-শিল্পধারা ধরে পরবর্তীকালে এসেছিল পটশিল্প, তার কিছুটা ইতিহাস, পরিচয় জানা থাকলে পটশিল্প সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্টতর হয়ে উঠবে।

অতঃপর, গুহার প্রাচীরচিত্রের স্থানে এলো অনুচিত্র বা 'মিনিয়েচার পেন্টিং'। গুহাচিত্রের আদলে কীভাবে অনুচিত্র এসেছিল তার ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে এখন। ৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বাংলায় পাল ও সেন বংশীয় রাজারা প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকেন। পন্ডিত ভরত ইতিপূর্বে রচনা করে ফেলেছেন তাঁর বিখ্যাত নাট্যশাস্ত্র, যেখানে ছিল উন্নত শিল্পের বহু রীতি-নির্দেশ। এসময়ের ভামহ, আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি শিল্প-বিশেষজ্ঞ বহু রীতি-নির্দেশ লিপিবদ্ধ করেন। তাঁরা সবাই কিন্তু উন্নতমানের শিল্পের কথাই বলেছিলেন এবং নিখুঁতভাবে সেগুলিকে অনুসরণেরও নির্দেশ দিয়েছিলেন। লোকশিল্পী পটুয়ারা তা অনুসরণ করতে পারলেন না। ফলে হলেন তাঁরা শিল্পীসমাজচ্যুত। পরে-পরে হিন্দু-সমাজচ্যুতও। আমাদের এই অনুমান। গুজরাট প্রভৃতির মতো বাংলার পটুয়ারা অনুচিত্র-এর অনুশীলন করতে লাগলেন। তবে তা আঁকলেন জড়ানো পটে। জড়ানো পটতো কয়েকটি অনুচিত্রের পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত সমাবেশ। তবে জনসমক্ষে প্রদর্শনের জন্য কিছুটা বড় করা হলো।

সেই ধরনের, কিছু কিছু প্রাচীন জড়ানো-পট পাওয়া যায় ওড়িশা, আসাম প্রভৃতি রাজ্যের প্রাচীন বিষ্ণু ও শিবমন্দিরে। এসব নিদর্শনের প্রাচীনত্ব প্রমাণে এগিয়ে, কেউ কেউ অনুমান করেন যে, নেপাল-তিব্বতের বৌদ্ধ বিহারে বা গুম্ফায় রক্ষিত টঙ্কাচিত্রের সঙ্গে এগুলির

মিল আছে।[২] অনুমান করা হয়, টঙ্কাচিত্র ভারতীয় পটচিত্রের দ্বারা প্রভাবিত। এবং বাংলার জড়ানো-পটচিত্রশৈলী টঙ্কাচিত্রশৈলীর তুলনায় প্রাচীনতর। তাঁর মূল বক্তব্য— বাংলার পটচিত্র প্রাচীন, সেন রাজাদের আমলেও ছিল। তাঁর ধারণা সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত 'চক্ষুদান পট' (বাঁকুড়া) এবং কালীঘাট পট (১৮শ শতক) পাল ও সেন যুগীয় জড়ানো পটশৈলী অনুযায়ী অঙ্কিত। আমাদের অনুমিত সিদ্ধান্ত এই যে, পট-লিখন-পদ্ধতি অতি সুপ্রাচীন এবং তা প্রচলিত ছিল সারা ভারতে। যুক্তি এই যে, বাংলা, ওড়িশা প্রভৃতি স্থানের জড়ানো পটে — যেমন কয়েকটি আয়তকার পটচিত্রের সমাবেশ ও অঙ্কন থাকে তেমনি গুজরাটেও হাতে-লেখা একাদশ শতকের (১০৬৮) জৈনশাস্ত্র কল্পসূত্র, বসন্তবিলাস (১৪১৫ খ্রীঃ) কাব্য[৩] পুঁথির পাতায় এবং তালপাতার হাতে-লেখা পুঁথিতে আয়তাকার — চৌকো চৌকো স্থানে চিত্র অঙ্কনের পদ্ধতি অনুসৃত হতো। সেগুলিকে অনুচিত্র বলা হয়। সেগুলিকে একরকম পটচিত্রও বলা যায়। সেগুলি খুবই প্রাচীন—বাংলার জড়ানো পটের মতো। আর বাংলার জড়ানো পটের প্রাচীনত্ব সন্দেহাতীত — আর একদিক থেকে। বাংলার কোনো কোনো স্থানে পটচিত্রে মানব-মানবীর মুখমন্ডলের তিন-চতুর্থাংশ, বড় বড় চোখ, দীর্ঘ টানা টানা নাসিকা দেখানো হয়, যেমন দেখা যায় রাষ্ট্রকূট রাজবংশের (৮ম শতাব্দী) সমকালীন ইলোরার গুহার প্রাচীরচিত্রে এবং গুজরাটি অনুচিত্রে।

বাংলার বাইরে — যেমন ওড়িশায়, গুজরাটে তেমনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রাচীনকালে পটশিল্পের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। দেখা যায়, রাজস্থানের যোধপুর, জয়পুর ও উদয়পুরে; মহারাষ্ট্রের পৈথানে; অন্ধ্রপ্রদেশের ওয়ারঙ্গল ও লিগোণ্ডায়, তাঞ্জোরে; ওড়িশার বিভিন্ন স্থানে। নাথদ্বারের 'পারজী-কা-পড়' এবং গুজরাটের জৈন পটগুলিও বিখ্যাত। আরও খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম-দ্বিতীয় শতকে নির্মিত বিখ্যাত সাঁচী স্তূপের তোরণে বেং ভারহুতের তোরণে খোদাই করা হয়েছে বিভিন্ন জাতকের কাহিনী। সেগুলি আয়তাকার; তার চিত্রগুলি ক্রম-অনুযায়ী সাজানো, যেমন জড়ানো পটে থাকে। দেবপ্রসাদ ঘোষ ক্রমিকভাবে সাজানো ছবির সমাবেশে যে-'চরণচিত্র' আছে, জড়ানো পটকে তারই 'শিলা-সংস্করণ' বলে অভিহিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, তোরণে খোদিত চিত্রগুলি আমাদের জড়ানো পটকেই স্মবণ করায়। এখানেও আছে কাহিনীর নিরবচ্ছিন্নতা এবং জড়ানো পটের প্রান্তভাগের মতো গোটানো ভঙ্গি। এ থেকে আমাদের ধারণা জন্মায় যে-খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম-দ্বিতীয় শতকেও জড়ানো পটের অস্তিত্ব ছিল।

বহির্ভারতেও পটচিত্রের প্রাচীন-অস্তিত্বে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকের মধ্য এশিয়ায় চৈনিক তুর্কিস্থানের কুচা অঞ্চলের কিজিল গুহার মধ্যেকার বৌদ্ধ ভিত্তিচিত্রে পটের আদল লক্ষ্য করেছেন দেবপ্রসাদ ঘোষ।[৪] তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে তেমন জোরালো কোনো তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপিত না করলেও, সেকালের বৌদ্ধ-জৈন বিহারে-গুম্ফায় পটচিত্রের যথারীতি অস্তিত্ব দেখে আমাদেরও অনুরূপ ধারণা জন্মায়। তাছাড়াও, সর্বজন-স্বীকৃত তথ্য এই যে, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বুদ্ধদেবের পূর্বজন্ম সংক্রান্ত জাতক কাহিনীগুলি জড়ানো পটে চিত্রিত করে বুদ্ধদেবের নীতি উপদেশগুলির প্রচারে অভ্যস্ত ছিলেন। সেরকম বহু পট তো চীন ও তিব্বতে খুঁজে পাওয়া যায়। পটশিল্পের প্রাচীনতার আরও তথ্য-প্রমাণ

পাওয়া যায়, প্রাচীন ভ্রমণকাহিনীগুলিতে। খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতকে এদেশে-আসা চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন, তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে সিংহলের রাজপথে কাপড়ের ওপর আঁকা বুদ্ধদেবের পটচিত্রের উল্লেখ করেছেন। তাঁর বিবরণীতে এ ব্যাপারে মিথ্যাচার ছিল না। সুতরাং ৪র্থ শতকে পটচিত্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ জাগার কথা নয়। এখন তো বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে পড়েছে দেশ-বিদেশে। জড়ানো পট ছিল প্রচারের অন্যতম ও উৎকৃষ্ট উপায়। ধারণা করা যেতে পারে হয়তো জড়ানো পটের তখন একটি উজ্জ্বল যুগ গেছে। লোকসংস্কৃতিবিদরা জীবন্ত প্রমাণ উপস্থাপিত করবারও চেষ্টা করেছেন। কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন যে, খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে বিহারের বৌদ্ধ-ভিক্ষু গোশাল মথালিপুত্ত সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে — তাঁর প্রাক্-ভিক্ষু জীবনপর্বে ছিলেন নাকি নালন্দাবাসী জনৈক পটুয়া-সন্তান। এই উল্লেখ থেকে আমাদের ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, গোশাল মথালিপুত্তেরও পূর্বে পটচিত্র-ঐতিহ্য এদেশে বর্তমান ছিল, প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেও।[৫]

যেমন পুরাতাত্ত্বিক শিল্প-নিদর্শন, তেমনি পৌরাণিক গ্রন্থাদিতেও পটুয়াদের কথা পাওয়া যায়। খ্রীঃপূর্ব ৪র্থ শতকে বৈয়াকরণিক পানিনীর অষ্টাধ্যায়ীতে সংস্কৃত শ্লোকে স্পষ্টভাবে শিল্পীদের শ্রেণীবিভাগ-সূত্রে ছবি-আঁকিয়েদের অস্তিত্ব উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি সম্ভবতঃ পটুয়াদের কথাই বলেছেন। সেখানে আছে দু'টি শিল্পী-শ্রেণীর উল্লেখ।[৬] (১) গ্রাম শিল্পী, যাঁরা শুধুমাত্র গ্রামের প্রয়োজন অনুযায়ী ছবি আঁকেন বা মূর্তি তৈরি করেন পোড়ামাটিতে, কাঠে বা ধাতুতে। (২) রাজশিল্পী, যাঁরা রাজার আদেশ মতো বা রুচি অনুযায়ী শিল্প সৃষ্টি করেন। যোগসূত্র-রচয়িতা পতঞ্জলি তাঁর পানিনী-সূত্রের ব্যাখ্যা-গ্রন্থ মহাভাষ্য-এ শৌভিক আখ্যাধারী এক শিল্পী-গোষ্ঠীর উল্লেখ করেছেন, যাঁরা কংসবধ ইত্যাদি প্রাচীন কাহিনী চিত্রে রূপায়িত করে পথের ধারে বসে জীবিকার্জন করতেন। অনুমান করা যায়, এঁরা ছিলেন পটুয়া। খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতকে গুপ্ত যুগে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্য কিছু সংখ্যক সাপুড়ে-পটুয়াকে তাঁর গুপ্তচর হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন, সে কথা অষ্টম শতকে বিশাখদত্ত রচিত মুদ্রারাক্ষস গ্রন্থ থেকে জানা যায়, যা প্রমাণ করে সেকালে পটুয়াদের অস্তিত্ব। মহামতি ভাস এর রচিত 'প্রতিমা নাটক'-এর বিষয়বস্তু—রামচন্দ্রের বনবাসগমনের অব্যবহিত পরে পুত্রশোকে রাজা দশরথের মৃত্যু ঘটলে ভরত মাতুলালয়ে রাজার অসুস্থতার সংবাদ শুনেই দ্রুতগতি রথে এসে অযোধ্যায় প্রবেশের প্রাক্‌মুহূর্তে এক মন্দিরে যান। সেখানে ইক্ষাকুবংশীয়, পরলোকগত রাজাদের পাশে দশরথের প্রস্তরমূর্তি দেখতে পান। আমাদের মনে হয়, ভরত দশরথের পটচিত্রই দেখেছিলেন। কেননা, এত অল্পসময়ে প্রস্তরমূর্তি-নির্মাণ অসম্ভব এবং ভাস-এর এই প্রস্তরমূর্তি কল্পনা কষ্টকল্পনা ও অবাস্তব। রামায়ণ, মহাভারত সুপ্রাচীন গ্রন্থ। সেগুলিতে পট প্রসঙ্গে নির্মল কুমার ঘোষ এর অনুমান[৭] রাজপ্রাসাদ-অভ্যন্তরস্থ বর্ণিত চিত্রাবলী পটচিত্রের অনুরূপ এবং প্রদ্যোৎ ঘোষের পর্যবেক্ষণ[৮]— 'পট' কথার অর্থ যে চিত্র, তার প্রথম উল্লেখ মহাভারতে। গ্রন্থগুলি যে যুগেই রচিত হোক, সুপ্রাচীন। এগুলির প্রাচীনত্বের সঙ্গে সঙ্গে পটচিত্রের প্রাচীনত্ব স্বীকার করতেই হয়।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন —'বাঙ্গালী পটুয়া বাঙ্গলার পট অক্ষয় করে রেখেছে অজন্তায়।' গুরুসদয় দত্ত লিখলেন, 'ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসে বাংলার পট সবচেয়ে

প্রাচীন ঐতিহ্য বহন করে চলেছে।[৯] শ্রী দত্ত এই শিল্পকে আরও প্রাচীন — বুদ্ধপূর্ব ও অজন্তা-পূর্ব শিল্প বলে দাবি করেছেন। এবং এটি আদিম ঘরানা সৃষ্টি করেছিল। তাঁর আরও মত — সংস্কৃত সাহিত্যে চিত্রলেখা কথাটি পটচিত্রের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করছে। পটের প্রাচীনত্বের ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন ডঃ ধ্রুব দাস। তিনি লিখেছেন, পটের প্রাচীনতম নিদর্শনটি পাওয়া গেছে মিশরে। আবার ইজরায়েলের এক পর্বতগুহায় ওল্ড টেস্টামেন্টের কাহিনী সম্বলিত জড়ানো পটও সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। তাছাড়া চীন, জাপান, তিব্বত এবং নেপালেও বুদ্ধের জীবনী সম্বলিত পটের প্রচলন রয়েছে, সেই প্রাচীনকাল থেকেই।[১০]

◆ সূত্র ঃ প্রথম অধ্যায় ◆

১. Prodyot Ghosh · Kalighat Pats · annals and appraisal (1966) P.-8
২. নির্মল কুমার ঘোষ ঃ ভারত শিল্প (১৯৮৩), পৃঃ ৪০
৩. ঐ পৃঃ ৪০-৪১
৪. ভারতীয় শিল্পধারা (১৯৮৬) পৃঃ ৫৪
৫. দেবপ্রসাদ ঘোষ ঃ ভারতীয় শিল্পধারা, পৃঃ ১
৬. পানিনীর ব্যাকরণ, সূত্র ৫/৪/৯৫
৭. নির্মল কুমার ঘোষ ঃ ভারত শিল্প
৮. Prodyot Ghosh · Kalighat Pats . annals and appraisal (1966), P-8
৯. গুরুসদয় দত্ত ঃ পটুয়া সঙ্গীত (১৯৩৯)
১০. ডঃ ধ্রুব দাস ঃ সংস্কৃতি মঞ্চ, শারদ সংকলন/পশ্চিমবঙ্গের লোকনাট্য (১৯৯৪)



'সীতাহরণ' পালার একটি দৃশ্য

● দ্বিতীয় অধ্যায় ●

পটকেন্দ্রিক আলোচনার ইতিহাস

লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে লোকশিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই লোকশিল্পের মধ্যে পট একটি উল্লেখযোগ্য বিভাগ। লোকশিল্প পট এবং এই পট তৈরি করেন যে পটুয়া, তাঁদের নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে। এই আলোচকদের মধ্যে ব্রতচারী-খ্যাত স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত, সমাজতাত্ত্বিক লোকসংস্কৃতিবিদ্ বিনয় ঘোষ, বিনয় ভট্টাচার্য যেমন আছেন, সেরকম আধুনিক কালের সাংবাদিক, গবেষকরাও আলোচনা থেকে বিরত থাকেন নি।

গুরুসদয় দত্ত (১৮৮২-১৯৪১) আই. সি.এস, সরকারি কাজে নিযুক্ত থাকা কালে বাংলার বিলুপ্তপ্রায় এই লোকশিল্পটিকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন। গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে তিনি সংগ্রহ করেন বহু পট। পরবর্তীকালে, তাঁর সংগৃহীত পটগুলি গুরুসদয় সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত হয়েছে। ১৯৩০ সালে গুরুসদয় 'পটুয়া' নামে পুস্তিকায় বাংলা এবং ইংরেজি দুই ভাষাতেই পটুয়াদের সম্বন্ধে দু'টি কবিতা লেখেন। বাংলা কবিতাটির পংক্তি সংখ্যা ১১৬ এবং ইংরেজি কবিতাটির পংক্তি সংখ্যা ১১১। এর মধ্যেই গুরুসদয় সমগ্র পটুয়া সমাজের অঙ্কন দক্ষতা এবং চিত্রকরদের সামাজিক অবমাননার চিত্র এঁকেছেন। তাঁর কবিতায় তিনি জানিয়েছেন, পটুয়ারা ময়দানবের পুরীর ছবি এঁকে দিত এবং অজানা দেওয়াল চিত্রও এঁরাই এঁকেছে। অজন্তার দেওয়াল চিত্রের সঙ্গে পটের ছবির মিল দেখেই গুরুসদয় এইরকম ধারণা করেছিলেন। গুরুসদয় দত্তের মহৎ মানসিকতা ফুটে উঠেছে, যখন তিনি লেখেন ঃ

ইচ্ছে করে আমার এদের
কোলে টেনে লয়ে;
ক্ষমা মাগি আমার মূঢ়
জাতির পক্ষ হ'য়ে।

গুরুসদয়ের ইংরেজি 'Patua' কবিতাটি বাংলা কবিতাটিরই অনুবাদ। তিনি লিখেছেন ঃ

Great god ! ordain that darkest night
that blinds out sight
may end in glorious moon,--
on fair Bengal's beloved brow
may that day ere long dawn !

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যার প্রবাসীতে 'পল্লীশিল্প' নামক নিবন্ধে কবি জসীমউদ্দীন পল্লীর শিল্পকলা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই নিবন্ধটিতেই লেখক বিক্রমপুর জেলার মুসলমানদের গাজীর পট দেখিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘোরার কথা বলেছেন। এই প্রসঙ্গে একটি গানের উল্লেখ করেছেন, যেটি গেয়ে গাজীর পট বাড়ি বাড়ি দেখান হতো। গুরুসদয় দত্ত সংগৃহীত পটের গানগুলি নিয়ে প্রকাশিত হয় 'পটুয়া সঙ্গীত' (১৯৩৯) গ্রন্থটি। গুরুসদয়ের

এই বইতে ২৯টি সঙ্গীত স্থান পেয়েছে। তন্মধ্যে ১২টিই শ্রীকৃষ্ণের লীলা সংক্রান্ত। এর পরই বিষয়বস্তুর প্রাধান্যের পরিপ্রেক্ষিতে রামচন্দ্র বা রামায়ণে বর্ণিত কাহিনীর স্থান। ৬টি রামায়ণ কেন্দ্রিক সঙ্গীত। এছাড়াও আছে শিবের মাছ ধরা, ভগবতীর শঙ্খ পরান পালা, ভগবতী মঙ্গল, গোপালন, গৌরাঙ্গ অবতার, জগন্নাথ ও গৌরাঙ্গের গান ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক আখ্যানে আছে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, পুতনা বধ, নন্দোৎসব, বস্ত্র হরণ, ননীচুরি, দানখন্ড, কালীয়দমন ইত্যাদি। রামায়ণকেন্দ্রিক আখ্যানে আছে সম্বু বধ, শ্রীরামের বিবাহ, তাড়কা বধ, অহল্যা উদ্ধার, শ্রীরামের বনবাস প্রভৃতি। শুধু সংগৃহীত গান নয় এই গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে একটি 'পরিচায়িকা' অংশ। যাতে পট-পটুয়া সম্পর্কিত গুরুসদয়ের অমূল্য মতামত সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। প্রাচীন সঙ্গীত ও শিল্পকলার নানাদিক সম্বন্ধে একটি ধারণা হয়। আজ থেকে ছয় দশকেরও আগে পটুয়া সঙ্গীতগুলি সম্পর্কে গুরুসদয়ই প্রথম সুধী, শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পটের গান নিয়ে পরবর্তীকালে আলোচনা করেছেন ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ওয়াকিল আহমেদ প্রভৃতি আরও অনেকে। 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'পটুয়া সঙ্গীত' নিবন্ধটি (১৩৪৬, অগ্রহায়ণ) লেখেন খগেন্দ্রনাথ মিত্র। গুরুসদয় দত্ত কর্তৃক সঙ্কলিত 'পটুয়া সঙ্গীত' গ্রন্থটিকে লক্ষ্য করে নিবন্ধটি রচিত। রচনাটির শুরুতে লেখক লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির উপাদান-সংগ্রহ ও সংরক্ষণের গুরুত্ব বিষয়ে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমাজতাত্ত্বিক লোকসংস্কৃতিবিদ বিনয় ঘোষ 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে (১ম খন্ড) [১৯৫৭] বীরভূম জেলার পানুড়ে/ইটাগোরিয়া সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে পটুয়াদের কথা বলেছেন। এই অধ্যায়ে প্রথমেই পট শিল্পের ধ্বংসের প্রসঙ্গ এসেছে। এছাড়া এসেছে পটুয়াদের সমাজজীবন, লোকাচার, জাতি প্রভৃতি প্রসঙ্গ। জাতি প্রসঙ্গে প্রচলিত কিম্বদন্তির বাইরে ইটাগোরিয়ার সুদর্শন চিত্রকর লেখককে একটি খবর জানিয়েছেন ঃ "এক সময় আমরা সুরাপান করতাম খুব বেশি। দৈনিক শুঁড়ির দোকানে না গেলে আমাদের চলত না। এ অঞ্চলে ধর্মরাজ ঠাকুরের উৎসবের কথা তো জানেন। ধর্ম ঠাকুরের উৎসবে সুরা অন্যতম উপকরণ। উৎসবের সময় প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে বড় মাটির জালা বা ভাঁড় বসান হত এবং সেটি সুরায় পূর্ণ থাকত। জেলে, বাউরি, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি জাতের লোকই উৎসবে যোগ দিত বেশি, কিন্তু আমরা চিত্রকররাই সেই সুরাভান্ডে সর্বপ্রথম মাল্যদান করতাম (৩১১)।"

প্রখ্যাত লোকশিল্পবিশারদ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলার লোকশিল্প' গ্রন্থটি লেখেন ১৯৬১ সালে। এই গ্রন্থের 'পট ও লোকচিত্র' অধ্যায়ে পট এবং পটশিল্প সম্বন্ধে লেখা হয়েছে। এই অধ্যায়ে এক স্থানে লেখা হয়েছে 'বীরভূমের পোটোরা সবাই ধর্মে মুসলমান (পৃঃ ৪৩)'। কিন্তু বর্তমানে আমরা দেখব বীরভূমের অনেক পটুয়াই হিন্দু হয়েছেন। যেমন এখানকার ষাটপলসা গ্রামের বাঁকু পটুয়া হিন্দু ধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন। তিনি মুসলমানদের আর কোন আচারই পালন করেন না। পরবর্তীকালে তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে অনেককে হিন্দু করিয়েছেন। কল্যাণবাবু পটুয়াদের জাতিগত সংস্কার, জাতিচ্যুতির কারণ, উপকরণের কারণে সামাজিক মর্যাদাহীনতা, উপজীবিকা, বিষয়বস্তু, অঙ্কনশৈলী, প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

১৯৬১ সালে সুধাংশু কুমার রায় লেখেন 'The Ritual Art of The Bratas of Bengal'। এই বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়ে লেখা হয়েছে 'Gods and Their Propagation by priests'। এই অধ্যায়ে মঙ্গলকাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে পটের কথাও এসেছে। তিনি জানিয়েছেন — স্ক্রোলগুলো সিনেমা মঙ্গলকাব্যের মতই অনুক্রম করে অঙ্কিত। প্রতি জড়ানো পট দেবতার বড় অঙ্কিত প্রতিমূর্তি দিয়ে শুরু। পরে দেবতার কাহিনী বর্ণনামূলক চিত্র দ্বারা সজ্জিত। সবশেষে যম দরবার। যেখানে যম দরবার নেই, সেখানে নায়কের মুক্তি দৃশ্য। জড়ানো পটের (scrolls) পর যাদু পটুয়াদের কথা বলেছেন। যাদু পটুয়াদের 'দুয়ারী'ও বলা হয়েছে। যাদু/দুয়ারী পটুয়ারা বাস করে পাহাড়ের ওপর দিকে। তাদের সম্পর্ক উপজাতিদের সঙ্গে। যাদু পটুয়ারা স্বর্গে মৃতের লৌকিক সুখভোগের চিত্র আঁকে। সুধাংশু বাবু সেগুলিকে পারলৌকিক পট বলেছেন। সেসব চিত্র উপজাতি কর্তৃক অঙ্কিত চিত্রের উদাহরণ। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লোকসংস্কৃতিবিদ্ ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের 'বাংলার লোকসাহিত্য' (১ম খন্ড) (১৯৬২) গ্রন্থটির 'আঞ্চলিক' অধ্যায়টি পট-পটুয়া-পটের গান সম্পর্কিত। স্বর্গীয় লোকসংস্কৃতিবিদের লেখায় এসেছে—হিন্দুসমাজে পটুয়াদের পতিত হবার কারণ, অনার্য প্রভাব, সাহিত্যে পটের উল্লেখ, চিত্রের বিষয়, পটের শ্রেণীবিভাগ, বাংলায় জীবন ও সাহিত্যে পটগীতির স্থান, পঞ্চকল্যাণী পট প্রভৃতি প্রসঙ্গ। পটের গান অবশ্যই লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। লেখক লিখছেন, 'জনশ্রুতিমূলক বিষয় ও রচনার অনায়াস গুণ এই দুইটি দিক দিয়াই ইহা লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে (২৩৮)।' লেখক এক জায়গায় লিখছেন 'পটুয়া সঙ্গীতের কোন স্থায়ী মূল্য নাই। যতদিন পট অঙ্কন করিবার রীতি সমাজে প্রচলিত ছিল, ততদিন ইহাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সঙ্গীতগুলিও প্রচারিত হইত। পট চিত্রের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত ভাবে ইহারা প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। সেইজন্য পটুয়ার শিল্প ধ্বংস হইবার সঙ্গে সঙ্গে পটুয়া সঙ্গীতও লুপ্ত হইয়াছে (২৪১)।' এখানে আমরা বুঝতে পারি না লেখক কেন 'লুপ্ত হইয়াছে' কথাটি প্রয়োগ করেছেন। পট কিংবা পটের গান এখনওতো কিছুটা হলেও আমাদের মধ্যে টিকে আছে। আগের সেই ব্যাপকতা এখন আর নেই বটে।

লোকসংস্কৃতি-গবেষক প্রদ্যোৎ ঘোষ তাঁর 'Kalighat Pats : annals and appraisal' বইটি লেখেন ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে। এই বইতে তিনি পটের প্রাচীনত্ব, পট শিল্পের ভবিষ্যৎ, পটশৈলী, উপাদান ও নির্মাণ, পটসঙ্গীত, পটুয়াদের ধর্মান্তরের কারণ, কালীঘাট মন্দিরের ইতিহাস, কালীঘাটে পটশিল্পের বিকাশ, কালীঘাট পটের শ্রেণীবিভাগ, বিপনন, কালীঘাট পট ও জড়ানো পটের তুলনা, কালীঘাট পটের অঙ্কন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভাগ, কালীঘাট পট এবং জনশিক্ষা, কালীঘাট পটের অঙ্কনশৈলী প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

গবেষক দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় 'বীরভূমের যম-পট ও পটুয়া' (১৯৭২) বইটি লিখেছিলেন মূলত বীরভূমের পটুয়াদেরকে নিয়েই, অবশ্য সেটা তার নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে। বীরভূমের পটুয়াদের আলোচনা প্রসঙ্গে কালীঘাট পটুয়া, মেদিনীপুরের পটুয়াদের প্রসঙ্গ এসেছে। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ বিভিন্ন লোকশিল্পের সাধারণ সাযুজ্য ও পরস্পর নৈকট্যের কথা মনে রেখেও বলা চলে কালীঘাটের পটুয়ারা যদি বীরভূম থেকে ওই

গোলগাল ফিগার, শেডিং ইত্যাদি ব্যাপারগুলি পরিগ্রহণ করে থাকেন, আমি অবাক হব না। ....বীরভূমের সুপ্রাচীন কিছু পট যদি একেবারেই লোপ না পেত তাহলে হয়তো এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু বলা সম্ভব ছিল (৪)।' অবশ্য লেখক বলেছেন এটি 'নিছক একটি সম্ভাবনার কথা'।

অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'দেখা হয় নাই' (১৯৭৩) গ্রন্থে 'পাঁকুড়হাঁস' এবং 'আখড়াপুঞ্জি'র কথা লিখেছেন। পটচিত্রের প্রসঙ্গ এসেছে 'গুরুসদয় মিউজিয়াম' নিবন্ধেও। এই নিবন্ধে অমিয় বাবু পটচিত্রের প্রকারভেদ, অঙ্কন প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগণার একটি গ্রাম আখড়াপুঞ্জি। অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় 'আখড়াপুঞ্জি' নিবন্ধে এই গ্রামের পোটোপাড়ার কথা বলেছেন। এখানকার সমাজজীবন চিত্রিত হয়েছে তাঁর লেখায়। এখানকার লোকাচার সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক লিখেছেন, 'এক পরিবারের কর্তা ও বড় ছেলে মুসলমান থেকে যান, ছোট ভাই শুদ্ধি নিয়ে হন হিন্দু। কিছুদিন পর কর্তা মারা গেলে, বড় ভাই বলেন তাঁকে কবর দিতে হবে, ছোট ভাই বলেন দাহ করতে হবে। বড় ভাই-এর কথাই টেকে এবং শেষপর্যন্ত তাঁকে কবরই দেওয়া হয় (৪৪)।' ঐ দু'ভাইয়ের মায়ের কথা লেখক লিখেছেন। লেখক জানতে চেয়েছিলেন — 'আচ্ছা মা, এই যে আপনার এক ছেলে মুসলমান আর এক ছেলে হিন্দু, এটা কিরকম লাগে আপনার?' এর উত্তরে সেই মা বলেছিলেন, 'ওরা দু'জনেই আমার নাড়ী ছেঁড়া ধন; আমার কাছে ওরা দু'জনেই সমান (৪৫)।'

ভোলানাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'শিল্প-ভাবনা' গ্রন্থে (১৩৮২) পট সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করেছেন। তাঁর আলোচনায় স্থান পেয়েছে বাঙলার পট ও লোকধর্ম, পট ও পুতুল নাচ, কালীঘাট শাখার বিবর্তন প্রভৃতি। রূপাই সামন্ত লিখিত 'বাঁকুড়ার পটেরি' প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে শারদীয় 'ছত্রাক' (১৩৮২) পত্রিকায়। বাঁকুড়ায় পোটো বা পটুয়াদের বলে পটেরি। মেদিনীপুর কিংবা অন্যান্য জেলার পটুয়াদের চেয়ে এঁরা আলাদা। অন্যান্য জায়গায় মুসলমান ধর্ম গ্রহণের যে লক্ষণ দেখা গেছে, এদের মধ্যে তা দেখা যাচ্ছে না। রূপাই সামন্ত বাঁকুড়ার পটশৈলী বর্ণনা করেছেন। তিনি মনসামঙ্গলের সঙ্গে পটের গানের তুলনা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত 'পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প' (১৯৭৬) গ্রন্থটিতে সুধাংশু কুমার রায় লিখেছেন 'পটশিল্পের ঘরানা' প্রবন্ধটি। এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় পটের শিল্পমূল্য এবং পট শিল্পের বিভিন্ন ঘরানা। লেখক প্রবন্ধের সূচনা অংশে লিখেছেন, ''আজকাল বাঙালী চিত্রকরদের মধ্যে আধা মুসলমানী আচার আচরণ দেখতে পাই কেন? এর পেছনে আছে এক সামাজিক নির্যাতনের করুণ ইতিহাস।' লেখক এখানে 'বাঙালী চিত্রকর' বলতে কি হিন্দু চিত্রকর বলেছেন? কিন্তু হিন্দুই কি শুধু বাঙালী? মুসলমানরা বাঙালী নয়? বাঙলা যাদের মাতৃভাষা তারাই তো বাঙালী, সেক্ষেত্রে মুসলমানরাওতো বাঙালী। প্রশান্ত দা সম্পাদিত 'The two great Indian Artists'(১৯৭৮) গ্রন্থে শিল্পী যামিনী রায়ের প্রসঙ্গ এসেছে। এই বইতে অহিভূষণ মালিক লিখিত 'Jamini Roy's art : is it folkish?' প্রবন্ধে লেখক দেখাতে চেয়েছেন যামিনী রায়ের ছবিতে লোকচিত্রকলার প্রভাব কতটা আছে। এই প্রসঙ্গে অবশ্যই পটুয়াদের কথা এসেছে। কারণ, যামিনী রায়ের চিত্রের সঙ্গে পটুয়া শৈলীর মিল

অনেকেই দেখেছেন। লেখক, কালীঘাটের চিত্রের সঙ্গে যামিনী রায়ের চিত্রের মিল আছে কিনা জানার জন্য কালীঘাটের বিখ্যাত পটুয়া রজনীকান্ত চিত্রকরের মতামতের আশ্রয় নিয়েছেন। রজনীকান্ত চিত্রকর এর উত্তর দিয়েছেন, 'There were many things in common in the works of patuas of different parts of Bengal. Jamini Roy who was not a patua of course, did a kind of art which looked like pat but that which made Kalighat pat different was not there precisely in the works of Jamini Roy (42).' লেখক এই কথার সমর্থন জানিয়েছেন। আসলে যামিনী রায় পট চিত্রের ধারাকে আত্মীকরণ করে নিজের মত প্রকাশ করেছেন।

'বঙ্গলক্ষ্মীর ঝাঁপি' (১৯৭৯) গ্রন্থে অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'পটচিত্র' প্রবন্ধটি। এই লেখায় লেখক পটচিত্র সম্পর্কে একটি সামগ্রিক রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। পটচিত্র শৈলী, পটচিত্রের উদ্ভব প্রভৃতি এখানে আলোচিত। তবে এই আলোচনায় মুলতঃ কালীঘাট পটের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিনয় ভট্টাচার্য তাঁর 'cultural oscillation' (১ম সংস্করণ, ১৯৮০) গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পটুয়াদের বর্তমান ও অতীত অবস্থান সম্পর্কে লিখেছেন —'Patuas : Past and Present distribution'। পরিসংখ্যান-নির্ভর হওয়ায়, পটচর্চার ইতিহাসে এটি একটি মূল্যবান সংযোজন। অবশ্য এখানে তিনি মূলতঃ বীরভূমের পটুয়াদের কথাই আলোচনা করেছেন। সেখানে একসময় ৩৯টি গ্রামে ২৪৮টি পরিবারে মোট ১১৬৮ জন পটুয়া ছিলেন। পরবর্তীকালে স্বাভাবিকভাবেই সেই সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।

'হোম'-এর লোকশিল্প বিশেষ সংখ্যায় (মার্চ, ১৯৮২) পটুয়াদের প্রসঙ্গে পাঁচটি প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। পত্রিকার প্রথম লেখাটি 'হাওড়ার পটুয়াপাড়া ঃ প্রশস্থ ও চন্ডীপুর' তারাপদ সাঁতরা লিখেছেন। শ্রী সাঁতরা পটুয়াদের জাতি-সমস্যা সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে ধর্মান্তরের বিষয়টিও আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ 'লীগ আমলের মুসলমান কর্তা-ব্যক্তিরা এদের (পটুয়াদের) আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, হিন্দুয়ানী কাফেরবৃত্তি ঐসব পট আঁকা বা ঠাকুর তৈরি ছেড়ে দিলে রাজসরকারে তাদের চাকরি দেওয়া হবে (পৃঃ ২)।' এর পরে প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগে এলো হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। এবার আপত্তি তুলল হিন্দু। 'তাদের দাবী প্রবল হল, হয় পুরোপুরি মুসলমান হও, নয়ত শুদ্ধি করে হিন্দু হয়ে পড়—তবে মাঝপথে আর থাকা চলবে না (পৃঃ ৩)।' এরপরে ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামীজীরা এসে শুদ্ধি করে প্রশস্থর পটুয়াদের পুরোপুরি হিন্দু করেছিলেন। পরবর্তীকালে এইভাবে দক্ষিণ ২৪ পরগণা, বীরভূম প্রভৃতি জায়গার বেশ কিছু পটুয়া ভারত সেবাশ্রম সংঘের উদ্যোগে হিন্দু হন। এই প্রবন্ধে তারাপদ বাবু চন্ডীপুরের পটুয়াদের প্রসঙ্গও এনেছেন। চন্ডীপুরের পটুয়াদের ভবিষ্যৎ আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি সরকারি আমলাদের কটাক্ষ করেছেন। 'অবশেষে এখানের পটুয়ারা ঠিক এইসব আনাড়ী আমলাদেরই হাতের পুতুল হয়ে নিজেদের কারিগরি সত্তা বিসর্জন দিয়ে বসলো। বিষয়টা হল, আজকাল কুটির শিল্প ও হস্তশিল্প বাবদ সরকারি ঋণ পাওয়া যায়। তাই ঋণের আবেদনক্রমে ব্লকের শিল্পআধিকারিক এসে বললেন, এসব পুতুল

ফুতুল চলবে না, কেষ্টনগর বা কুমোরটুলির মত করে হাল ফ্যাসানের পুতুল তৈরি করতে হবে তবে ঋণ মিলবে। বেচারা পটুয়া গোষ্ঠি, পেটের জ্বালায় তাই সই (পৃঃ ৪)'। তারাপদ বাবু ক্ষেদোক্তি করেছেন, 'সুতরাং এইভাবেই একদিন চন্ডীপুরের প্রথাগত পুতুলের এখানেই ইতি ঘটিয়ে দিয়ে গেলেন সরকারি আমলারা (৪)।' দুঃখ করার কোন কারণ দেখি না। হয়তো বা সরকারি নিয়মের বাইরে বেরিয়ে আমলা কিছু করতে পারেন নি অথবা তাঁর অজ্ঞতা— অশ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়াও কিন্তু লোকশিল্প পুতুলতো আর একই ধারায় চলত না, পরিবর্তন তার গায়ে লাগতই — যেমন অন্যত্র হয়েছে। 'চন্ডীপুরের পটুয়াদের জীবনালেখ্য' প্রবন্ধে শ্যামলকান্তি দত্ত জানিয়েছিলেন — এই সমস্ত পটুয়াদের আদি নিবাস ছিল হুগলী জেলার খানাকুলে। তখন ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের জন্য খানাকুলে বসবাসকারী পটুয়ারা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েন (পৃঃ ৩৫)।' এথেকে আমরা জানতে পারি খানাকুলেও পটুয়ারা ছিলেন। অরুণ করের 'চন্ডীপুরের পটুয়াদের ধর্মান্তরীকরণ' প্রবন্ধে জানতে পারছি '......অনুন্নত পটুয়াদের কিছুটা জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হয়। অবশ্য এই বিষয়ে পটুয়াদের কয়েকজনও প্রতিনিধিত্ব করে (পৃঃ ৩৭)।' আসলে পাকিস্তান হিন্দুস্থান যুদ্ধের আগে পর্যন্ত পটুয়াদের মুসলমান আচরণ প্রসঙ্গে কারোর কোন মাথা ব্যথা ছিল না। কিন্তু যুদ্ধের পর হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতি ঘটলো। হিন্দুরা পটুয়াদের যেকোন একটি ধর্মগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করলেন। পটুয়ারা যেহেতু পুজোর মূর্তি তৈরি করতেন, সেহেতু তাদের হিন্দু হওয়ার একটা আগ্রহ ছিল। কারণ মুসলমানদের তৈরি মূর্তি হিন্দুরা পুজো করবেন না। সেক্ষেত্রে তাঁদের জীবিকায় পড়বে টান। এই পত্রিকাতেই 'চন্ডীপুরের পটুয়াদের অন্দরমহল' প্রবন্ধে শাশ্বতী দত্ত জানিয়েছেন, 'কয়েক পুরুষ আগে খানিকটা বাঁচার সুবিধার্থে হিন্দু সমাজে চলে আসে, তবে খুব ঘটা করে ওরা ধর্ম ছাড়েনি বা অন্য ধর্ম গ্রহণ করেনি (পৃঃ ৪২)।' জ্যোৎস্না কর্মকার 'পটুয়াদের চালচিত্র' (পৃঃ ৫) প্রবন্ধে বাঁকুড়ার লুয়াড়ি গ্রামের এক পটুয়ার কথা লিখেছেন।

প্রতিবর্ত গ্রুপ অফ কালচারাল স্টাডি পট এবং পটুয়া বিষয়ে একটি সমীক্ষা করেন। প্রশান্ত কুমার সেন সংকলিত 'পট ও পটুয়া প্রসঙ্গে—কিছু পুনরাবৃত্তি কিছু সংযোজন' (প্রতিবর্ত, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮২) প্রবন্ধে সেই সমীক্ষার সংবাদ প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা হয়েছে, 'জমিদারী শাসনে অন্য অনেক কারুশিল্পীর মত পটুয়ারা ছিলেন ধনী মহাজন ও জমিদারদের সাহায্যপুষ্ট। ....কালক্রমে বর্ণ হিন্দুদের অনেকে বিশেষত কুম্ভকার সম্প্রদায়ের লোকেরা মূর্ত্তি নির্মাণের দায়িত্ব থেকে এঁদের হটিয়ে দেয় (৫১)।' অবশ্য সব সময় এই চিত্র দেখি না। মেদিনীপুর জেলার কুমীরমারা গ্রামের এক পটুয়া মুসলমান হয়েছেন। এখানকার মৌলবীরাই জানিয়েছেন, মুসলমান হওয়ার জন্যই ওকে প্রতিমা তৈরি ছাড়তে হয়েছে। কারণ কোরাণে মূর্তি আঁকার কোন নিয়ম নেই। নির্মলকুমার ঘোষ লিখিত 'ভারত শিল্প' (১৯৮৩) বইটিতে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন শিল্পের কথা লেখা হয়েছে। তাতে পটের প্রসঙ্গও বাদ যায়নি স্বাভাবিকভাবেই। পাল-সেন পর্বের চিত্রশিল্প আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক জানিয়েছেন, 'জড়ানো পট বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গেছে। ওড়িশা ও আমাদের প্রাচীন বৈষ্ণব ও শৈব মঠেও এই ধরনের জড়ানো পটের সন্ধান বর্তমানকালেও কিছু কিছু পাওয়া যায়। এই জড়ানো পটের অঙ্কন-পদ্ধতিই নেপাল ও তিব্বতের একাধিক

বৌদ্ধবিহার বা 'গোম্‌ফা' গুহা-গহ্বরে উল্কাচিত্র নামে এখনো রক্ষিত আছে। ......ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম যুগে আঁকা কালীঘাটের পট চিত্রগুলিও এই পাল-সেন যুগের 'জড়ানো পট' চিত্রের চিত্রন-পদ্ধতি বা রীতিতে তৈরি (৪০-৪১)।' এখান থেকে জানতে পারছি 'জড়ানো পট' পাল-সেন যুগের সম্পদ। এদেশে পাল রাজত্ব চলে ৭৪০-১১০০ খ্রীঃ পর্যন্ত, সেন রাজত্ব ১১৬০ থেকে তার পরবর্তীকাল পর্যন্ত চলে। সত্যানন্দ মন্ডল রচিত 'দক্ষিণ ২৪ পরগণার লোকশিল্প' (মে, ১৯৮৪) গ্রন্থের একটি অধ্যায় 'পট'। পটের সাধারণ কয়েকটি আলোচনার পর দক্ষিণ ২৪ পরগণার যেখানে যেখানে পট আঁকা হত সেখানকার কথা লেখা হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার অনেক জায়গায় আগে পট আঁকা হতো। সরেজমিন তদন্তে দেখা গেছে, অনেক জায়গায় এখনও পটুয়া আছেন, কিন্তু পটের বদলে তাঁরা মাটির পুতুল তৈরি করেন।

শ্রীহর্ষ মল্লিকের লেখা 'প্রসঙ্গ লোকচিত্রকলা' গ্রন্থটি ১৯৮৫ সালে প্রকাশ পায়। লোকচিত্রকলার আলোচনায় তিনটি অধ্যায় পট-পটুয়া প্রসঙ্গে। তৃতীয় অধ্যায়ে 'পট পটুয়ার পাঁচালী', চতুর্থ অধ্যায়ে 'পটচিত্র, চলচ্চিত্র ও কমিকস্‌' এবং পঞ্চম অধ্যায়ে 'যীশু পটের সন্ধানে' লেখা হয়েছে। 'পট-পটুয়ার পাঁচালী' অধ্যায়ে শ্রী মল্লিক পটুয়াদের সাক্ষাৎকারভিত্তিক কিছু সাধারণ আলোচনা করেছেন। 'পটচিত্র, চলচ্চিত্র ও কমিকস্‌' অধ্যায়ে লেখা হয়েছে পটচিত্রের সঙ্গে কমিকস্‌, চলচ্চিত্রের কী মিল। লেখক পটের সঙ্গে চলচ্চিত্রের সাদৃশ্য আলোচনার পর লিখেছেন, 'কিন্তু তা হলেও উভয়ের মধ্যে যে প্রধান বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ে, তা হল — জড়ানো পটের ক্ষেত্রে কাহিনীকে সংকুচিত করে কয়েকটি মাত্র দৃশ্যে নিয়ে আসা এবং চলচ্চিত্রে একটি বিবরণকে ভেঙ্গে অসংখ্য চিত্রে সাজিয়ে নেওয়া (৫৭)।' পট, চলচ্চিত্র আর কমিকস্‌-এর মধ্যে, চলচ্চিত্র কমিকস্‌-এর 'মধ্যেই একটি নিবিড় সম্বন্ধ আছে।' লেখক অবশ্য উপসংহারে এসে বলেছেন 'এই তিনটি প্রকরণের একত্র সমালোচনা মোটেই বিজ্ঞানসম্মত নয়। প্রকরণগুলির অন্তর্নিহিত যোগসূত্রটি কিন্তু মূলতঃ এক বলেই মনে হয় (৬৪)।' সাধারণ মানুষ নিয়ে প্রচুর পট আঁকা হয়েছে। বিভিন্ন ধর্মীয় কাহিনীও পটের বিষয়বস্তু হয়েছে। 'এই পটুয়াভূমিতে পটুয়াদের হাতে আঁকা 'যীশুপট' বিশেষ অভিনব ব্যাপার'। এই যীশুপটই শ্রীহর্ষ বাবুর একটি প্রবন্ধের বিষয়। 'যীশু-পটের সন্ধানে' প্রবন্ধে লেখক দেখাতে চেয়েছেন কেন খ্রীষ্টপট কম আঁকা হয়েছে। 'জনরুচি তত তীব্র না হওয়ার জন্যই পটিদাররা এ বিষয়ে দীর্ঘ জড়ানো পটঅংকনে ততটা সময় দেন না — একথা যেমন সত্য, তেমনি অপর দিকে এর দ্বিতীয় কারণটি হলো দর্শকের অর্থনৈতিক অবস্থানঘটিত—সে কথাও ভুললে চলবে না (৬৯)।' আসলে পট শিল্পীরা যীশুর কাহিনীটা ভালভাবে জানেন না। যে-অংশটা আকর্ষণীয় সেই অংশটাই পটুযাদের অজানা।

Heinz Mode এবং Subodh Chandra লিখেছেন Indian Folk Art (১৯৮৫) গ্রন্থটি। এই গ্রন্থেও পটচিত্র বিষয়ক আলোচনা স্থান পেয়েছে। এখানে লেখা হয়েছে পটুয়াদের হিন্দু বিষয়ে আগ্রহের কারণ, যাদু পটুয়া, কালীঘাট পটুয়া, সমাজচিত্র, মধুবনী চিত্রের সঙ্গে এবং ঝালরের (casket) সঙ্গে পটের তুলনা। ১৯ ও ২০ শতকের শুরুতে কালীঘাট চিত্রগুলি যতটা সম্ভব সরল পদ্ধতিতে আঁকা হতো। খুব কম উজ্জ্বল রঙ ব্যবহার করা হতো।

ছবির প্রান্তীয় রেখাবিন্যাস অপরিণত হতো। পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্রণ বা অলংকরণ হতো কম। লেখকদের ভাষায়, 'The nineteenth and early twentieth century Pat paintings of the Kalighat school were executed in the simplest possible manner using a few brilliants colours, crudely out lined, and including only a minimum of detail.'

তাম্রলিপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস কমিটি তমলুকের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে রচিত পটের গানগুলি সংকলিত করেছেন 'পট চিত্র-গীতি' (১৯৮৬) নামে। এই গানগুলি রচনা করেছেন সুশীল কুমার ধাড়া ও গোপীনন্দন গোস্বামী। ১৯০০ সাল থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত ১০টি চিত্র-গীতি ও তমলুক মহকুমার স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘটনাবলী তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। এতে আছে ক্ষুদিরাম ও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, বিপ্লবের সূচনা ও অসহযোগ থেকে লবণ আইন অমান্য, বন্দুক ছিনতাই, ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন ও গঠনকর্ম, ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ, থানা আক্রমণ ও শহীদ কথা, তমলুকে জাতীয় সরকার, মহিষাদলে গান্ধীজী বিষয়ক গান। এই বইতে গোপীনন্দন গোস্বামী 'পটশিল্প ও সঙ্গীত' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। এতে শ্রী গোস্বামী পট ও পটুয়া, পটুয়া জাতির পরিচয়, চিত্র অঙ্কন পদ্ধতি ও রীতি, কাহিনীর ভাষা ও ছন্দ, চিত্র প্রদর্শন পদ্ধতি, পটুয়া চিত্র ও লোকশিক্ষা এবং সবশেষে পটুয়াদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। সঞ্জীব সরকার সম্পাদিত 'প্রসঙ্গ ঃ লোকমাধ্যম' (১৯৮৬) বইটিতেও পটের প্রসঙ্গ এসেছে। 'বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় লোকমাধ্যমের ব্যবহার' প্রবন্ধে বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'প্রায় শতবর্ষ আগে এলোকেশীর মামলা একটা ঘৃণিত ঘটনা। মোহান্তের ঘৃণ্য কাজের কথা প্রথমে ভাটেরা ছড়া ও গান রচনা করে প্রকাশ করেছিলেন। সেদিন ভাটেদের পাশে কালীঘাটের পটুয়ারা দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরা সেদিন মোহান্তর জঘন্য কদর্য ঘটনা নিয়ে পট এঁকে প্রচারে নেমেছিলেন (২৮)।'

'ভারতীয় শিল্পধারা' (১৯৮৬) বইটির লেখক দেবপ্রসাদ ঘোষ। এই গ্রন্থে পটের 'আলোচনাই গুরুত্ব পেয়েছে অধিক। এলাকাভেদে পটে নকশা ও রঙের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য দেখা যায় — লেখক এই বিষয়টিও আলোচনা করেছেন। লেখক মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলী, বীরভূম, বর্ধমান প্রভৃতি জায়গার পটের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করলেও বাদ দিয়েছেন পুরুলিয়া, হাওড়া, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ ২৪ পরগণায় আঁকা পটগুলির প্রসঙ্গ। কিন্তু এই জেলাগুলিতেও যথেষ্ট সংখ্যক পট অঙ্কিত হয়েছে। বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও হাওড়ায় পটুয়ারা পটের কাজ না করলেও পুরুলিয়া এবং মুর্শিদাবাদে এখনও পটুয়া আছেন এবং তাঁরা পটের কাজ করে চলেছেন। শ্রীহর্ষ মল্লিক লিখিত 'প্রসঙ্গ লোকগীতি' (১৯৮৬) বইটিতে বিভিন্ন লোকসঙ্গীত আলোচনা প্রসঙ্গে পটের গানের আলোচনাও এসেছে। 'জড়ানো পটের গান' অধ্যায়ে লোকগীতি হিসেবে পটের গান, পটের গানের বিভ্রান্তিকর নামকরণ, পটের গান ঃ চর্চা ও সংগ্রহ, পটের গানের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য, পটের গানের পাঠান্তর প্রভৃতি বিষয়ে আলোচিত হয়েছে।

বাংলার পটের মতন ওড়িশার পটচিত্রও শিল্পরসিকদের কছে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলার

পটুয়ারা ওড়িশার শ্রীক্ষেত্রকে আদর্শ জায়গা মনে করেন। তাঁদের স্বপ্নের জগতে বারে বারে ভেসে আসে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার মূর্তি। তাই সাধারণত যে কোন বিষয়ে অঙ্কিত পটেই স্থান হয় এই তিনজনের। এতো গেল বাংলার পটুয়াদের কথা, কিন্তু ওড়িশার পটুয়ারা কী করেন? এখানকার পটচিত্র এবং পটুয়াদের প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন সোমনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁর 'নীলাচলের পটচিত্র' প্রবন্ধে (১৩ ডিসেম্বর,'৮৬, দেশ)। কলকাতার কালীঘাটের মন্দিরের মতো পুরীর মন্দিরকে কেন্দ্র করে প্রসার লাভ করে নীলাচলের পটচিত্র। কিন্তু সেখানেও সেই একই চিত্র। এখানে যেমন কালীঘাটের পট অবলুপ্ত হয়েছে, পুরীতেও প্রায় একই অবস্থা। ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত 'চৈতন্য পরিক্রমা' (১৩৯৩ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থে তারাপদ সাঁতরা লিখেছেন 'বাঙালীর শিল্পী সাধনায় চৈতন্য লীলা'। একই গ্রন্থে প্রদ্যোৎ ঘোষ লিখেছেন 'শ্রীচৈতন্য ও বাংলার লোকসংস্কৃতি' (পৃঃ ২৩৭)। এখানেও পটের কথা আলোচিত হয়েছে।

ভারতীয় যাদুঘর প্রকাশ করেছেন 'Album of Art Treasures'(1987)। এটি মূলতঃ কালীঘাট তথা চৌকো পটের কয়েকটি ছবির বর্ণনা। উপরিপাওনা হিসেবে এর সঙ্গে পাওয়া গেছে ঐতিহাসিক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-কৃত কালীঘাট পট সম্পর্কে একটি আলোচনা। শ্রী মুখোপাধ্যায় লিথোগ্রাফকে বাংলা পটচিত্রের অবনতির অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি এও বলেছেন লিথোগ্রাফ অনুযায়ী বহির্রেখা টানা ছবিকে কালীঘাট পট বলা যায় না, কারণ লিথোগ্রাফ হচ্ছে বিদেশী। এই অ্যালবামে বারটি ছবির বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ব্রতীন বাবু লিখেছেন ২৪ পরগণা এবং মেদিনীপুরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিল্পীরা এসে গড়ে তুলল কালীঘাট পটুয়া পাড়া। 'The Kalighat artists initially came to the kalighat area from interalia different areas of the districts of 24 Parganas and Midnapore (or Midnapur)[3]' অবশ্য শোভন সোমের মতন শিল্প-বিশেষজ্ঞরা অন্য কথা বলেছেন তিনি বলেছেন, কলকাতার পটুয়াদের নিয়েই গড়ে উঠেছে কালীঘাট পটুয়া পাড়া। কালীঘাটের পটুয়ারা বাইরে থেকে আসে নি।

'মুর্শিদাবাদ চর্চা'র (১৩৯৫) একটি অধ্যায়ে পুলকেন্দু সিংহ লিখিত 'মুর্শিদাবাদের পটুয়া ঃ জীবন চর্চা ও শিল্প চর্চা'। এই অধ্যায়ে লেখকের আলোচ্য বিষয় হলো — উৎস সন্ধানে বেদে ও পটুয়া, জীবন ও জীবিকা, পটুয়া সমাজ, পট চিত্রকলা, পটুয়া সমাজ, পটের গান, বিয়ের গান, গুপ্ত ভাষা প্রভৃতি। মুর্শিদাবাদের পটচিত্র সম্পর্কে লেখকের অভিমত— 'মুর্শিদাবাদের পটচিত্র পৌরাণিক তথা ধর্মীয় কাহিনীভিত্তিক হলেও এসব চিত্রে ও গানে চিরন্তন মানবিক আবেদন বর্তমান থাকে। ....অঙ্কনরীতি, গায়নভঙ্গি, সুরে জেলাগত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় (১৮৫)।' আনন্দবাজার পত্রিকায় 'রাজনৈতিক কার্টুন' (১৭/৭/৮৮) শিরোনামাঙ্কিত একটি সম্পাদকীয়তে কালীঘাট পটের প্রসঙ্গ এসেছে।

বাংলার হিন্দু পালপার্বণ ও দেবদেবী পূজার যে রীতি-পদ্ধতি আছে, তাতে একসঙ্গে একই কাঠামোয় লক্ষ্মী-সরস্বতী পূজার কোনো উদাহরণ নেই। বেশ খানিকটা পিছিয়ে গেলে দেখা যাবে বাংলার সমাজে লক্ষ্মী-সরস্বতীর কোনো মূর্তিপূজাই প্রচলিত ছিল না। লোকসংস্কৃতি অনুরাগী সুধীর চক্রবর্তী জৈন পরিবারে একই পটে লক্ষ্মী-সরস্বতীর মূর্তি এবং তার পুজোর

সন্ধান দিয়েছেন 'জৈন পরিবারে সরস্বতী পূজা ও একটি পটচিত্র' (দেশ, ২৩/১/৮৮) প্রবন্ধে। অবশ্য কালীঘাটের পটেও আমরা লক্ষ্মী সরস্বতীকে একসঙ্গে দেখতে পাই। পটের গ্রাম হিসেবে মেদিনীপুর জেলার নয়াগ্রামের খুব খ্যাতি আছে। বেশ কয়েক ঘর পটুয়া এখানে থাকেন। এই গ্রামের সম্বন্ধে সুজাতাপন্থী সরকার লিখেছেন 'পটের গান — নয়াগ্রাম' (দেশ, ১৮/৬/৮৮) প্রবন্ধে। সুকুমার রায় লিখিত 'ভারতীয় সঙ্গীত ইতিহাস ও পদ্ধতি' গ্রন্থের (১৯৮৮) 'বাংলা লোকসঙ্গীত' অধ্যায়ে পটুয়ার গান সম্বন্ধে লেখা হয়েছে। লেখক লিখেছেন, 'গানের বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণ লীলা এবং রামলীলার চিত্র ও গান। সত্যপীরের গানও এই পটুয়াদের মাধ্যমে প্রচারিত হয় (পৃঃ ১৬৪)।' বাস্তবক্ষেত্রে বর্তমানে আমরা দেখছি পটের গান শুধুমাত্র এই কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে আর সীমাবদ্ধ নেই। আধুনিক নানা বিষয় — ফরাসী বিপ্লব, আগস্ট বিপ্লব, পণপ্রথা, বৃক্ষ রোপণ, পুলিশ ধর্ষণ প্রভৃতি নানা কাহিনীকে কেন্দ্র করে গান তৈরি করছেন পটুয়ারা। এবং সেগুলি জনগণ বেশ উপভোগ করছেন। সমাজতাত্ত্বিক লোকসংস্কৃতিবিদ্ বিনয় ঘোষ লিখিত 'বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব' (১৩৯৬ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থটি লোকসংস্কৃতি-অনুরাগীদের কাছে খুবই প্রয়োজনীয়। এই গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে 'পটুয়া ও পটশিল্প'। এই অধ্যায়ে লেখা হয়েছে পটুয়া সমাজের নানা কথা, চিত্রশৈলীতে মুসলিম ক্যালিগ্রাফের প্রভাব, ধ্বংসের কারণ প্রভৃতি।

'দৈনিক চেতনা'য় (৪/৫/৮৯) মৎ-লিখিত 'মুন্সীরা গ্রামে গঞ্জে হিন্দু বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে' প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়। মুসলমান মৌলভীরা গ্রামে-গঞ্জে পটুয়াদের পট আঁকতে নিষেধ করছে। তাদের ধারণা, এর ফলে হিন্দুধর্মের প্রচার ঘটছে। মৌলভীদের বক্তব্য পটুয়ারা মুসলমান, তাই তাদের হিন্দু ধর্মবিষয়ক কোন ছবি আঁকা কিংবা গান গাওয়া নীতিবিরুদ্ধ কাজ। এইসব বক্তব্যই এই প্রতিবেদনের বিষয়। মৎ-লিখিত 'কেশিয়াড়ী গ্রামের পটুয়ারা' প্রবন্ধটি 'দৈনিক তীরভূমি' পত্রিকায় (১৩/৮/৮৯) প্রকাশিত হয়। কেশিয়াড়ী থানার জয়কৃষ্ণপুর গ্রামের পটুয়াদের আর্থসামাজিক অবস্থা চিত্রিত হয়েছে এই প্রবন্ধে। সঙ্গে সঙ্গে পটুয়াদের প্রাচীন ইতিহাসও বর্ণিত হয়েছে।

অশোক কুমার কুন্ডু তাঁর 'শুধু পটে লিখা' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫/১০/৮৯) প্রবন্ধে বীরভূমের হাটসেরান্দি গ্রামের পটুয়াদের দুর্গা-পট আঁকার কথা লিখেছেন। দুর্গা-পট আঁকার শিল্পীদের ব্যাপারেও কোন আশার কথা শোনা যায় না। 'পটের ঠাকুরের চাহিদা বাড়েনি। বরং ভবিষ্যতে কমে যাবে।' ময়না সেন 'পট কথা' প্রবন্ধে (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫/১০/৮৯) মেদিনীপুর জেলার নয়াগ্রামের পটুয়াদের কথা লিখেছেন। পটুয়াদের গুরুত্ব এবং তাদের সমস্যা সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে এখানে।

বর্তমান লেখকের 'পটের গান' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় 'দৈনিক তীরভূমি' পত্রিকায় (১৫/১০/৮৯)। এই প্রবন্ধের বিষয় পটের গানের বিভিন্ন দিক। এখানে লেখা হয়েছে— পটের গানে বাঙালী সমাজ চিত্রণ, পটের গানের শ্রুতিনির্ভর তা শব্দ প্রয়োগে গ্রাম্য কবিদের অসাধারণ দক্ষতা ইত্যাদি।

ব্রতচারী-খ্যাত স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্তের 'Folk arts and crafts of Bengal · The

collected papers'(1990) বইটি লোকসংস্কৃতির জগতে একটি অমূল্য সম্পদ। পটচিত্রের বৈশিষ্ট্য, প্রাচীনত্ব, ভবিষ্যৎ প্রভৃতি সম্বন্ধে গুরুসদয় আলোকপাত করেছেন। গাজী এবং যাদু পটুয়াদের সম্বন্ধেও তিনি পৃথকভাবে লিখেছেন। তিনি বিশদ বর্ণনা করেছেন একটি কৃষ্ণলীলা পটের। মেদিনীপুর জেলার নয়াগ্রামের দুখুশ্যাম চিত্রকরের পটের নামডাক আছে। সেই দুখুশ্যামের কথা লিখতে গিয়ে পটুয়াদের ধর্ম, প্রাচীনত্ব, সাহিত্যে পট, চিত্রশৈলী, ধ্বংসের কারণ, ভবিষ্যৎ প্রভৃতি সব কিছু নিয়ে লিখেছেন রবিশঙ্কর বল তাঁর 'পটের আড়ালে' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪/৬/৯০) প্রবন্ধে। পটুয়াদের নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং রাজনৈতিক দলগুলির আগ্রাসী মনোভাব কিভাবে এদের জীবনে প্রভাব ফেলেছে, তাও এই লেখায় দেখানো হয়েছে। সুধীর চক্রবর্তী 'দেশ' পত্রিকায় (২০ এপ্রিল ১৯৯১) লিখেছেন 'বাঁকু পটুয়ার জগৎ'। প্রবন্ধটির প্রথম দিকে লেখক পটের সাধারণ কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করার পর বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বর থানার ষাটপলসা গ্রামের বাঁকু পটুয়ার কথা বিশদভাবে লিখেছেন। বর্তমান লেখকের 'বাংলার লোকশিল্প পট ও পটুয়া' প্রবন্ধটি শারদীয়া 'সমাজশ্রী' (১৩৯৯) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। লেখার বিষয়—পটুয়াদের ধর্মীয় সমস্যা, পটের বিষয়বস্তুর পরিবর্তন, লোকশিক্ষার মাধ্যম পট, বিলুপ্তির কারণ প্রভৃতি। ডঃ বারিদবরণ ঘোষ লিখেছেন 'পট পটুয়া পট গীতি' (১৯৯২) গ্রন্থটি। পটের ব্যুৎপত্তি, পটের ইতিহাস, পটের রকমভেদ, অঙ্কন প্রণালী, পটের ছবির শ্রেণীবিভাগ, কালীঘাট পট, পটুয়াদের ধর্মাচরণ, পটগীতি প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে তাঁর গ্রন্থে। তিনি কয়েকটি গানের সংকলন করেছেন তাঁর গ্রন্থে। পট বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ডঃ ঘোষ পট-শৈলী কেন আলোচনা করেননি বোঝা গেল না। দেবদত্ত গুপ্তের 'অথ বটতলা সম্বাদ' (দৈনিক বসুমতী, ৮/৩/৯২) বটতলা চিত্রবিষয়ক লেখা। বটতলার ছবির আলোচনা প্রসঙ্গে কালীঘাটের পটুয়ার ছবির কথা এসেছে। দেবদত্ত লিখছেন 'কলকাতার বুকে ১৯ শতকে আমরা যে তিনটি উন্নত চিত্রধারা দেখতে পাই তা হচ্ছে যথাক্রমে — কোম্পানি চিত্রকলা, বটতলার ছবি ও কালীঘাটের ছবি।'বটতলার ছবি ও কালীঘাটের ছবি পাশাপাশি রেখে লেখক তুলনা করেছেন, দু'টি ছবির। 'বিষয়বস্তুতেও অনেকভাবে কালীঘাটের সঙ্গে বটতলার ছবির মিল আছে।'

পটচর্চার ইতিহাসে শোভন সোম-এর 'ওপেনটি বাইস্কোপ' (১৯৯৩) বইটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এই বইয়ের 'কলকাতা পটের চালচিত্তির' অধ্যায়ে তিনি কালীঘাট পটের কথাই আলোচনা করেছেন। শিরোনাম থেকেই বোঝা যায়, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পট-পটুয়া সেখানে আলোচনার বিষয় নয়। শ্রী সোম তাঁর আলোচনাকে অন্যদের মতো শুধু কালীঘাটের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন নি, কলকাতার অন্যান্য জায়গার সঙ্গে পটের কেমন যোগাযোগ ছিল তাও দেখিয়েছেন। শোভন বাবু এই অধ্যায়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, কালীঘাটের পটুয়ারা বাইরের থেকে আসেনি, এই কলকাতাতেই তারা ছিল। শোভন সোম লিখেছেন, 'সাকিন কলকাতা পটের পিছনে পটুয়া' (১৯৯৩)। লেখক কালীঘাটের পটের শিল্পমূল্য বিশ্লেষণ করেছেন এই লেখায়। দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মৃৎ সংস্কৃতি' (১৯৯৩) গ্রন্থে আমরা পট বিষয়ক একটি প্রবন্ধ পাচ্ছি 'পটের ভাষা'। পট-পটুয়া বিষয়ক এটি একটি সাধারণ আলোচনা। কোন কিছু প্রকাশ করতে আমরা ভাষার আশ্রয়

নিই। সেই ভাষা সবসময় মুখের ভাষা হবে, সেরকম কোন কথা নেই। চিত্রমাধ্যমেও আমরা নিজেদের প্রকাশ করতে পারি। 'যোগসূত্র' (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৯৩) পত্রিকার কথকতা বিষয়ে বিশেষ সংখ্যায় স্থান পেয়েছে 'বানপট ঃ গান এবং পালা'। এটি লিখেছেন অদিতিনাথ সরকার। আমরা ধরে নিতে পারি কথকতার সঙ্গে পটের গান এবং পালার মিল আছে বলেই পট-বিষয়ক প্রবন্ধটি কথকতা বিষয়ক বিশেষ সংখ্যায় জায়গা পেয়েছে। অদিতিনাথ মেদিনীপুরের নয়া-র দুখুশ্যাম চিত্রকরের আঁকা 'বন্যার বিবরণ' পটটিকে নিয়ে এখানে আলোচনা করেছেন। আলোচনা প্রসঙ্গে পট-পটুয়া বিষয়ক সাধারণ কিছু চিন্তাভাবনাও এসেছে। অশোক ভট্টাচার্যের 'পট চিত্র-শৈলী বিচার' (লোকশ্রুতি ১০, জানুয়ারি, ৯৩) প্রবন্ধে মূলতঃ পটের শৈলী আলোচনায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। লেখক পটচিত্রের সংগ্রহ ও আলোচকদের তিনটি প্রজন্মে ভাগ করেছেন। প্রথম প্রজন্মের অগ্রণী হলেন দীনেশচন্দ্র সেন, দ্বিতীয় প্রজন্মের মধ্যে হলেন গুরুসদয় দত্ত, সুধাংশু কুমার রায়, দেবপ্রসাদ ঘোষ, অজিত কুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। এবং বর্তমান কালে তৃতীয় প্রজন্মের গবেষকগণ কাজ করছেন। 'সরকারি উদাসীনতার দরুণ কালীঘাটের পটশিল্প অবলুপ্তির পথে' (দৈনিক ওভারল্যান্ড পত্রিকা, ৭/৫/৯৩) নিছকই একটি সংবাদ। সেখানে লেখা হয়েছে 'সরকারি উদাসীনতার শিকার হওয়ায় পটুয়া ও পটশিল্প আজ বেহাল হয়ে পড়েছে।' বিষয়টি পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায় না। কারণ কোন শিল্পকেই জোর করে সরকার টিকিয়ে রাখতে পারেন না। রাখতে চেষ্টা করেন মাত্র। তাও বংশপরম্পরায় এত শিল্পীকে সরকারের পক্ষে কীভাবে টিকিয়ে রাখা সম্ভব? শিল্পীদের নিজেদেরই সচেষ্ট হতে হবে। নিজেদের উন্নতির জন্য কো-অপারেটিভ গড়ে তুলতে হবে। পরমুখাপেক্ষী হয়ে যুগের পর যুগ বাঁচা সম্ভব নয়।

বাঙালীর লোকসংস্কৃতি দু'টি বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে, —সমন্বয় প্রচেষ্টা এবং সংহত সমাজের যৌথ ভাবনা। বাংলার লোকসংস্কৃতিতে কোথায়, কীভাবে এই দু'টি বৈশিষ্ট্য প্রভাব ফেলেছে, সেকথা আলোচনা করেছেন ডঃ দিব্যজ্যোতি মজুমদার 'তোমার মায়ার অন্ত নেই' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪/৪/৯৩) রচনায়। এই প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবে পটুয়ার পটের কথাও এসেছে। 'পটুয়া বা পটিদার দ্বারে দ্বারে পট নাচিয়ে বেড়াচ্ছেন। এই মুহূর্তে তিনি এককভাবে ছবি দেখিয়ে কাহিনী বলে চলেছেন, কিন্তু এই পটের পিছনে পরিবারের সকলের যৌথ প্রয়াস রয়েছে। রঙ তৈরি, রঙ লাগানো প্রভৃতি কাজ সাধারণত বাড়ির মেয়েরা করে। কাঠের খেলনা, মাটির পুতুল প্রভৃতি তৈরির মতো এই পটচিত্রণও বাংলার খাঁটি গোষ্ঠী শিল্প।' এখানে ডঃ মজুমদার একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন — 'পট নাচিয়ে'। 'পট খেলানো, পট দেখানো, খিতান করা শব্দগুলোর প্রয়োগ পাওয়া গেলেও, 'নাচিয়ে' শব্দটা তেমন বহুল প্রচলিত নয়।

নাজেস আফরোজ তাঁর লেখা 'বাংলার পট ও পটুয়া' (আজকাল, ৭/৩/৯৩) প্রবন্ধে চিত্রকর, চিত্রকরের ইতিহাস এবং কয়েকজন পটুয়ার সংসারের হালচালের খবর জানিয়েছেন। দেবাশিস চন্দ লিখেছেন 'বাংলার পটের কোনও চাহিদা নেই' (আজকাল, ৭/৩/৯৩)। গৃহসজ্জার জন্য এখন অনেকেই পট কেনেন। এমনকি অনেক কলিকাতাবাসীই এক-একটি পটের জন্য চার হাজার -পাঁচ হাজার টাকা খরচ করতে রাজি আছেন। কিন্তু চাহিদা একমাত্র

রাজস্থানী পটের। নানা কারণে কলকাতার পটের বাজারে বাংলার পটের আজ একেবারেই চাহিদা নেই। আজকাল পত্রিকায় (৭/৩/৯৩) শোভন সোম লিখেছেন—পটের 'বিপননের ব্যবস্থা নেই'। এই প্রসঙ্গে তিনি পটুয়াদের ধর্মাচরণ নিয়ে দু-চার কথা লিখেছেন। 'সোনামাণিক' (ওভারল্যান্ড প্রকাশন) ছোটদের সাহিত্য পত্রিকা। এই পত্রিকায় 'পট ও পটুয়া' বিষয়ে (এপ্রিল, ৯৩) লিখেছেন তপন কর। যেহেতু ছোটদের পত্রিকা, তাই লেখার ধরনটিও ছোটদের উপযোগী করেই। পট কী, পট তৈরির কারিকুরি, কালীঘাট পট প্রভৃতি বিষয়ে এখানে লেখা হয়েছে। পিনাকীনন্দন চৌধুরী লিখেছেন 'নামাজ পড়েন বিশ্বকর্মার নবম সন্তান' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০/১১/৯৩)। হিন্দু-মুসলমান তফাৎবোধ পটুয়া-সমাজে আগাগোড়াই ছিল বিরল। এখনও তার হেরফের তেমন চোখে পড়ে না, কিন্তু 'পট' ক্রমশই তার অতীত গৌরব থেকে তফাতে সরতে সরতে পটুয়াদের করে তুলেছে অন্য পেশামুখী। শ্রী চৌধুরীর লেখার বিষয়বস্তু এটিই। 'পট ও পটুয়া ঃ ফরাসী বিপ্লব থেকে আগস্ট বিপ্লব' (যুগান্তর, ৭/১১/৯৩) প্রতিবেদনটি লিখেছেন গুরুপ্রসাদ মহান্তি। গুরুপ্রসাদ তাঁর লেখায় দেখাতে চেয়েছেন পটের বিষয়বস্তু পরিবর্তন হচ্ছে। বেহুলা লখীন্দর থেকে শুরু করে সাবিত্রী সত্যবান, কালিয়া দমন, কমলে কামিনীরাই ছিলেন এতদিন পটুয়াদের পটের বিষয়। কিন্তু ইদানীং পুরাণ-পৃথিবী থেকে সরে এসে তারা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় বিচরণ করছে। পুরাণের জায়গা নিয়েছে ইতিহাস। পাশাপাশি সমসাময়িক সমাজের সমস্যা নিয়েও পটুয়ারা পট আঁকছেন।

অশোক ভট্টাচার্য্যের লেখা 'বাংলার চিত্রকলা' (১৯৯৪) গ্রন্থটি চিত্রকলার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য সম্পদ। এই বইতে তিনি পট বিষয়ক দু'টি অধ্যায় লিখেছেন, 'পট-চিত্রধারা' এবং 'কালীঘাটের পটশৈলী'। দু'টি অধ্যায়েই মূলত পট-শৈলী আলোচিত হয়েছে। অবশ্য সেই প্রসঙ্গে পট-পটুয়াদের অন্য কিছু কথাও এসেছে। 'কালীঘাটের পট' বিষয়ক একটি প্রবন্ধ পাওয়া গেছে 'আলিপুর বার্তা'র শারদীয়া সংখ্যায় (১৪০১)। লিখেছেন শ্রীধর মিত্র। লেখক কালীঘাট পট সম্বন্ধে একটি ধারণা দিয়েছেন পাঠককে। 'পোটো পাড়ার পট বদল' (সান্ধ্য আজকাল, ১/৭/৯৪) প্রতিবেদনে রবিশঙ্কর দত্ত তেমন নতুন কোন খবর দিতে পারেন নি। পটুয়ার পট বদল প্রসঙ্গে হাওড়ার চন্ডীপুরের পটুয়াদের কথা বলেছেন। চন্ডীপুরের পটুয়াদের পট ছাড়ার কথা আমরা আগেও জানতে পারছি 'হোম' পত্রিকার (মার্চ, ১৯৮২) সৌজন্যে। মেদিনীপুরের হবিচক গ্রামের নিরঞ্জন চিত্রকরকে নিয়ে আলপনা ঘোষ লিখেছেন 'মেদিনীপুরের নিরঞ্জন পটুয়া' (সাপ্তাহিক বর্তমান, ৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৪)। নিরঞ্জনের শিল্পকর্ম নিয়েই এই আলোচনা — অন্য কারোর প্রসঙ্গই এখানে আসে নি।

পটুয়ারা কিন্তু ভাল নেই। এখন অনেকেই বংশগত এই পেশা ছেড়ে অন্য পেশা ধরেছেন। দু'বেলা অন্নের সংস্থান করতে কেউ রিকসা চালাচ্ছেন, কেউ ফেরিওয়ালা, কেউ ট্রেনের হকার। দারিদ্র ওঁদের নিত্যসঙ্গী। এই প্রসঙ্গেই দেবদত্ত গুপ্ত এবং সঞ্জয় সাহা লিখেছেন 'বাংলার পটুয়ারা ভালো নেই' (যুগান্তর, ২৩/২/৯৪)। পটুয়াদের করুণ কাহিনী বর্ণনার পূর্বে পটুয়াদের ধর্মাচরণ সম্পর্কে প্রচলিত কিম্বদন্তী, পটের শ্রেণীবিভাগ প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। মৎ-লিখিত একটি প্রতিবেদন 'পট আঁকার কথা মুন্সিরা জেনে ফেললে ঝামেলা,'

দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় (২৩/২/৯৪) প্রকাশিত হয়। পট শিল্পীরা অস্তিত্ব রক্ষায় আজ বিপন্ন। ধর্ম, অর্থ সর্বত্রই তাদের প্রতিকূল অবস্থা। মেদিনীপুরের পটুয়াদের মুন্সিরা শাসিয়েছে—পট আঁকা বন্ধ করতে হবে। অর্থনৈতিক দুরবস্থা চরম সীমায় পৌঁছেছে পটুয়াদের। পশ্চিমবঙ্গের যে সব জায়গায় পটুয়ারা আছেন তাঁদের সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রতিবেদন এটি। পটুয়ারা নিজেরাই এতে নিজেদের কথা বলেছেন। যুগান্তর পত্রিকায় (৩/৮/৯৪) প্রকাশিত হয়েছে বর্তমান লেখকের 'চন্ডীপুরের পটুয়ারা হাপুও গাইছেন না' শীর্ষক প্রতিবেদনটি। হাওড়া জেলার চন্ডীপুর পটুয়া পাড়ার জন্যই বিখ্যাত ছিল। অথচ এখনকার পোটোপাড়ার নতুন প্রজন্মের ছেলেরা পট ব্যাপারটাই জানে না। চন্ডীপুরের পটুয়া পাড়ার এখন ৩০-৩৫ জন মাটির পুতুল তৈরির সঙ্গে যুক্ত। আলোচ্য প্রতিবেদনে এইসব বিষয়েই লেখা হয়েছে।

ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত 'লোকসংস্কৃতি কোষ' (১৯৯৫) গ্রন্থে ডঃ চিত্তরঞ্জন মাইতি 'পটুয়া' বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ডঃ মাইতি লিখেছেন, 'পটুয়া বৃত্তি একটি মিশ্র বৃত্তি। এককভাবে এই বৃত্তি দিয়ে জীবিকা নির্বাহ সম্ভব ছিল না, এখনও নেই (২২৬)।' কিন্তু আমাদের প্রশ্ন—-একটি মিশ্রবৃত্তিকে কেন্দ্র করে কী করে একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়? আসলে মূল পেশা পট দেখানো, তাতে সঙ্কুলান না হওয়ায় অন্য পেশাকেও অবলম্বন করতে হয়, সেতো অন্য সম্প্রদায়কেও করতে হয়। ব্রাহ্মণ —যজন যাজন যাঁদের পেশা, তাঁদেরওতো কৃষিকাজ কিংবা অন্য কিছু করতে হয়। একই গ্রন্থে মৎ-লিখিত 'পট'-এর বিষয়গুলি হলো পটের শ্রেণীবিভাগ, পট চিত্র অঙ্কনের শ্রেণীবিভাগ, উপাদান, অঞ্চলভেদে তারতম্য, পটের উদ্দেশ্য প্রভৃতি। একটু অন্য ধরনের স্বাদ পাওয়া যায় "কোরিরার মেয়ে বাংলার গ্রামে পটুয়াদের 'বোন" প্রতিবেদনে (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭/৪/৯৫)। লিখেছেন দীপঙ্কর চক্রবর্তী। পট-পটুয়া সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনীতে তিনি যাননি। টোকিওর কাছে ৎসুকুবা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্বের অধ্যাপিকা ডঃ কিম কিসুক কোরিয়ার মেয়ে, জাপানের বউ—তিনি প্রায় প্রতিবছরই মেদিনীপুর জেলার নয়াগ্রামে পটুয়া পাড়ায় কয়েক সপ্তাহের জন্য অতিথি হন। অনেক বছর ধরে দেখতে দেখতে ডঃ কিম কিসুককে শুধু আপনজন নয়, 'বোন' বলে মেনে নিয়েছেন পটুয়ারা। এই লেখা থেকে আমরা কোরিয়া, জাপানে পটচিত্রের অস্তিত্বের খবর পেলেও, ওখানকার পটচিত্র সম্পর্কে সম্যক কোন ধারণা করতে পারি না। কারণ, লেখক ওখানকার পট সম্বন্ধে আর কিছু লেখেন নি। 'শারদীয় ভ্রমণ' পত্রিকায় (১৪০২) কমলেশ কামিলা লিখেছেন 'পটের গ্রাম নয়া'। পটের জন্য বিখ্যাত মেদিনীপুরের এই গ্রামটি পর্যটনকেন্দ্র হিসাবে গুরুত্ব পেতে পারে। দৈনিক বঙ্গলোক পত্রিকায় (১৪/৫/৯৬) বীরভূমের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন 'বিলুপ্তির পথে বীরভূমের পট শিল্প, দুঃখে দিন কাটছে শ্রমিকদের'। সংবাদটিতে বেশ কিছু ভুল চোখে পড়ে। এটি মুদ্রণপ্রমাদ নাকি সাংবাদিকের অজ্ঞতা, তা অবশ্য বোঝা যায় না। শিরোনামে 'শ্রমিকদের' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর পরিবর্তে 'শিল্পীদের' কথাটি ব্যবহার হলে অনেক ভাল হতো। ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী এবং ডঃ দিব্যজ্যোতি মজুমদার সম্পাদিত 'বাঙলার লোকসংস্কৃতি' (১৯৯৬) গ্রন্থটি মূলতঃ সঙ্কলন গ্রন্থ। এতে সঙ্কলিত 'পটুয়া শিল্প' প্রবন্ধটি যামিনী বায়ের লেখা। পট চর্চার

ইতিহাসে অবশ্যই এর একটা আলাদা গুরুত্ব আছে। এখানে মূলত পট-শৈলীই আলোচিত হয়েছে। যামিনী রায় বাংলা দেশের ছবির ইতিহাসে পটুয়া শিল্পকে একটি বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন।

লোকশিল্পের বিকাশে কিংবা উন্নতিতে সমাজসেবামূলক সংস্থাগুলির কী ভূমিকা থাকতে পারে, সেটি 'আশুরালী গ্রামোন্নয়ন পরিষদ'-এর কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত না হলে বোঝা যায় না। 'আশুরালী গ্রামোন্নয়ন পরিষদ' লোকশিল্পীদের নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম কর্মশালার ব্যবস্থা করে চলেছেন। এই কর্মশালাগুলি থেকেই লোকশিল্পীদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান বেরিয়ে আসছে। ২০-২৪ মার্চ'৯৬ এঁরা পটশিল্পের উপর একটি আবাসিক কর্মশালার আয়োজন করেন। এঁদের ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'গ্রামোন্নয়ন'-এর (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬) একটি সংখ্যা ছিল 'পটুয়াগান সংখ্যা'। এই সংখায় সেই কর্মশালার বিভিন্ন কথা লেখা হয়। 'পটুয়া গান সংখ্যায়' সাংবাদিক ইকবাল দরগাই লেখেন 'প্রসঙ্গ পটুয়া' প্রবন্ধটি। 'পট'-এর ব্যুৎপত্তি, সাহিত্যে পট, পটের ছবির শ্রেণীবিভাগ, লোকশিক্ষা, পটুয়াদের বাঁচানোর উপায় প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে এই প্রবন্ধে। পৌরাণিক ও লৌকিক দেবদেবী সম্বন্ধে পুরুষানুক্রমে পট আঁকা ও গান গাওয়া হচ্ছে। 'তবে বর্তমানে পটুয়ারা নানা সামাজিক সমস্যা নিয়েও পট আঁকছেন ও গান বাঁধছেন।' লেখক দৃষ্টান্ত হিসেবে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ডায়মন্ডহারবার থানার আশুরালী গ্রামের অমৃতলাল পাড়ুই-রচিত জাগরণ গীতি (দ্বিতীয় খন্ড) থেকে কিছু গানের উল্লেখ করেছেন। যেমন ঃ গাঁয়ে থেকেই গেয়ে যাবো/ গাঁ বাঁচানোর গান।/হয়তো হেথায় হতেই পারে/হেঁটে চলার সন্ধান। 'গ্রামোন্নয়ন'-এর এই সংখ্যাতেই সৌমেন রায় লিখেছেন 'পট—বাংলার লোকশিল্প ঃ আজকের প্রেক্ষাপট'। লেখক এই লেখায় পট সম্পর্কিত গতানুগতিক কোনও আলোচনা করেন নি, লোকমাধ্যম হিসেবে পটের কী ভূমিকা সেই কথাই আলোচিত হয়েছে। সাপ্তাহিক 'আলিপুর বার্তা' পত্রিকায় (৩০/৩/৯৬) এই কর্মশালার সংবাদটাই লেখেন সাংবাদিক দীপ্তেশ মন্ডল 'ডায়মন্ডহারবারের গ্রামে কর্মশালা, পটুয়ারা আবার উদ্যম ফিরে পেলেন' শিরোনামে। এই প্রতিবেদনটি 'গ্রামোন্নয়ন' পত্রিকার আলোচ্য সংখ্যাটিতে সংকলিত হয়েছে। এটি নিছকই একটি সংবাদ। তাই কর্মশালার বর্ণনাই এর লক্ষ্য। তবে একটি কর্মশালা কীভাবে পটুয়াদের প্রভাবিত করতে পারে সেটিও শ্রী মন্ডল লিখেছেন। 'পটের মাধ্যমে শিল্পীরা সামাজিক চিত্র তুলে ধরে তার সাথে স্বরচিত মাধ্যমে যে-প্রতিভার নমুনা রাখেন তার মূল্য ক্রমশই মূল্যহীন হয়ে পড়েছে আজকের মূল্যবোধহীন সমাজে, এর ফলে শিল্পীদের মধ্যে যেমন তৈরি হচ্ছে হীনমন্যতা, তেমনি শিল্পের অস্তিত্বেরও সংকট দেখা দিয়েছে। আর এই সংকট মোচনের তাগিদেই এই কর্মশালা।' নির্মল কর দৈনিক বর্তমান পত্রিকায় (১৩/১০/৯৬) লিখেছেন 'পটের দুর্গা'। প্রচলিত জড়ানো পট, কালীঘাট পট তথা চৌকো পটের বাইরেও এক প্রকার পট ছিল, যে পটে পুজো হত।

বিমলেন্দু চক্রবর্তী লিখিত 'লোকায়ত বাঙলার চিত্রশিল্পী ও চিত্রকলা' বইটি (২ ফাল্গুন, ১৪০৩) মূল পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত—বাঙলার চিত্রকর, বাঙলার পট ও পটুয়া, পটের আঙ্গিক ভাবনা, কালীঘাটের পট, পটের শেষ অধ্যায়। পট ও পটুয়াদের অস্তিত্ব পৃথিবীতে

বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায়। শ্রী চক্রবর্তী প্রসঙ্গক্রমে ইউরোপের 'যোশুয়া'(Joshua roll) বা চীনের 'ড্রাগন' পটের উল্লেখ করেছেন। কিশোর নাগ লিখেছেন 'পটুয়ারা আজ অন্য বৃত্তিতে, নতুন প্রজন্ম পটচিত্র দেখতে বা তার গান শুনতে আর ততটা উৎসাহ দেখায় না।' (দৈনিক সুপ্রভাত, ১৯৯৭)। পট-পটুয়া সম্পর্কে সাধারণ কয়েকটি কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গ্রামীণ লোকায়ত চিত্রকলা আর 'নগরকেন্দ্রিক আধুনিক চিত্রকলার' পার্থক্য খুঁজেছেন। সাপ্তাহিক 'আলিপুর বার্তা' পত্রিকায় (৪-১০ জানুয়ারি, ১৯৯৭) মৎ-লিখিত একটি প্রবন্ধ 'নগ্ন সরস্বতী ঃ শিল্পীর স্বাধীনতা ঃ হতভাগ্য পটুয়ারা'। চিত্রশিল্পী মকবুল ফিদা হুসেন দেবী সরস্বতীর নগ্ন মূর্তি এঁকেছিলেন। এর প্রতিবাদে বজরং দল তাঁর ছবি পুড়িয়ে দিয়েছে। হুসেনের সমর্থনে প্রতিবাদ মিছিল বেরিয়েছে। বলা হয়েছে খাজুরাহ কোনারক প্রভৃতি প্রাচীন মন্দির গাত্রের মিথুন মূর্তিগুলি যখন শিল্পকর্ম বলে আদৃত হচ্ছে, তখন এক হিন্দু দেবীর নগ্নতা নিয়ে কেন এত হইচই? যাই হোক পক্ষে-বিপক্ষে বহু লোক। এই প্রতিবেদনে মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ি থানার জয়কৃষ্ণপুর গ্রামের পটুয়াদের কথা বলা হয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে জানতে পারা গেছে, 'এখানকার মুন্সীরা বলেছে, মুসলমান পটুয়ারা হিন্দু দেব দেবীর ছবি আঁকলে তাদের একঘরে করা হবে।' পরবর্তীকালে ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ভাঙার সেই বিতর্কিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখানে ঘটেছে তান্ডব। 'পোটোদের উপর খুব অত্যাচার করেছে মুন্সীরা। কিছু পট পুড়িয়েও দিয়েছে। পটুয়ারা সেই যে ভয়ে চলে গেছে আর ঘরে ফেরেনি।' এই লেখাতে যেটি বলতে চাওয়া হয়েছে সেটি হল 'শিল্পী হুসেনের সাম্প্রতিক এই ঘটনা নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে অনেক যুক্তি দেখানো হয়েছে। দুর্ভাগ্য বাংলার লোকশিল্পী পটুয়াদের এই বিপন্নতা নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য কেউ করেন নি।'

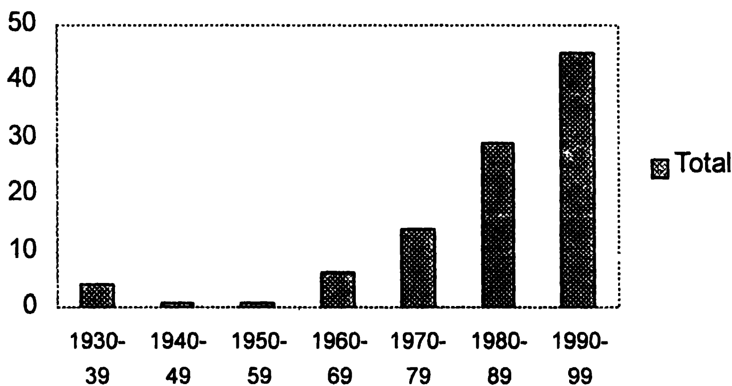
'শারদীয়া নবান্ন ভারতী' (১৪০৪) পত্রিকায় মৎ-লিখিত প্রবন্ধ 'বাংলার লোকশিল্প পট ও পটুয়াদের ভবিষ্যৎ' প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে পট শিল্প ধ্বংসের কারণ এবং পট শিল্প কীভাবে টিকে থাকবে সেটিই আলোচিত হয়েছে। 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় (২৬/৪/৯৮) সুভাষ সরকার এবং রক্তিম দত্ত লিখেছেন 'High & Dry'। এক সময় পটুয়াদের খুব রমরমা ছিল। কিন্তু দিনবদলের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ তারা হারিয়ে যেতে লাগল। এই বিষয়বস্তুই তাঁদের লেখায় ফুটে উঠেছে। 'দেশ' পত্রিকায় (৮/৮/৯৮) ডঃ জ্যোতিরিন্দ্র জৈন লিখেছেন 'কালীঘাটের পটুয়াদের নূতন মূল্যায়ন শুরু হয়েছে'। শিল্পবিশেষজ্ঞ ডঃ জৈন কালীঘাটের পটকে বিশ্লেষণ করেছেন বিভিন্ন নান্দনিক এবং সামাজিক দিক থেকে।

'লোকশ্রুতি' ১৪ (আগষ্ট, ১৯৯৮) সংখ্যায় বর্তমান লেখকের 'চিত্রকর পটুয়াদের জীবন-জীবিকা ও সামাজিক পরিবর্তনের ধারা' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে। পটুয়াদের মিশ্র জাতিতত্ত্ব হওয়ায় এদের সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার ও রীতিনীতি বৈচিত্রপূর্ণ। বিচিত্র সেই আচারগুলি এখানে আলোচনা হয়েছে। 'সাপ্তাহিক বর্তমান' পত্রিকায় (৫/১২/৯৮) অজয় ঘোষাল লিখেছেন 'অনসর পট এবং রঘুরাজপুরের পট শিল্প'। ওড়িশার রঘুরাজপুরের পট শিল্পীরা প্রকৃতি থেকে নানা রঙ নিয়ে আঁকেন অনসর পট। এই প্রবন্ধে শ্রী ঘোষাল সেই পটশৈলীর কথা লিখেছেন।

পটকেন্দ্রিক আলোচনার গভীরে (১৯০০ ১৯৯৯)

[দশকের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশিত আলোচনার সংখ্যা]

সময়সীমা	পট শিল্প	পটুয়া জীবন	পটের গান	পট পটুয়া (শিল্প ও জীবন	পট পটুয়া পটের গান সামগ্রিক ভাবে	কালীঘাট পট	মোট
১৯৩০-১৯৩৯	১	২	১				৪
১৯৪০-১৯৪৯			১				১
১৯৫০-১৯৫৯		১					১
১৯৬০-১৯৬৯	৪			১	১		৬
১৯৭০-১৯৭৯	৭	৪				৩	১৪
১৯৮০-১৯৮৯	৯	১২	৫	১	১	১	২৯
১৯৯০-১৯৯৯	১৫	১৭	১	৬	১	৫	৪৫
মোট	৩৬	৩৬	৮	৮	৩	৯	১০০



এই লেখাচিত্রটি থেকে বোঝা যাচ্ছে সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পটকেন্দ্রিক আলোচনার হার বেড়েছে। এখানে ১০০টি আলোচনাকে বেছে নিয়ে আলোচকদের প্রবণতাকে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে আলোচকদের পট এবং পটুয়া বিষয়ে সমানে আগ্রহ। দু'ক্ষেত্রেই আলোচনার হার ৩৬%। সে তুলনায় পটের গান স্বল্প আলোচিত—মাত্র ৮%। পট ও পটুয়া অর্থাৎ শিল্প এবং জীবন যুগ্মভাবে আলোচিত ৮%। পট পটুয়া ও পটের গান অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে শিল্প এবং তার শিল্পীকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে প্রবণতা সব থেকে কম—মাত্র ৩%। পট শিল্পের ইতিহাসে কালীঘাট পটের আলাদা একটি গুরুত্ব আছে। সেই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে ৯%। সামগ্রিকভাবে একটি শিল্প এবং তার শিল্পী জীবনকে নিয়ে আলোচনা কম হওয়ার কারণে সেই অভাব পূরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে এই গ্রন্থে। কারণ শিল্পীকে বাদ নিয়ে শিল্প হয় না। অথচ সেই শিল্পীজীবন যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি। পটুয়ারা আজ নানা সমস্যায়—এমনকি জাতপাতের সমস্যায়ও জর্জবিত। ক্ষেত্রানুসন্ধানে গিয়ে মুখ ফেরানো যায়নি সেদিক থেকেও। সত্যনিষ্ঠভাবে সেগুলি উপস্থাপিত হয়েছে এখানে।

● তৃতীয় অধ্যায় ●

পটের শ্রেণীবিভাগ এবং প্রস্তুতি-কৌশল

পূর্ববর্তী গবেষক, আলোচকগণ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে পটের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। সকলেই সৌন্দর্য-রসিক, সঙ্গীত অনুরাগী এবং লোকসংস্কৃতিবিদ-চিন্তাবিদ্। গুরুসদয় দত্ত পটসঙ্গীতগুলিকে দেব-দেবীর লীলা বিষয়ক — লীলা কাহিনী, দেবদেবী সম্বন্ধে ছড়ার পাঁচমিশালী সমাবেশ—পাঁচকল্যাণী এবং গোপালন বিষয়ক—এই তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন। গুরুসদয় দত্ত স্পষ্টতঃ পটগীতির শ্রেণীবিভাগ করলেও, বলা যায়, পটের শ্রেণী বিভাগ ব্যাপারটি তিনি গভীরভাবে চিন্তা করেননি, এমন নয়। তিনি যেন পরোক্ষে পটের শ্রেণী-বিভাজন করেছেন গীতিগুলির বিষয়বস্তুর দিক থেকে। তিনি হয়তো এইভাবে শ্রেণীবিভাগ করেছেন —(১) লীলাকাহিনী বিষয়ক, (২) পাঁচকল্যাণী বিষয়ক এবং (৩) গোপালন বিষয়ক। যা হোক, যেহেতু তিনি স্পষ্টভাবে তার উল্লেখ করেন নি, সেইহেতু আমাদের মন্তব্যের কথা ওঠে না।

অপর এক লোকসংস্কৃতিবিদ্ তাঁর গ্রন্থে[১] পটুয়াদের চিন্তাধারা ও পটের বিষয় অনুসারে, পটগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে বলে, জানিয়েছেন। (১) যে পটুয়ারা মূলতঃ হিন্দু পৌরাণিক প্রসঙ্গ আঁকে (২) যে পটুয়ারা স্বর্গ ও নরকের ধারণা এবং মৃত্যুর দেবতা যম কর্তৃক পাপীদের উপর যন্ত্রণার চিত্র তুলে ধরে (৩) যে পটুয়ারা উপজাতির উৎস বিষয়ে (পঃ বঙ্গের সাঁওতালদের মধ্যেই মূলতঃ বেশি) এবং মৃতের মরজগৎ থেকে মৃত্যুর ঊর্ধ্বে জীবন বিষয়ে আঁকে। বিনয় ঘোষ নৃ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীতে পটুয়াদের শ্রেণী-বিভাগ করেছেন। তিনি যেন যম পট ও সাঁওতাল পটের ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন, তবে তাঁর শ্রেণীবিচার নির্ভুল।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লোকসংস্কৃতিবিদ্ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য পটের বিষয়গত ও আকারগত দিক থেকে পটের শ্রেণী-বিচার করেছেন তাঁর গ্রন্থে। পটের আকার অনুযায়ী তাঁর এক শ্রেণীর পটের নাম চৌকো পট, যাতে একটি চিত্র বিচ্ছিন্নভাবে আঁকা হয়। এতে গান সহ ব্যাখ্যা করবার রীতি নেই। অপর শ্রেণীর নাম দীঘল পট বা জড়ানো পট। এতে কোনো বিষয় ওপর থেকে নিচের দিকে অঙ্কিত কয়েকটি বিচ্ছিন্ন চিত্র, গানসহ ব্যক্ত করা হয়। এবং বিষয়গত দিক থেকে শ্রেণী-বিচার — বেহুলা-লখীন্দর-মনসা বিষয়ক; রামায়ণ বিষয়ক; ভাগবদ্ বিষয়ক।[২] এছাড়াও, গাজীর পট নামে এক শ্রেণীর পটের উল্লেখ আছে। উক্ত শ্রেণী-বহির্ভূত, এবং সংখ্যায় অতি অল্প পট, যেমন —কমলে কামিনী, সাহেব পট, গৌরাঙ্গ লীলা ইত্যাদি — উল্লিখিত হয়েছে।[৩] তিনি একই পটের বিস্তারে বিভিন্ন দেব-দেবীর সংক্ষিপ্ত লীলা বর্ণিত হয়, এমন পটের শ্রেণীর নাম দিয়েছেন — পঞ্চকল্যাণী। গুরুসদয় দত্ত যার নাম দিয়েছেন পাঁচকল্যাণী। পঞ্চকল্যাণী নামেই স্বয়ংপ্রকাশ — বিভিন্ন দেবদেবীর এখানে সমাবেশ এবং তাঁদের সম্পর্কে ছড়া ও গানের পাঁচমিশালি সমাবেশ।

পঞ্চকল্যাণী নামটি আরও কেউ কেউ স্বীকার করে নিয়েছেন। আমাদেরও স্বীকার করে নিতে বাধা নেই। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চকল্যাণী পট সংখ্যায় কম পাওয়া যায়, কিন্তু কেউ কেউ এর যথেষ্ট গুরুত্ব ও তাৎপর্যের অসামান্যতা লক্ষ্য করেছেন। গবেষক দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পঞ্চকল্যাণী শুধুমাত্র নানা দেবদেবীর সমাবেশ ও ছড়া গান ছাড়াও অন্য কিছু মনে হয়েছে।[৪] এর নির্মাতাদের বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়-সমন্বয়ের পরিকল্পনা ও প্রয়াসের জন্য যে উদার, অসাম্প্রদায়িক মানসিকতায় প্রাচীন বৈষ্ণব কালী পূজায় জবা ফুলের অর্ঘ্য পাঁছে দেয়, মুসলমান তার ধর্ম পালনের সঙ্গে সঙ্গে তুলসী গাছেরও সমাদর করে তার গৃহ-প্রাঙ্গণে[৫] সেই মানসিকতায় অনুপ্রাণিত হয়ে পটুয়ারা এসব পট সৃষ্টি করে। শ্রী দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় পঞ্চকল্যাণী পটকে অর্বাচীন সংযোজন বলেছেন।[৬] কিন্তু আমাদের অসাম্প্রদায়িক এই দেশে পঞ্চকল্যাণীকে অর্বাচীন সংযোজন ভাবা যায় না।

গবেষক ডঃ বারিদবরণ ঘোষ পটচিত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী, বহু উদাহরণসহ পটচিত্রগুলিকে পাঁচটি জাতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৭] যেমন — (১) পৌবাণিক ঃ বামন কর্তৃক বলী দমন, নটরাজ শিব, কৃষ্ণ কোলে যশোদাদেবী, লক্ষ্মী, গণেশ, অন্নপূর্ণার কাছে শিবের ভিক্ষা, সতীদেহ স্কন্ধে শিব ইত্যাদি। (২) প্রকৃতি ও স্থির চিত্র ঃ জোড়া মাছ, প্রসাধন, সবুজ টিয়া পাখি, শিয়াল রাজার দরবার ইত্যাদি। (৩) প্রতিদিনের চিত্র ঃ সেতারবাদিকা, বাবুকে হুকা দান, দর্পণ হাতে রমণী, ভাইফোঁটা ইত্যাদি। (৪) ঐতিহাসিক ঃ গৌর-নিতাই, বৃটিশ সৈন্যের কুচকাওয়াজ, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ, বিচার দৃশ্য ইত্যাদি। এবং (৫) ব্যঙ্গচিত্র ঃ তারকেশ্বরের মোহন্তের বিপদ, বাবু, নারীর পদতলে বাবু, সুরা ও সাকী ইত্যাদি। এইভাবে শ্রেণী নির্ণয়ের ক্ষেত্রে চিত্রের তাৎপর্যের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে সত্য, কিন্তু পটের কার্যধারা ততটা স্পষ্ট হয় না।

লোকসংস্কৃতিবিদদের এই বিভাগগুলির কথা মনে রেখে আমরা পটের নিম্নরূপ প্রকারভেদ করতে পারি। (ক) আকার অনুযায়ী, এবং (খ) বিষয়বস্তু অনুযায়ী। আকার অনুযায়ী বিভাজনটি আবার দু'টি ধারায় বিভক্ত করা যায়। যেমন— (১) জড়ানো পট এবং (২) চৌকো পট। জড়ানো পট আবার দু'ভাগে বিভক্ত। যেমন—(১) আড়ে লাটাই এবং (২) লাটাই। আড়াআড়িভাবে লম্বা যুক্ত পট-ই আড়ে লাটাই। এতে ৭-৮টি ভাগ বা খোপ রয়েছে। এর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ যথাক্রমে ৪০০ সে.মি. এবং ১৫-২০ সে.মি. এবং লম্বালম্বিভাবে বিস্তৃত পট-ই লাটাই পট নামে প্রচলিত। সব থেকে বেশি পঁচিশটি পর্যন্ত খোপ থাকে। এর দৈর্ঘ্য ১৫০ সে.মি. এবং প্রস্থ ২৮-৩৫ সে.মি.। কালীঘাটের চৌকো পটের সঙ্গে এর তফাৎ হলো, দীর্ঘ পটটি লাটাইয়ের মত জড়িয়ে রাখা হয়। অথবা দেখানোর পর লাটাইয়ের মতো গুটিয়ে রাখতে হয়। আর এই কারণেই লোকচিত্র-গবেষক প্রণব রায় একে লাটাই পট বলতে আগ্রহী।[৮] জড়ান পট শব্দটি এত উদার যে, তাকে বিশেষিত করতে পূর্বোক্ত শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। রামায়ণে বর্ণিত চিত্রসজ্জা কিংবা দুর্গা প্রতিমার চালচিত্রের সঙ্গে জড়ানো পটের মিল আছে। বর্ণনার এই ভঙ্গীতে পটচিত্রের প্রভাব থাক বা না থাক, ধারাবাহিক চিত্রের মাধ্যমে বক্তব্য বিষয় উপস্থাপন যে অতি প্রাচীনকালের এবং তা ভিন্ন ভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো — এ সত্য প্রকাশ পায়।[৯]

সুতরাং, প্যানেলধর্মী চিত্র বলতে যে উদার অর্থে ধারাবাহিকভাবে অঙ্কিত দৃশ্যাবলী বোঝান হয়েছে — এ বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না। এই ধারাবাহিকতাকে কে, কিভাবে রক্ষা করেছেন, সেটাই হল বিবেচ্য। বিশেষতঃ জীবনীমূলক চিত্র রচনার ক্ষেত্রেতো বটেই।[১০] আকার অনুযায়ী পটের দ্বিতীয় ভাগটি হলো চৌকো পট। এতে একটি চিত্র থাকে। এর আবার, আকার তিন রকমের। যেমন—বৃত্তাকার, আয়তাকার, ও চৌকো। কালীঘাট পট চৌকো পটেরই দৃষ্টান্ত। বিষয়বস্তু অনুযায়ী পটের বিভাজন ঃ— (অ) ধর্মীয় পট, (আ) ধর্ম-নিরপেক্ষ পট। ধর্মীয় পট আবার, দু'টি ভাগে বিভক্ত। যেমন— (১) পৌরাণিক পট, ও (২) লৌকিক পট।

পৌরাণিক পট ঃ— (ক) হিন্দু পট (খ) মুসলমানী পট (গ) খ্রীষ্টীয় পট (ঘ) জৈন পট এবং (ঙ) বুদ্ধ বিষয়ক পট।

লৌকিক পট ঃ (ক) লৌকিক দেব দেবীর পট, (খ) লৌকিক উপাখ্যানমূলক পট।

(আ) ধর্ম-নিরপেক্ষ পট ঃ সমসাময়িক ঘটনা এবং স্থানীয় মানুষের আগ্রহ ও উৎসাহমূলক। যেমন — বধূ নির্যাতন, পণপ্রথার বিরোধিতা, বৃক্ষরোপন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ইত্যাদি। এই সূত্রে বলা যায়, ধর্মীয় পটের প্রচলন এর তুলনায় বেশি। আবার, হিন্দু ধর্মেরই জনপ্রিয় কাহিনীভিত্তিক ধর্মীয় পটই বেশি। যেমন— রামায়ণের রাম-রাবণ যুদ্ধ, রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা, সীতার বনবাস, বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনী, চাঁদসদাগরের নৌকাডুবি ইত্যাদি।

উক্তরূপে পটের শ্রেণী-বিভাগ করা গেল। সেই সূত্রে ধর্ম-নিরপেক্ষ পটের আলোচনার সূত্রপাত। এই প্রসঙ্গে এর পর এদেশের প্রাচীন কয়েকটি সম্প্রদায়ের পটুয়া-শ্রেণী এবং তাদের অঙ্কিত অধিকাংশ ধর্ম-নিরপেক্ষ বিশেষ প্রকারের পট প্রসঙ্গে যথোচিত গুরুত্বসহ কিছু না বললে আমাদের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কেননা, পটশিল্প জগতে নানাদিক থেকে এরা এবং এদের শিল্প উল্লেখ্য বটে! সাঁওতাল সমাজে প্রচলিত আছে স্বতন্ত্রগোছের দু'এক ধরনের পট। যেমন — যাদু পট, চক্ষুদান পট ইত্যাদি। মালদা, বড়বাজার, মালবাজার, জয়পুর, রঘুনাথবাড়ি, পুরুলিয়া, উত্তর-পশ্চিম বাঁকুড়ায় শুশুনিয়া-নিকটবর্তী কালীপাহাড়ী গেরামদি (ছাতনা থানা), শালবেড়িয়া (শালতোড়া) ইত্যাদি উপজাতি বিশেষত সাঁওতাল-অধ্যুষিত ঐ অঞ্চলগুলিতে এজাতীয় পটের শিল্পীরা থাকেন। যাদু পটের শিল্পীরা কী চমৎকার ক্রম অনুযায়ী সাঁওতালদের উৎপত্তির গল্পটা পটে আঁকেন! ভাবলে বিস্মিত হতে হয়—

(ক) সমগ্র বিশ্ব-চরাচর জলমগ্ন। তার ওপর উড্ডীয়মান একটি রাজহংস অন্যটি রাজহংসী। তারা বিশ্রাম নেবে। কিন্তু কোথাও এতটুকু মাটি দেখা যায় না যে।

(খ) বিশাল জলরাশির মধ্যে এক কেঁচো এক টুকরো জমি তৈরি করলো।

(গ) রাজহাঁস দু'টি সে-জমির ওপর বসবাস করতে লাগল এবং কালক্রমে দু'টি ডিম প্রসব করলো রাজহংসী।

(ঘ) সেগুলি থেকে বেরিয়ে এলো দু'টি বাচ্চা — একটি হাঁস, অন্যটি হাঁসী।

(ঙ) প্রথম পুরুষ ও প্রথমা নারীর (আদম্ ও ইভের মতো) মিলনে সাঁওতালদের উৎপত্তি।

পটের মহিমায়, আর তাদের পরিচিত সাঁওতালী উপকথা 'মারে হাপরাম কো রেয়াঃক কথা'র পরিচিত ঘটনার আলোতে দর্শক, শ্রোতাদের চোখের সামনে সাঁওতালদের উৎপত্তি-রহস্য ঝলকে ওঠে মুহূর্তে। পটিদার অর্থাৎ পটুয়ার আশ্চর্য কৃতিত্ব! বোঝা যাবে, মূল কাহিনীর সঙ্গে চিত্রিত কাহিনীর তুলনায়।

বৈদ্যনাথ হাঁসদা-কৃত 'মারে হাপরাম কো রেয়াঃক কথা'র অনুবাদে ঘটনাটি সংক্ষেপে এই —

জলমগ্ন বিশ্বচরাচর—ঠাকুর কর্তৃক হাঁস, হাঁসালী পাখির সৃষ্টি — কাঁকড়া, বোয়ালি কুমির কর্তৃক জলতল থেকে মাটি আনার ব্যর্থতা— কেঁচোকে নির্দেশ, কেঁচো কর্তৃক মাটি এনে কচ্ছপের পিঠে রাখা — মাটির সৃষ্টি — ঠাকুর কর্তৃক দুর্বাঘাস, করম, মহুয়া গাছ ও বেনা-বন সৃজন — হাঁসীলের ডিম প্রসব — মানব ও মানবী সন্তানের আবির্ভাব।

পটুয়ারা এই উপকথার গঠনমূলক উপকরণ অপরিবর্তিত রাখে, শুধু বিশদ বিবরণ বর্জন করে চার-পাঁচটি ছবিতে কাহিনী চিত্রিত করে। এথেকে আমাদের অনুমান, সাঁওতালদের সঙ্গে পটুয়াদের ঘনিষ্ঠতা চিরকাল। আজও, যাদু পটুয়ারা সাঁওতালদের কাছে সম্মানের পাত্র—ওঝা পুরোহিতের মতো সম্মান লাভ করে। কারণ চক্ষুদান পট এঁকে পটুয়া মৃত সাঁওতালের মুক্তি ঘটায় ইত্যাদি। পূর্বোক্ত স্থানগুলিতে কোনো সাঁওতালের মৃত্যু ঘটলে পটুয়া যায় তার বাড়ি। মৃতের শোকার্ত স্বজনদের সামনে শুধু চক্ষুবিহীন এক—নির্বিশেষ মানুষের দেহাবয়ব আঁকে তার চক্ষুদান পটে। স্বজনদের বিশ্বাস জন্মায় এ দেহাবয়ব সেই মৃতজনেরই। স্বাভাবিক কারণে মৃত্যু ঘটলেও যাদু পটুয়া বলে— এ মৃত্যু ভূত, প্রেত ইত্যাদির দুরভিসন্ধির পরিণাম, এবং আরও বলে যে, মৃত ব্যক্তিটি তার প্রিয় বাসনপত্র, গরু-ছাগল বা এমনকি জমিখন্ড প্রত্যাশা করে যন্ত্রণা পাচ্ছে। পটিদারকে তখন সে জিনিষটি দান করাই প্রথা। দান গ্রহণের পরে পটুয়া চোখ আঁকে মুখমন্ডলে। সাঁওতালদের বিশ্বাস মৃত ব্যক্তির আত্মা তখনই মুক্তিলাভ করে। সুধাংশু রায় এগুলিকে পারলৌকিক পট বলেছেন।[১১] অর্থাৎ পটিদার তখন পুরোহিতের ভূমিকায়। সে জানে মৃতের আধা-যাদু সংক্রান্ত এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মাধ্যমে মৃতকে স্বর্গে পাঠানো যায়, প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে, এরকম অন্ত্যেষ্টিশিল্পের সঙ্গে প্রাচীন মিশরের অন্ত্যেষ্টিশিল্পের মিল আছে অনেকটা।

The objects of all the ceromonies which were performed over the mummy or the statue in the tomb was to bring back the soul from heaven to the body in which it dwelt on earth, and when the priest told the kingfolk of the decased that "Hoars had decovered his eyes",

i.,e that the soul had returned to the body, they felt that everlasting life and happiness were secured for him."[১২]

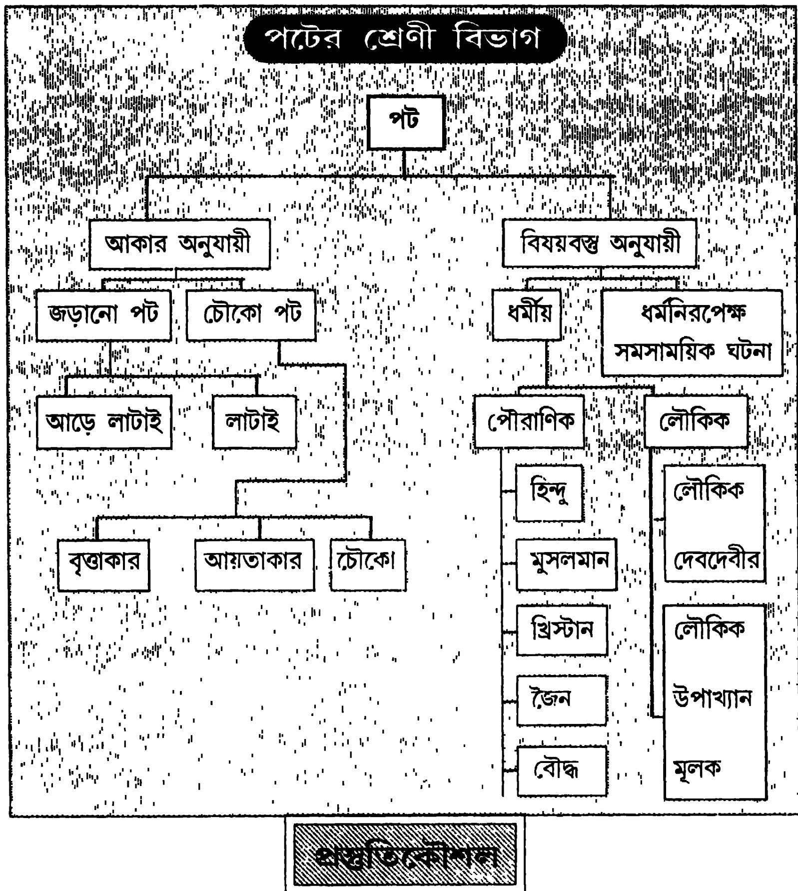
যাদু পটুয়ারা পট আঁকত বিশেষভাবে সাঁওতালদের জন্য। আগে তাদের জড়ানো পট হতো কাপড়ে; এখন উজ্জ্বল জোড়া কাগজে তৈরি হয়। গুজরাটে 'চিত্রকথি' আর পারপেইন্টার-এর মতো লম্বালম্বি, পাক খুলে খুলে দেখানোর মতো এদের পট নয়। ওদের একক পটের ক্ষেত্রে একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। পটের সমতলক্ষেত্রে ভিন্নতাসৃষ্টিকারী উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার এবং সম্পূর্ণ মুখমন্ডল এঁকে তাতে বড় মাথা ও বড় বড় চোখ আঁকা। আগেই বলা হয়েছে ওরা বেশি সংখ্যক পট আঁকে সাঁওতালদের জন্য। ওদের পটের বিষয়কে যে ছ'টি ভাগে ভাগ করা হয়, সেসবগুলিতে সাঁওতালরাই প্রাধান্য পায়। যেমন— (১) মৃতদের জগতে মৃত ব্যক্তির জীবন (২) সাঁওতালদের সৃষ্টি রহস্য, (৩) সাঁওতালী নৃত্য, (৪) সাঁওতালদের প্রতীক চিহ্ন, (৫) ব্যাঘ্র-আরোহী ব্যক্তি (৬) সাঁওতালদের জীবনের সমান্তরাল কৃষ্ণের জীবনের বিশেষ বিশেষ দৃশ্য বা ঘটনা।

সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং বেশি সংখ্যক পটের সাধারণ বিষয়টি হলো—ব্যাঘ্র-আরোহী। পটে-পটে ভিন্নতা থাকে রঙ ব্যবহারে। তবে অধিকাংশ পটেই অঙ্কিত হয় বাঘের উপরে জপমালা হাতে এক সাধু মুসলমান — পীর বা ফকির সাহেব। উনি হলেন ওদের 'বঙ্গা' দেবতা অর্থাৎ ব্যাঘ্র আরোহী দেবতা। ওদের বিশ্বাস সাধুবেশী সত্যপীর ওদের রক্ষা করে বাঘের আক্রমণ থেকে। আর বাঘের রঙ হয় বিচিত্র—কোথাও সবুজ, কোথাও গাঢ় হলুদ ইত্যাদি।

ভারতের লোকশিল্পে ও লোকধর্মে বাঘের গুরুত্ব যেন বেশি — শুধু সাঁওতালদের দ্বারা নয়, হিন্দু-মুসলমানদের দ্বারাও ব্যাঘ্র পূজিত হয়। গাজীর পট তার সাক্ষ্য। গাজীর পট আঁকেন এমন এক পটুয়াগোষ্ঠীকেও দেখতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ-পূর্ব পশ্চিমবঙ্গে, অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি জেলায় গাজীর পটের বেশি প্রচলন।

আর এক ধরনের পট—শোলার পট। মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার সর্বত্র ৩০-৩৫ বছর আগে দেখতে পাওয়া যেত। এখন তেমন চোখে পড়ে না। সম্ভবত মুঘল যুগ থেকে এর প্রচলন। শোলার ওপর আঁকা হয় মনসা, শীতলা, রাধাকৃষ্ণ, বিষ্ণু প্রভৃতি দেব-দেবীর মূর্তি। উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয় শোলা, আঠা, বেল কাঁটা, ছুরি, ভেষজ রঙ, কলা গাছের ডাঁটি, জরি ইত্যাদি। এই পটের আকার —লম্বায় ৬ ফিট, চওড়ায় ২ ফিট। বাংলার পটশিল্পের সর্বশেষ ঘরানার উল্লেখযোগ্য অঙ্গ কালীঘাট পট। এবিষয় যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে।

বৃত্তি অনুযায়ী মেদিনীপুরের পটুয়াদের দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। বসনতরী, সাতপড়া বা সাতকুড়ি, আটপড়া বা আটকুড়ি, চৌপলকাটা এবং বেজো। বসনতরীরা পট আঁকেন, গান করেন এবং মূর্তিও গড়েন। আটকুড়ি ও সাতকুড়িরা মূর্তি তৈরি করেন ও পুতুল গড়েন। এখনতো চৌপলকাটারা দেশী লণ্ঠনও তৈরি করেন। কাটাকাটারা নিযুক্ত আছেন কামারের কাজে।



প্রস্তুতিকৌশল

চোখের সামনে চিত্র ফুটে ওঠে। শিল্পীর অন্তরের শিল্পীচেতনা, কলা-কৌশল ছাড়াও বাইরের কিছু কিছু উপকরণে শিল্প মূর্ত হয়। পটচিত্রের অঙ্কনেও কিছু কিছু উপকরণ অপরিহার্য। পটচিত্রের অঙ্কন-উপকরণগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। যেমন — (১) জমি প্রস্তুতকরণ, (২) তুলি নির্মাণ, এবং (৩) বর্ণ প্রস্তুতকরণ।

(১) জমি প্রস্তুতকরণ ঃ পটচিত্রের জমি, বেশ অদ্ভুত উপায়ে, তৈরি করা হয়। প্রাচীনকালেতো চটের ওপর গোবরের প্রলেপন দিয়ে শুকিয়ে নিয়ে তারপর বেস কালার হিসাবে সাদা রঙ ব্যবহার করা হতো। পরবর্তীকালে হাতে তৈরি খন্ড খন্ড কাগজে ছবি এঁকে, পরে সেগুলি জোড়া দিয়ে যে অখন্ড কাগজখন্ড তৈরি হতো তাকে একখন্ড লম্বা কাপড়ের ওপর আঠার সাহায্যে এঁটে নেওয়া হতো, এখন যন্ত্রনির্মিত কাগজের ওপর পটচিত্র অঙ্কিত হয়। (২) তুলি নির্মাণ ঃ কাঠবিড়ালীর বা বেজীর লোম কিংবা ছাগলের লোম ৫"-৬" কাঠির প্রান্তে সূচ্যগ্র করে বেঁধে নেওয়া হয়। নানা আকৃতির তুলি তৈরি করা হয়।

(৩) বর্ণ প্রস্তুতকরণ ঃ লাল, নীল, সবুজ ইত্যাদি বিভিন্ন রঙ তৈরি করা হয়। রঙ হয়

প্রাকৃতিক — প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন এবং ভেষজ—গাছ-গাছড়াজাত। নিচে কয়েকটি রঙ ও তাদের উৎস, উল্লেখ করা হলো।

লাল ঃ তিন ভাগ ভুরো/ভূরি সিঁদুর ও একভাগ ফুলমিনে একত্র করে আঙুল দিয়ে ডলে নিতে হয়। তারপর একভাগ জল ও দু'ভাগ বেলের আঠা দিয়ে রঙটি ভালোভাবে গুলে নিতে হয়।

নীল ঃ বাজারের ময়ূরকণ্ঠী গুঁড়ো নীল-এর সঙ্গে আঠা ও জল মিশিয়ে নীল রঙ তৈরি করা হয়।

হলুদ ঃ হরিতাল-এর সঙ্গে সমপরিমাণ জল ও আটা মেশানো হয়। আজকাল প্রায়শ ব্যবহৃত পিউলির সঙ্গে কয়েক ফোঁটা লাল রঙ মিশিয়ে হলুদ রঙ তৈরি করা হয়।

সবুজ ঃ সঠিক পরিমাণে —তিন ভাগ হলুদ ও এক ভাগ নীল রঙ মিশিয়ে সবুজ রঙ তৈরি করা হয়। এছাড়াও, সীম্ পাতার রস থেকে সবুজ রঙ তৈরি করা হয়।

সাদা ঃ খড়িমাটি এবং কিছুটা নীল রঙ মিশিয়ে এই রঙ তৈরি করা হয়।

কালো ঃ অনেক সময় মুড়ি ভাজার খোলার কালি ব্যবহার করা হয়। একাধিক ক্ষেত্রে এর সঙ্গে নীল মেশাতেও দেখা যায়।

ক্রিমশন্ লাল ঃ পলাশ, শিমূল ও তুঁত ফুল একত্র মিশিয়ে এই রঙ তৈরি করা হয়।

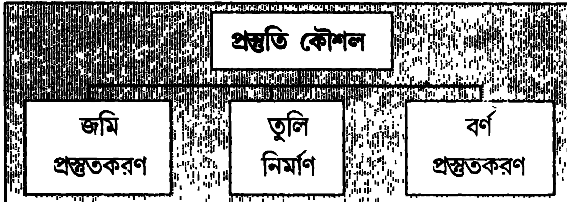
মেঘ বর্ণ ঃ খড়ি, নীল এবং হরিতাল-এর সাহায্যে এই বর্ণটি তৈরি করা হয়।

গোলাপী রঙ ঃ পুঁই শাকগাছের পাকা দানার রস দিয়ে এই রঙ প্রস্তুত হয়।

পরিমাণ মতো আঠার মিশ্রণ থাকে প্রতিটি রঙে। বেলের আঠা ব্যবহার করতে সাধারণত পটুয়ারা অভ্যস্ত। তেঁতুল বীজের আঠা কখনো বা কাঁইবিচির আঠা বা ডিমের কুসুমও ব্যবহার করা হয়। বেলের আঠা তৈরি সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। প্রথমে বীজযুক্ত কাঁচা পাকা বা আধপাকা বেল মাঝামাঝি কেটে তার ভেতর থেকে দানা বের করে নিতে হয়। তারপর অল্প দুধ ও সরষের তেল সহযোগে হাতে চটকিয়ে আঠার মাড় তৈরি করতে হয়। তারপর ন্যাকড়ার সাহায্যে ছেঁকে নিতে হয়। যাতে মাড় শুকিয়ে না যায়, সেজন্য এক্রাত ফাঁকা জায়গায় শিশিরে রাখতে হয়। কাঁইবীচি অর্থাৎ তেঁতুলের বীচির আঠা-তৈরি, সেও এক কষ্টকর কাজ। গরম পাত্রে কাঁইবীচি ভেজে, তা প্রথমে ঢেঁকিতে কুটে নিতে হয়। তারপর খোসা বাদ দিয়ে জলে সিদ্ধ করে নিলে ব্যবহারযোগ্য আঠা প্রস্তুত হয়। শিরিষ-আঠাও ব্যবহৃত হয়। আঠার ওপর রঙের স্থায়িত্ব এবং উজ্জ্বলতা নির্ভব করে ব'লে সতর্কভাবে আঠা তৈরি করেন পটুয়ারা। আতপ চালের তৈরি আঠাও বহুকাল আগে থেকে ব্যবহৃত হয়। জলে-ভেজানো আতপচাল শিল নোড়ার সাহায্যে বেটে নিয়ে আগুনে জলসহ ফুটিয়ে নিলে যে আঠা তৈরি হয়, তাতে গুড়ো-করা কুচিলা মেশালে পোকায় কাগজ নষ্ট করতে পারে না। এখন পটের কাগজ-তৈরি ব্যাপারটি কিছুটা অভিনব ও যত্নসাধ্য। বাজার থেকে বড় ব্রাউন পেপার কিনে তার ওপর ছোট ছোট আকারের সাদা কাগজ আঠার সাহায্যে সেঁটে নেওয়া হয়, বিশেষতঃ জড়ানো পটের ক্ষেত্রে। আঠার জন্য কাগজের কোথাও কোথাও

কুঁচকে যাবার সম্ভাবনা থাকে, সেজন্য খোলা আকাশের নিচে শিশিরের সিক্ততায় কাগজ বিছিয়ে রাখা হয় এক রাত। সবশেষে বেলনা বা ঐ জাতীয় কোনো বস্তুর সাহায্যে কাগজটিকে মসৃন করে নেওয়া হয়।।

পট অঙ্কনের কর্মকান্ডটিকে কয়েকটি পেশাগত নামে চিহ্নিত করা হয়। পট অঙ্কনের প্রাথমিক পর্বে পেনসিল ড্রয়িংকে বলা হয় 'টিকলামো'। ছবিতে রঙ প্রলেপনকে বলা হয় 'বর্ণমাখানো'। অবয়বগুলির সাজসজ্জা ও অন্যান্য অলঙ্করণকে বলা হয় 'পাদলামো'। সবশেষে প্রতিটি ছবির চারপাশে ফুল, পাখি, লতাপাতার 'বর্ডার' বা কিনারা অঙ্কনকে বলা হয় 'পাড় আঁকা'। পটুয়া প্রথমে পটের মাপ-জোঁক করে নেন। সে-কাজ শেষ হলে, তাঁর মনের পটে আঁকা বিষয়বস্তুটিকে লাল রঙের পেনসিলের সাহায্যে আঁকতে শুরু করেন। মূর্তির আদল তৈরি হয়। তারপর সেই লাল রঙের সাহায্যেই সে-মূর্তির হাত, পা, চোখ, মুখ ইত্যাদি আঁকতে বসেন। এবার 'আউটলাইন' বা স্কেচ-এর ভেতরে মূর্তির সর্বাঙ্গে যথাযথ রঙ ভরাট করার পালা। কালো রঙের সাহায্যে মূর্তির চুল ও চোখ আঁকা হয়। শেষে সাদা রঙ-এর সাহায্যে ফোঁটা দেওয়া হয়। জড়ানো পটে কাছাকাছি অনেকগুলি ছবি থাকে। প্রতিটি ছবিকে পৃথক-পৃথক খোপে আঁকা হয়। প্রতিটি ছবির চারপাশে কিছুটা সমান্তরাল ফাঁকা জায়গা রাখা হয়। মূল চিত্র বা মূর্তিগুলির চারপাশ রঙ দিয়ে ভরাট করাই রীতি। অঙ্কিত মূর্তির চারপাশে একটি রঙ-ই ব্যবহৃত হয়।



পটের শিল্পশৈলী

প্রায় সকলেই একমত যে, এখন থেকে প্রায় দু'হাজার বছর আগে, পটচিত্রের উৎপত্তি। এবং তখন থেকেই 'পটচিত্র লিখন'এর স্রোত কখনও গভীর এবং বিশাল আকারে, কখনও বা স্তিমিত গতিতে আজও প্রবহমান। একথা আগেও বলা হয়েছে। কথা এই যে, এহেন ঐতিহ্যবাহী চিত্রশিল্পের নিশ্চয়ই একটি উৎকৃষ্ট শিল্পশৈলী আছে। তা কখনও, ক্ষেত্রবিশেষে কিঞ্চিৎ প্রভাবিত হলেও, মূলতঃ নিজস্ব স্টাইলের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। একথা বলা যায় এই চিত্রপ্রবাহ টিকে আছে আজও গ্রামে-গঞ্জে, শহরে; এককালে ছিল বহির্ভারতে, ভারতের গুজরাট, রাজস্থান, ওড়িশা, হিমাচল প্রদেশ ইত্যাদি রাজ্যে। বিশেষভাবে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক থেকে উনিশ শতক অবধি যে শিল্প-প্রবাহে বাঙালী শিল্পী-মানস অবিরাম স্ফূর্তিলাভ করে চলেছে তার শিল্প-শৈলী সম্পর্কে মনে কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক।

পটচিত্রের শ্রেণীবিভাগ, উপাদান ইত্যাদি বিষয়ে কেউ কেউ আলোকপাত করেছেন, কিন্তু এর 'স্টাইল' বা শিল্পশৈলী নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয় নি। যেটুকু হয়েছে, তা যথেষ্ট

নয়—সংক্ষিপ্ত। লোক-সংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গকে লোকসমক্ষে আনতে গিয়ে গুরুসদয় দত্ত সর্বপ্রথম পটচিত্রের মোটামুটি সমগ্ররূপ তুলে ধরতে যত্নশীল হয়েছিলেন। পটের শিল্পশৈলীর দিকে ততটা নজর দেওয়া সম্ভব হয়নি তাঁর। এ সম্পর্কে তাঁর আলোচনা সীমিত হলেও অভ্রান্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ। তবে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের পটশৈলীর স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যগুলি তাতে ধরা পড়ে নি ততটা। অপর পটরসিক অশোক ভট্টাচার্য পটচিত্রের শৈলী-বিচার করেছেন। তিনি পটশৈলীর সমগ্র চারিত্র-লক্ষণ বিশ্লেষণের পাশাপাশি, অঞ্চলভিত্তিক চারিত্র-লক্ষণগুলি চিহ্নিত করেছেন। তাঁর আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ-এর পটশৈলী বিচার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁর আলোচনাও যথেষ্ট নয়। সেজন্য আমাদের প্রস্তাব বিদগ্ধ, কলারসিক সমালোচকদের মতামতগুলি ও তাঁদের প্রদত্ত তত্ত্ব-তথ্যাদির সাহায্য নিয়ে ব্যাপক ও গভীর অনুসন্ধানের মাধ্যমে নানা উদাহরণসহ পটচিত্রের শিল্পশৈলী বিচারে অগ্রসর হওয়া। অবশ্য আমরা পথপ্রদর্শক গুরুসদয় দত্ত-এর আলোচনার পথ ধরেই অগ্রসর হবো এবং সেকারণে তাঁর সিদ্ধান্তগুলি দেখবো।

যুগ-বদলের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুই বদলে গেছে। পারিপার্শ্বিক প্রভাবে পটচিত্রের শিল্পশৈলীরও হয়তো বিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু তা কিঞ্চিৎ। আমরা পূর্বেই পটচিত্র-এর উদ্ভব ও বিকাশ —ক্রমঅগ্রসরমানতা, ক্রম বিবর্তন সম্পর্কিত ইতিহাস আলোচনা করেছি। তবুও পটচিত্রের শিল্পশৈলী আলোচনার সুবিধার্থে — প্রসঙ্গক্রমে পটের সে-ইতিহাসের কিঞ্চিৎ উল্লেখ জরুরী মনে করি।

বোধ হয়, গুপ্তযুগে অর্থাৎ ৫ম - ৬ষ্ঠ শতকের আগে বাংলায় পটচিত্রের চর্চা ছিল। আমাদের বাঙলায় পাল যুগেও (৮ম শতাব্দী — ১১৬০ খ্রীঃ) পটচিত্রের অনুশীলন হতো। কিন্তু সেকালের পটচিত্র সহজে চোখে পড়ে না। তবুও তৎকালীন, প্রাপ্ত কিছু রঙিন পটচিত্র এবং হাতে-লেখা কিছু তালপাতার পুঁথির মলাটে অঙ্কিত 'পটচিত্র' থেকে ধারণা করা হয় যে, সেকালেও 'পটচিত্র লিখন'- চালু ছিল রীতিমত এবং তা কি হতো প্রাচীন সংস্কৃতে রচিত শিল্পশাস্ত্রের রীতিনির্দেশক গ্রন্থ ধনঞ্জয়-এর 'বিষ্ণুধর্মোত্তরম' অনুযায়ী? কিংবা ৭ম-১০ম শতকে রচিত শিল্পশাস্ত্রগ্রন্থ শ্রীকুমার-এর 'শিল্পরত্ন', ধনঞ্জয়ের 'চিত্রলক্ষণ' ইত্যাদি গ্রন্থ অনুযায়ী? তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। অষ্টম শতাব্দী — তখন থেকে উনিশ শতকের শেষ অবধি বাংলার পটুয়ারা ছিল বিশেষ সক্রিয়। এমনকি বিশ শতকের তৃতীয় দশক অবধি ক্ষীণতর ধারায় এই শিল্প-প্রবাহ, প্রবাহিত ছিল এবং প্রাচীন পটশিল্পশৈলীর মৌল-বৈশিষ্ট্যগুলির ধারাবাহিকতা মোটামুটি অব্যাহত ছিল। অবশ্য ইতিমধ্যে রাজপুত রীতি, কাংড়া উপত্যকা রীতি ও অন্যান্য শৈলী — মোগল দরবারী রীতি ইত্যাদি, এর ওপর প্রভাব বিস্তারে প্রয়াসী হয়েছে। কিন্তু স্থানগত দূরত্ব, বাঙালী লোকশিল্পীর রক্ষণশীলতা, পটশৈলীতে নিষ্ঠা কিংবা অন্য যে কোনও কারণেই হোক, সেই প্রাচীন শিল্প-শৈলী 'দরবারী' হয়ে ওঠে নি।

আরও পরবর্তীকালে 'ব্রিটিশ পেইন্টিং'-রীতি যথেষ্ট অভিনবত্ব নিয়ে অনুপ্রবেশ করে। এদেশের লোকশিল্পের প্রতি শাসককুলের বিমাতৃসুলভ মনোভাবকে কাজে লাগিয়েও এর শৈলী পরিবর্তনে তেমন সফলকাম হতে পারে নি ব্রিটিশ পেইন্টিং। ব্রিটিশ পেইন্টিং রীতির সঙ্গে বাংলার সাবেকী পটশৈলী অনুসৃত হয়েছে। দু'টি রীতির চিত্রাবলী পাশাপাশি রেখে

বিচার করলে একথা সত্য প্রমাণিত হয় যে, ব্রিটিশ পেইন্টিং কর্তৃক পূর্ণগ্রাস সম্ভব হয় নি।

এখন এই কথাটি বলে রাখা দরকার যে, পটচিত্র বলতে আমরা চৌকো পট, দীঘল পট — দু'প্রকার পটচিত্রের কথা বোঝাচ্ছি। প্রাক্-বুদ্ধ, বুদ্ধ-অজন্তাযুগ থেকে এর ক্রমঅগ্রসরমানতা অব্যাহত। তবু বিস্ময়ের ব্যাপার, এই গ্রামীণ শিল্পের ওপর দরবার বা গীর্জা ততটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। বরং তিব্বত, ওড়িশা, বাংলা প্রভৃতি স্থানে চিত্রসংক্রান্ত অন্যান্য ধারণার জন্মদাতা বা আদিরূপ বটে। পটশিল্প সর্বভারতীয়, এবং চিত্রসংক্রান্ত জাতীয় ঐতিহ্য বহন করে। এর ধর্ম উচ্চস্তরের সাবেকী ভাব-রক্ষণ এবং সাবেকী চিত্রশৈলীর অনুসরণ। তাহলে একথা উঠতে পারে যে, অতীতচারী এই শিল্পে দুর্বলতা, গতানুগতিকতা, স্থবিরতা, বিকাশহীনতা, যেগুলি জড়ত্বের লক্ষণ তা জড়িয়ে আছে এর সর্বাঙ্গে। তা কিন্তু সত্য নয়। সত্য এই যে পটচিত্র সাবেকী ঐতিহ্যে থেকেও আদিম শিল্পকলার স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেও পরিশীলিত শিল্পরীতির কিছু বৈশিষ্ট্য আত্মীকরণ করে চরিত্রে আধুনিক। অন্যান্য আধুনিক চিত্রশিল্পের মতো বরং লাবণ্যময়তা মেখে নিয়েছে সর্বাঙ্গে, হয়েছে কী অতুলনীয় বৈভবের অধিকারী।

পটচিত্রের প্রতি দৃষ্টি দিলে কয়েকটা কথা মনে আসে। এমন প্রাণবন্ত ভাবের ছবি, বোধ হয়, আর কোনও শিল্পপদ্ধতিতে নেই; জটিলতাহীন এমন এক উদার মুক্ত-ভাবের ব্যঞ্জনা আর কোথাও যেন চোখে পড়ে না; উদ্ধত কাঠিন্য নয়, মৃদু ও সুস্মিত এর সরসতা যা মুহূর্তে মনকে প্রসন্ন করে তোলে; নয়ন-লোভন, সুপরিমিত, সুশৃঙ্খল অলংকারে সমৃদ্ধ এমন ছবি ভারতের সম্পদ; রঙ, রেখা ও বিষয়বস্তুর এমন বাঙ্ময় ও ছন্দোময় প্রকাশ অতি দুর্লভ ও মূল্যবান। পটের শুধু ভঙ্গীর জন্য নয়, পটের দিকে তাকালেই পূর্বোক্ত ভাব-ভাবনা সব দর্শকের মনের মধ্যে মুহূর্তে বেজে ওঠে। যার এত বৈভব, আশ্চর্যের ব্যাপার, সেই পটচিত্রের সংজ্ঞা, নির্মাণ-প্রণালী, উপকরণ, লক্ষণ, বিষয়বস্তু ইত্যাদি সম্পর্কে নিয়মাবলী দিয়ে পটশিল্পের বিশাল ব্যাকরণ রচিত হয় নি কখনও। প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয়, লোকায়ত বহু শিল্প ধ্রুপদ পর্যায়ে চলে যায়। পরবর্তীকালে ৭ম-১০ম শতক অবধি ধ্রুপদী পর্যায়ের শিল্পের বহু শাস্ত্রীয় ব্যাকরণ শাস্ত্রও রচিত হলো। তবু লোকায়ত পটশিল্পের ব্যাকরণ অলিখিত থেকে গেছে। বিক্ষিপ্তভাবে যেটুকু আছে, তাও জটিল নয়, সহস্র নিয়মের সমাবেশও নয়। ব্যাকরণ না থাকলেও লক্ষ্য করা যায়, কালীঘাট, গুজরাট, ওড়িশা ইত্যাদি সব স্থানের পট আঙ্গিকের দিক থেকে প্রায় সমগোত্রীয়। তাল, মান, পরিপ্রেক্ষিতে, লাবণ্য ইত্যাদি শিল্পের যে শাস্ত্রোক্ত 'ষড়ঙ্গ' আছে এক্ষেত্রে তাও সচেতনভাবে অনুসরণ করা হয় না। মূলতঃ এতে আছে কয়েকটি নিয়মমাত্র।

ভাষার উপকরণ যেমন তার লিপি বা অক্ষর, তেমনি পটচিত্রের চিত্রশৈলীরও উপকরণ আছে, কিন্তু তার সংখ্যা মাত্র তিনটি — রঙ, রেখা এবং ছবির বিষয়বস্তুর রূপবিন্যাস। তাল বা মানও উল্লেখ্য। এই নিয়েই দর্শকের চিত্তজয়ের উদ্দেশ্যে তার জয়যাত্রা এবং সাফল্য। বিস্ময়ের ব্যাপার বৈকি! প্রথমে মান বা তাল-এর কথাই ধরা যাক। তাল-ই হলো চারুশিল্পের প্রাণ। উন্নত শিল্পরীতিতে অঙ্কিত-মূর্তিগুলির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-অঙ্কনে খুঁটিনাটি মাপজোখের ব্যাপার থাকে; মূর্তিভেদে তাল-এর তারতম্য থাকে। এতে তাল থাকলেও বাড়াবাড়ি নেই।

এখানে শিল্পীর স্বাভাবিক পরিমিতিবোধই সক্রিয়। ফলে চিত্রে ছন্দ, রস ও সৌন্দর্যের ঘাটতি লক্ষ্য করা যায় না। পটচিত্রে রঙের সাহায্যে দেহ-অবয়বের উচ্চ-নীচতা বা গভীরতাবোধ, আলো-ছায়া সৃষ্টি করার ব্যাপারটি এখানে গৌণ, নেই বললে চলে। আলো-ছায়ার ব্যাপারটি এখানে বিলাসিতার পর্যায়ে গণ্য করা হতো কিনা, তা জানা নেই। পটে অঙ্কিত রেখা, পটচিত্রের চিত্রশৈলীর অন্যতম ও প্রধান উপকরণ। রেখার সামনে ও প্রয়োগ-পদ্ধতিতে পটুয়াদের বাহাদুরি লক্ষিত হয়। তার কারণ, এক্ষেত্রে কোনপ্রকার শিথিলতা বা দুর্বলতা দেখানো হয় না। রেখাগুলি যে সরু, সূক্ষ্ম, ঢেউ-খেলানো লীলায়িত তাও নয় — শুদ্ধ সম্পর্কযুক্ত, — অভগ্ন, বলিষ্ঠ টানে অঙ্কিত, চাকচিক্যহীন, আপাত আবেগস্পর্শহীন ও বিলাসিতাশূন্য। রেখার আকার-প্রকার যাই হোক, তার প্রয়োগ বা ব্যবহারের ওপর চিত্রসৌন্দর্য ও ভাবপ্রকাশ অনেকটা নির্ভর করে। পূর্বেই বলা হয়েছে, রেখা দৃঢ়ভাবেই টানা হয়, তবুও তাতে থাকে ছন্দ, শৃঙ্খলা ও লালিত্য, যার ওপর অনেকটাই নির্ভর করে পটের অতুলনীয়তা। রেখার আকার-প্রকার ও প্রয়োগ সম্পর্কে গুরুসদয় দত্তের বিশ্লেষণ সঠিক। তিনি লিখেছেন — ''ইহা কেবল রেখার সতেজ, সুনিপুণ, প্রখর ও ভাবব্যঞ্জক প্রয়োগ এবং অল্প কয়েকটি প্রাথমিক বর্ণের অমিশ্র ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে।''[১৩] রেখার অন্তরঙ্গ রূপ ও ব্যবহার-ভঙ্গি যেমন গুরুসদয় দত্ত স্বল্প কথায় স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন, তেমনি অপর কলা-সমালোচক কল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ও তাঁর 'বাংলার লোকশিল্প' (১৯৬১) গ্রন্থে রেখা-কর্মের বহিরঙ্গ রূপ ও তার ব্যবহারিক সাফল্যের কথা বলেছেন। তাঁর মতে গুপ্তযুগে ও তার কিছু পরে রেখার সাহায্যে দেহ-অবয়বকে যথাযথভাবে উঁচু-নীচু ও বর্তুলায়িত করতে পারতেন পটুয়ারা; মধ্যযুগে পটের রেখা কোণবিশিষ্ট ও তীক্ষ্ণাকৃতি ধারণ করে। অবশ্য বাংলায় তার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যেত। বাংলায় পটচিত্রের রেখা, কোনকালে ছিল না। সেগুলি দৃঢ়ভাবে টানা, সজীব, জোরালো, স্বচ্ছন্দ; সেগুলি দেহসীমাকে স্পষ্ট ও মার্জিত রূপ দিতে পারে। সে-ধরনের রেখার দ্বারা পটুয়া তার অঙ্কিত মূর্তির চোখ-মুখের নিঁখুত ভাব ফোটাতে পারতো অবিকল 'ইম্প্রেশানিস্ট' বা প্রতিচ্ছায়াবাদী শিল্পীর মতো। উভয় কলা-সমালোচকই রেখাকর্মের বৈশিষ্ট্য ও রেখাঙ্কনের রীতি-নীতির ওপর আলোকপাত করেছেন। কিন্তু তাঁরা সাধারণভাবে এবং সংক্ষিপ্ত পরিসরে সমালোচনা করেছেন। আমরা বলতে পারি, এই রেখাঙ্কনের বাহাদুরিতে এই চিত্রশিল্পের বারো আনাই উতরে যেতো। একথা বিশেষভাবে রঙিন পট চিত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর শুধু স্পষ্ট কালো রঙের রেখা দ্বারা অঙ্কিত পটচিত্রে চমৎকারিত্ব ছিল রেখানির্ভর।

পূর্বেই বলা হয়েছে, পটচিত্রে ব্যবহৃত বর্ণ বা রঙ হলো পটচিত্রের অন্যতম উপকরণ। রঙিন, একরঙা — সবরকম পটেই রঙের প্রয়োজন গভীর। প্রয়োজন গভীর হলেও পটচিত্রে ব্যবহৃত রঙের সংখ্যা স্বল্প — কয়েকটি অবিমিশ্র প্রাথমিক রঙ মাত্র। লক্ষণীয় যে সেগুলির উজ্জ্বলতাই বড় বৈশিষ্ট্য এবং রঙের সমবেত ঐকতান সৃষ্টির দিকে ছিল পটুয়ার ঝোঁক। তবে রঙগুলি বিদেশী রাসায়নিক রঙের উজ্জ্বলতার তুলনায় অনুজ্জ্বল ছিল বটে। কারণ সেগুলির অধিকাংশই ছিল প্রাকৃতিক রঙ। প্রধানত অবিমিশ্র এবং প্রাকৃতিক রঙ ব্যবহার করাই ছিল সেকালের রীতি। অবশ্য মিশ্ররঙও ব্যবহৃত হতো, কিন্তু সেগুলি সংখ্যায় খুবই

কম এবং স্বল্প ক্ষেত্রেও বটে। প্রকৃতির অজস্র গাছপালা, অফুরন্ত মৃত্তিকা ছিল সে সব রঙের উৎস। সেগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে জল বা নানাপ্রকার আঠার সমবায়ে তৈরি করে নেওয়া হতো রঙ। রঙের উৎস ক্ষুদ্র-তুচ্ছ স্তরের হলেও রঙ নির্বাচনে, উজ্জ্বলতা সৃষ্টিতে এবং রঙের ঐকতান সৃষ্টিতে পটুয়াদের দক্ষতা উচ্চস্তরের, একথা কে অস্বীকার করবে? রঙের ঐকতান গড়া প্রসঙ্গে বলতে গেলে বলতে হয় যে, পটুয়ারা দর্শক-সচেতন অভিনেতার মতো এক চোখ রাখেন দর্শকের দিকে, অন্য চোখ রাখেন ছবির দিকে। তাই দর্শকের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করবার জন্য যেমন গাঢ় রঙ ব্যবহারের পক্ষপাতী, তেমনি দর্শকের দৃষ্টিকে সুখ দেবার জন্য রঙের ঐকতান সৃষ্টিরও পক্ষপাতী। বলা যায়, দরবারী কিংবা উন্নত চিত্রকলা পদ্ধতির মতো বহু রঙ ব্যবহার না করেও বহু রঙের 'এফেক্ট' সৃষ্টিতে দক্ষ। সমতল রঙ নিশ্ছিদ্র যবনিকার মতোও ছিল না। বর্ণবিন্যাসের ক্ষেত্রে কোনও কোনও চিত্রে শেডিং বা ছায়াপাতের ব্যাপার থাকলেও, তা করা হতো সম্পূর্ণ ভারতীয় রীতি অনুযায়ী। বর্ণচয়ন ও বর্ণপ্রয়োগে স্থানীয় ভৌগোলিক প্রভাবও লক্ষণীয়। নদীতীরবর্তী স্থানের পটে যেমন সবুজ রঙের আধিক্য, তেমনি পাহাড়ময় অঞ্চলের পটচিত্রে ধূসর, বাদামী ও মেটে রঙের আধিক্য চোখে পড়ে। এটি সংশ্লিষ্ট পটুয়ার স্বাভাবিক আকর্ষণবোধ এবং পটের বিষয়ভিত্তিক ব্যাপার। মেদিনীপুর বা দঃ ২৪ পরগণার পটে গাছপালা ও তৃণভূমি অঙ্কনে সবুজের এবং বাঁকুড়া-বীরভূমের পটে পাহাড় ও ধূসর মৃত্তিকা অঙ্কনে ধূসর রঙের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। অঞ্চলভেদে পটশৈলীর যে-পার্থক্য চোখে পড়ে, তার মূলে থাকে বিশেষ অঞ্চলের ভৌগোলিক প্রভাব।

পটুয়াদের রেখা, রঙ যেমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং এগুলির প্রয়োগ-পদ্ধতিও স্বতন্ত্র, তেমনি রূপবিন্যাস অর্থাৎ রূপ-লাবণ্য সৃষ্টির রীতিও স্বতন্ত্র। শিল্পের প্রথম কথা যে সৌন্দর্য—এ ধারণা তাদেরও ছিল। সে কারণে তাদের আঁকা মূর্তিগুলির মুখ, চোখ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইত্যাদি এমন প্রত্যক্ষ, জীবন্ত ও বাস্তব করে আঁকা হতো যার ফলে অজন্তা, ইলোরা, গ্রীস, স্পেন ইত্যাদি স্থানের গুহাচিত্রের মতো সৌন্দর্য ও জীবন্তভাব পরিলক্ষিত হতো। তা হলেও তারা কিন্তু কোনরকম ইন্দ্রিয়বশ্যতার কাছে আত্মসমর্পণ করত না। এমন পরিশীলিত রুচিবোধ ও সৌন্দর্যবোধ নিয়ে পুরুষদেহে সজীব পুরুষালীভাব কিংবা নারীদেহে কমনীয় লাবণ্য সৃষ্টি করা হতো, যা আমাদের বিস্মিত করে। মূর্তিগুলির শুধু দৈহিক সৌন্দর্য নয়, মুখ-চোখের অভিব্যক্তিতে তাদের অন্তস্তলের ভাবময়তা ফুটিয়ে তুলতে যে-শিল্পরীতিতে অধিকার থাকা দরকার, তা পটুয়াদের আয়ত্তে ছিল। যেমন মূর্তিসৌন্দর্য সৃজনে, তেমনি বৃক্ষলতাদির সৌন্দর্য সৃষ্টিতে আলঙ্কারিক রীতির অনুসরণ থাকলেও, তা ছিল বাহুল্যবর্জিত। কোনও কোনও পটে বৃক্ষ-লতাদি অঙ্কনে সূক্ষ্মতার আভাস ফুটলেও নির্দ্বিধায় বলা যায়, তার মূলে ছিল তাদের অনায়াস পটুত্ব। মোঘল কিংবা রাজস্থানী চিত্ররীতি এতটুকু অনুসৃত হতো না সেক্ষেত্রে। অঙ্গ -প্রত্যঙ্গ বা অবয়ব গঠনে সূক্ষ্মতা বা খুঁটিনাটিতে মনোযোগ দেবার রীতি কিংবা সূক্ষ্ম চিত্রনবিলাসের রীতিও অনুসৃত হতো না। চিত্র ভারাক্রান্তও হতো না; ইঙ্গিতে বা প্রতীকি তাৎপর্যে ভাব ব্যক্ত করা সহজ হতো। আশ্চর্যের ব্যাপার, পটচিত্রে ভাবসৌন্দর্যের এতটুকু অপরিস্ফুটতার লক্ষণ ধরা পড়ে না। তা যদি হতো, তাহলে পটে প্রাচীন কিংবা আধুনিক কোনও কাহিনী কিছুতেই স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারত না তারা। পটুয়ার এ দক্ষতা

চিরকালীন। প্রত্যেক দীঘল পটের শেষভাগে যমরাজার সভার চিত্র-সংযোজন রীতির আশ্রয়ে —ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয় এই ভাবটি কেমন স্পষ্টভাবে পটুয়া ফুটিয়ে তোলে! দীঘল পটের শেষাংশে নীতিমূলক যমরাজার সভাচিত্র নীরসও মনে হতো না, কারণ সে-দৃশ্য দর্শক-শ্রোতার মনে ঘৃণাব্যঞ্জক জুগুপ্সা রস সৃষ্টি করতো। শুধু দীঘল পটের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয়, সব রকমের পটই ছিল রসগর্ভ। পটের এই রসময়তা তার সৌন্দর্যের অন্যতম কারণ ছিল। চিত্রে পরিপ্রেক্ষিত অর্থাৎ দূরের বা নিকটের একাধিক চিত্রবিষয়ের মধ্যে আনুপাতিক দূরত্ব নির্ণয় করা অন্যতম কাজ। সেজন্য চিত্রে অঙ্কিত বিষয়গুলিকে আগে বা পিছে উপস্থাপিত করতে হয়। পটচিত্রে মূর্তির আকার-বিন্যাস — পরিপ্রেক্ষিত রচনার দিকে কিঞ্চিৎ ঘাটতি থাকলেও, বাড়াবাড়ি করার রীতি নেই। তবুও সৌন্দর্যের ঘাটতি লক্ষ্য করা যায় না। পরিপ্রেক্ষিতের কিঞ্চিৎ ঘাটতি অবশ্য চিত্রণ-চমৎকারিত্বে ঢাকা পড়ে যেত। এ ব্যাপারে পটুয়াদের দক্ষতা অসংশয়িত। পটুয়াদের বাস্তবতাবোধ প্রখর বলেই চিত্রে অঙ্কিত মূর্তিমাত্রই — তা সাধারণ কিংবা অসাধারণ মনুষ্যমূর্তিই হোক — হতো বিশ্বাসযোগ্য, জীবন্ত ভাবময় এবং অকৃত্রিম। চিত্রের বিষয়বস্তুকে সজীব, বিশ্বাসযোগ্য ও অকৃত্রিম করে অঙ্কন করাই তাদের চিত্ররীতি। লোকসংস্কৃতিবিদ্ বিনয় ঘোষ পটশৈলীতে মুসলিম ক্যালিগ্রাফিসুলভ শক্তিশালী তুলির দৃঢ় রেখাঙ্কন পর্যবেক্ষণ করে এর ওপর ক্যালিগ্রাফির কিঞ্চিৎ প্রভাব অনুমান করেছেন।[১৪] অবশ্য তিনিই আবার বলেছেন যে, এই ঐতিহ্য মুসলিম ক্যালিগ্রাফির আগে আদিম উপজাতীয় রেখা-অঙ্কনের মধ্যে-দেখা যায়, বিশেষ করে আদিম মানুষের বিমূর্ত ও জ্যামিতিক অঙ্কনে—তবে শিল্প সমালোচকরাই এর সঠিক বিচার করে বলতে পারবেন মুসলিম ক্যালিগ্রাফির প্রভাব কতখানি কিংবা আদৌ পড়েছে কিনা। আমরা ধারণা করতে পারি পটশৈলীতে ক্যালিগ্রাফির লক্ষণ প্রভাবের ফল নয় কিংবা স্বেচ্ছাকৃত অনুসরণও নয়। জড়ানো পটের পর্বগুলিকে মঙ্গল পালা বলা যায়।[১৫] সাধারণত জড়ানো পটের চিত্রবিন্যাসে মঙ্গলকাব্যের যে কাহিনীগুলি চিত্রিত হতে দেখা যায়, তার বৈশিষ্ট্যগুলি হলো ঃ (ক) প্রতিজ্ঞাপূরণে ব্যর্থতাজনিত দেবদেবীর অসন্তোষ, (খ) দৈব-নিগ্রহ (গ) প্রতিজ্ঞাপূরণ (ঘ) দেবদেবী কর্তৃক ভক্তকে রক্ষা।

পট শিল্প সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে শ্রদ্ধাবোধ ছিল তার পরিচয় পাই তাঁর লেখা থেকে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—আমরা দেখিয়াছি, জাপানের একজন সুবিখ্যাত চিত্ররসজ্ঞ পন্ডিত এদেশের কীটদষ্ট কয়েকটি পটের ছবি দেখিয়া বিস্ময়ে পুলকিত হইয়াছেন — তিনি একখানি পট এখান হইতে লইয়া গেছেন, সেখানি কিনিবার জন্য জাপানের অনেক গুণজ্ঞ তাঁহাকে অনেক মূল্য দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তিনি বিক্রয় করেন নাই। আমরা ইহাও দেখিতেছি, য়ুরোপের বহুতর রসজ্ঞ ব্যক্তি আমাদের অখ্যাত দোকান-বাজার ঘাঁটিয়া মলিন ছিন্ন কাগজের চিত্রপট বহুমূল্য সম্পদের ন্যায় সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেছেন। সে সকল চিত্র দেখিলে আমাদের আর্ট স্কুলের ছাত্রগণ নাসাকুঞ্চন করিয়া থাকেন। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই, কলা-বিদ্যা যথার্থভাবে যিনি শিখিয়াছেন, তিনি বিদেশের অপরিচিত রীতির চিত্রের সৌন্দর্যও ঠিকভাবে দেখিতে পান—তাঁহার একটি শিল্পদৃষ্টি জন্মে। আর যাহারা কেবল নকল করিয়া শেখে, তাহারা নকলের বাহিরে কিছুই দেখিতে পায় না।'[১৬]

পটচিত্রের সাধারণ শৈলীবিচারের সঙ্গে অঞ্চল বা জেলাভিত্তিক পটচিত্রের বিশেষ ঘরানা শৈলীর বিচার করাও দরকার, যাতে পটচিত্রের সমগ্র রীতি রূপ, পটচিত্রের মহিমা, সেই সঙ্গে পটচিত্রশৈলীর জেলাভিত্তিক ভিন্নতা সম্পর্কেও ধারণা করা যায়। এ ব্যাপারে আশুতোষ মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ প্রথমে উৎসাহী হয়ে কিছু পটচিত্রের বিশ্লেষণ করেন। পটচিত্রশৈলীর জেলাভিত্তিক ভিন্নতা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা তৈরি হয়। তিনি মিউজিয়ামে রক্ষিত শুধু পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের কয়েকটি জেলার কিছু পটচিত্র নিয়ে কাজ করেছেন বলে তার আলোচনা ব্যাপক হয় নি। তাহলেও তাঁর নিখুঁত পর্যবেক্ষণশক্তির গুণে সিদ্ধান্তগুলি অভ্রান্ত বলতে অসুবিধা হয় না। আমাদের আলোচনায় সময়-বিশেষে তাঁর সিদ্ধান্তগুলি ধর্তব্য।

আশুতোষ মিউজিয়ামের সঙ্গে যুক্ত অপর গবেষক সুধাংশু কুমার রায়, "পশ্চিম-বঙ্গের পটশিল্প" গ্রন্থে (১৯৭৬) 'পটশিল্পের ঘরানা' প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গের পটুয়াদের অঙ্কনধারাকে প্রধানতঃ দু'টি ধারায় বিভক্ত করেছেন, এই যুক্তিতে যে, পটুয়ারা নিজেদের মধ্যে কতকগুলি পরিবারের আত্মীয়তার বন্ধনীতে আঞ্চলিক সমাজবন্ধনী গড়ে তোলে এবং নিজেদের পেশার একচেটিয়া ঘরানা গুণাবলী রক্ষা করে যার ফলে বিশেষ ঐতিহ্য ও আঞ্চলিক অঙ্কনধারা মোটামুটি একরকম হয়ে যায়। এই সূত্রে তিনি — (১) তমলুক-কালীঘাট-ত্রিবেণী সামাজিক অঙ্কনধারা এবং (২) বীরভূম-কান্দি-কাটোয়া সামাজিক অঙ্কনধারা রূপে চিহ্নিত করেছেন। আরও তিনি প্রতিটি সামাজিক-বৃত্তের অঙ্কনধারায় একাধিক ঘরানা-বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছিলেন। আমাদের আলোচনায় যথাস্থানে সেগুলিও উল্লেখ্য। মেদিনীপুর জেলা পটচিত্রের ব্যাপক চর্চাক্ষেত্রের অন্যতম জেলা। এখানে পটের বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। মেদিনীপুরের পটে সাবেককালের বিষয়বস্তু যেমন লক্ষ্য করা যায়, তেমনি আধুনিককালের বিষয়বস্তুও চোখে পড়ে। কৃষ্ণলীলা পট, রাম পট, যম পট ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার পৌরাণিক পটের পাশাপাশি স্বাধীনতা পট, স্টীমার পট, সাহেব পট, সিনেমা পট, ফ্যামিলি প্ল্যানিং ইত্যাদি কতপ্রকারের আধুনিক পটও চোখে পড়ে। এদিক থেকে বলা যায়, মেদিনীপুরের পটশিল্পীরা ঐতিহ্য থেকে কিছুটা যেন সরে এসেছেন। জড়ানো পটের শেষে যম ও যমপুরীর বর্ণনা থাকা একসময় সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু এখানকার আধুনিক জড়ানো সব রকমের পটে যম ও যমপুরী সাধারণত অনুপস্থিত। তবে অপর তিন দেবতা জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা-র বর্ণনা পাওয়া যায় এঁদের পটে। প্রসঙ্গ সূত্রে উল্লেখ্য যে এখানে যমপটের চেয়ে জগন্নাথ পটের প্রাচুর্য। এমনকি যেখানে যমপুরীর বর্ণনা আছে সেখানেও জগন্নাথ প্রভৃতিরও বর্ণনা আছে। স্বল্প হলেও যেসব যমপট পাওয়া যায় সেগুলিতে মন্দিরে টেরাকোটা বসানোর মতো খোপে খোপে যমালয়ের দৃশ্যগুলি অঙ্কিত। এখানকার পটগুলি ব্যাপকভাবে অলঙ্কারমন্ডিত এবং বহু চরিত্র সমন্বিত। মেদিনীপুরের কোনো কোনো জড়ানো পট বেশ দীর্ঘ। তাতে দেব-দেবীর দেহাবয়বের সীমারেখা বলিষ্ঠ। তাঁদের মুখমন্ডলের সবটা নয়, মাত্র তিন-চতুর্থাংশ দেখানো হয়েছে।

পটচর্চার অন্যতম ও বিশিষ্ট কেন্দ্র বীরভূম জেলা। এই জেলার পটচর্চার ঐতিহ্য প্রাচীন এবং আজও পট-চর্চা হয়, অন্যান্য জেলার তুলনায় বেশি। এখানকার কোন কোন প্রকারের

পট, যেমন — যমপট, অতুলনীয় খ্যাতির অধিকারী। এখানে যমপট অঙ্কনের এতই আধিক্য এবং যমপট অঙ্কনে পটুয়াদের দক্ষতা এতবেশি যে, যমপট গোষ্ঠী নামে একদল পটুয়াই চিহ্নিত হয়ে থাকেন। সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলে যেমন চক্ষুদান পটের আধিক্য, তেমনি এখানে হিন্দুদের মধ্যে যমপটের প্রচলন বেশি। এখানে দু'টি ধারাই সমান্তরালভাবে প্রবহমান। শুধু এই দুই ধারার পটঅঙ্কনে আবদ্ধ না থেকে গাজীর পটও এঁরা অঙ্কন করেন। এভাবে নানা ধর্ম-সংস্কৃতির মিলন কেন্দ্র এই বীরভূমের পটুয়ারা নিজেদের শিল্পকলাকে বিভিন্ন ধর্মমতের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে চূড়ান্ত অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। নানা ধর্মসম্প্রদায়ের গভীর ইচ্ছারই এটি প্রতিফলন নয় কি? প্রকৃত শিল্পীর এটিই তো উৎকৃষ্ট লক্ষণ। বিষয়-নির্বাচনে যেমন অসাম্প্রদায়িক মনোভাব, তেমনি অবিকৃত ঐতিহ্য-অনুরাগও স্পষ্ট। পট-চিত্রাঙ্কনে পৌরাণিক বিষয় একমাত্র উপজীব্য। সমকালীন বা আধুনিক বিষয় আসে না বললেই চলে। সেই আগের মতোই সব রকমের পটে যম ও যমপুরীর বর্ণনা থাকে। প্রাচীরে ধর্মীয় কাব্য কাহিনীর চিত্রণ। ঐতিহ্য থেকে বেরিয়ে না আসাকে দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় একক বৈশিষ্ট্য বলেছেন। তিনি বলেছেন — "ঐতিহ্য থেকে একটুও ভেঙে বেরিয়ে না আসাই, বীরভূমের পট শিল্পের প্রাণশক্তির পরিচায়ক। .....এখানেই তার একক বৈশিষ্ট্য। বিষয় নির্বাচনে ঐতিহ্য বজায় রাখলেও বোধ হয় বলা যায়, সেই প্রাচীন সুমহান ঐতিহ্য বজায় রাখতে পারেননি অঙ্কনরীতির ক্ষেত্রে।"[১৭] পটের বিষয়বস্তুর রূপ বিন্যাসের কথা বলতে গেলে বলতে হয় দেবদেবীর মুখমন্ডল দেখানো হয় তিন-চতুর্থাংশ অর্থাৎ কিছুটা তেরছা করে আঁকাই রীতি। চোখের ভ্রূযুগল থাকে জোড়া। এখানকার কৃষ্ণলীলা পটে এসব বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। পট যে প্রকারেরই হোক সব রকমের পটে রেখার বলিষ্ঠতা প্রাচীন শৈলী-বৈশিষ্ট্য স্মরণ করায়। এখানকার পটে রঙ নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভূগোলও যেন প্রভাব বিস্তার করে থাকে। বীরভূম গেরুয়া রঙের মাটির দেশ। মানুষেরা গেরুয়া রঙ দেখতে অভ্যস্ত। বোধ হয়, দর্শক-সাধারণের দৃষ্টিনন্দনের কথা ভেবেই পটের পশ্চাৎপটে গাঢ় লাল রঙ ব্যবহারের রীতি অনুসরণ করা হয়। তিন ভাগ ভূরি সিঙ্গুরের সঙ্গে এক ভাগ ফুলমিনে মিশিয়ে যে রূপালি রং তৈরি করা হয়, পটুয়ারা পশ্চাৎপটে তাছাড়া অন্য ক্ষেত্রেও সেই রং ব্যবহার করতে অভ্যস্ত। যেমন সিন্ধু মুনির পুত্রের চিত্রের গোলাপী লাল রঙে আগুনের শিখা অঙ্কন করা হচ্ছে। ভূগোল যেমন পশ্চাৎপটের রং নির্বাচনে সাহায্য করে, তেমনি বাজার ও রঙের সহজলভ্যতাও রং তৈরিতে বিশেষ সাহায্য করে। বাজারের গুঁড়ো ময়ূরকণ্ঠী নীল রং, গাছের হরিতালের হলুদ রং, আর মুড়ি ভাজার খোলার কালো গুঁড়ো রং কালো রং তৈরির কাজে লাগানো হয়। রংগুলি নিতান্তই প্রাথমিক; ভেষজ বা প্রাকৃতিক, কিন্তু ঔজ্জ্বল্যে অতুলনীয় এবং মূল্যবান রাসায়নিক রঙের তুল্য বলা যায়। এগুলিতে জল না মিশিয়ে বেলের আঠা মিশিয়েই ব্যবহার করা হয়। দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কাছে রক্ষিত বসন্তের দশাবতার বিষয়ক পটের রেখাঙ্কন, মূর্তির দেহাবয়ব, শেডিং, পটের চৌকো আকারের সঙ্গে কালীঘাট পটের মিল দেখে যদি কালীঘাট পটের ওপর এদের প্রভাব অনুমান করে থাকেন, তবে তাও ঠিক নয়। কারণ সুদূর বীরভূমের পটের প্রভাব কালীঘাট পটে পড়া অস্বাভাবিক ঘটনা। বীরভূমে অঙ্কিত পটে রামায়ণের সাতটা কান্ড একসঙ্গে দেখান হয়।

মেদিনীপুরে সাতটা কান্ড পাঁচটা পটে দেখান হয়। মেদিনীপুরের মতো বীরভূমের পটেও বর্ডার থাকে। বীরভূমের পট অনেক বেশি বর্তনাগুণযুক্ত। এখানকার পটুয়ারা পছন্দ করেন মাথার তিন-চতুর্থাংশ দৃশ্য রূপ।

বীরভূম-পার্শ্ববর্তী বাঁকুড়া জেলাও পটচর্চার অন্যতম কেন্দ্রভূমি। এখানকার পটে রেখাঙ্কিত শিল্পীর দক্ষতা চোখে পড়ার মতো। পটচিত্রের দেহসীমারেখা হয় বলিষ্ঠ, স্পষ্ট, পটে অঙ্কিত দেব-দেবীর দেহ-বস্ত্র হয় ফুলের নকসায় মনোরম এবং রেখার কারুকার্যে চুলের বিনুনীর মতো হয় পাকানো। বস্ত্রের ভাঁজগুলি আঁকা হয়েছে পরস্পর রেখার টানে। মূর্তিগুলির মুখমন্ডল দেখানো হয় পাশ থেকে — অনেকটা তির্যক ভঙ্গিতে আঁকা হয়। পটের পশ্চাৎভূমিতে লাল রংয়ের প্রাচুর্য। তা বুঝি লাল মাটির দেশ বাঁকুড়ার মাটির রঙের অত্যাশ্চর্য প্রভাবে সম্ভব হয়। চিত্রিত পটে অঙ্কিত চোখের ধাঁচটা ভাল। যামিনী রায়ের চিত্রশৈলীর সঙ্গে মিল আছে। লাল রঙ ছাড়াও হলুদ রঙও বেশি ব্যবহৃত হয়। মাটি থেকে রঙ তৈরি হয়। পৌরাণিক সব বিষয়ে পট আঁকা হয়। ছবিতে বর্ডার থাকে না। আধুনিক সামাজিক বিষয়ে অঙ্কিত পট চোখে পড়ে না। বাজারের পাতলা কাগজেই ছবি আঁকা হয়। চওড়া ১০ ইঞ্চি, লম্বা ১৫-২০ হাত।

হাওড়া ও হুগলী পাশাপাশি দু'টি জেলা। এ দু'টি জেলায় পটচর্চা তেমন ব্যাপক নয়, বোধ হয় এই কারণে যে, রাজ্যলোভী বিদেশীরা বারংবার এগুলিকে আক্রমণ ও অধিকার করে পটসংস্কৃতিকে বিনষ্ট করে দিয়েছে। এ দু'টি জেলা থেকে প্রাপ্ত স্বল্প সংখ্যক পট থেকে কিছু জেলাভিত্তিক বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন হাওড়ার জড়ানো পটে থাকে বহু দেবদেবী ও মানুষের সমাবেশ। রেখাগুলিতে যত্নে লালিত্য ফুটে ওঠেনি; একেবারে সাদাসিধে। পটের পশ্চাৎ পটভূমিতে কালচে খয়ের রংয়ের প্রলেপ তেমন দৃষ্টি আকর্ষণীয়ও নয়। হুগলী পছন্দ করে ঘন পিঙ্গল বর্ণ। তাছাড়া হুগলীর পটগুলির বিমূর্ত রেখাগত ব্যবহার অদ্ভুত।

পুরুলিয়ার পটুয়ারা আদিবাসী পট অঙ্কনে বেশি আগ্রহী। আদিবাসীদের উৎপত্তি বিষয়ক বিভিন্নরকম কাহিনী এতে স্থান পায়। এছাড়া আছে চক্ষুদান পট। পুরুলিয়ার শিল্পীরা গাঢ় খয়েরি রঙ বেশি করে ব্যবহার করেন। বিষয়বিন্যাসে ঘন বুনট চোখে পড়ে।

আশুতোষ মিউজিয়ামে বর্ধমান জেলার কীর্তনের দৃশ্য সংবলিত পটটির অঙ্কন রীতিতে অধিকতর পরিশীলন লক্ষ্য করা যায়। লাল জমিনের উপর হলুদ গিরিমাটির গাত্র বর্ণ বেশ উজ্জ্বল।

কালীঘাট পট ও পটশৈলী

দেবী জাগ্রতা বলেই তীর্থক্ষেত্র হিসাবে যেমন কালীঘাটের খ্যাতি সর্বত্র আছে, তেমনি আজও কালীঘাটের পট শিল্পগত গুণের জন্য দেশ-বিদেশে সুপরিচিত এবং সমাদৃত। সেকালের সমাজেও খ্যাতি-সমাদরের অধিকারী ছিল। সেকালে 'ডাকাত কালী' নামে অখ্যাতি থাকলেও দেবী জাগ্রতা, বরদায়িনী ও প্রতাপশালী ছিলেন বলেই, বোধ হয়, এঁর উল্লেখ পাওয়া য্যয় ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত বিপ্রদাস পিপলাই-এর 'মনসা বিজয়' মঙ্গলকাব্যে এবং

১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চন্ডীমঙ্গল' মঙ্গলকাব্যে। অবশ্য তাঁদের বইতে পটের উল্লেখ বা বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে পরবর্তী কালের ইতিকথার পাতা ওল্টালে দেখা যায়, উনিশ শতকে বাংলার সর্বত্র ও এখানেও পটচিত্র লিখন ঘটেছে প্রচুর পরিমাণে এবং সেগুলি ছিলও উৎকৃষ্ট মানের। যে-কারণে আমরা সে শতককে পটচিত্র লিখনের 'স্বর্ণযুগের মধ্যাহ্নকাল' বলে চিহ্নিত করতে পারি। বিশ শতকের তিরিশের দশক অবধি এই যুগের অস্তিত্ব কোনক্রমে বজায় থাকে। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে কালীঘাট পটের শেষ শিল্পীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহ্যমন্ডিত এই ঘরানা শিল্পের অস্তায়মান সূর্যের ক্ষীণ রশ্মিটুকুও দিগন্তে মিলিয়ে যায়। সে যাইহোক বাংলার পটশিল্প সম্পর্কে দেশী-বিদেশী বহু শিল্পী সমালোচক কৌতূহল প্রকাশ করেছেন, তার আকর্ষণী শক্তি, অভিনবত্ব ইত্যাদির কারণে, সেই কালীঘাট পটশিল্পের শৈলী লক্ষণ না জানলে বাংলার নিজস্ব এই শিল্প অভিব্যক্তিটির রসাস্বাদন সম্ভব নয়। এর পটশৈলী যেমন অভিনব, কৌতূহলউদ্দীপক, তেমনি এর অন্যান্য বিবরণও আস্বাদ্যমানতায় অনন্য। কালীঘাট পটচিত্রের শিল্পইতিহাস জানা থাকলে তার শিল্পগত শৈলী সম্পর্কে ধারণা স্পষ্টতর হয়ে উঠবে, বলেই সর্বাগ্রে তার কিঞ্চিৎ শিল্প ইতিহাসের আলোচনা প্রয়োজন।

উনিশ শতকে কলকাতায় ছিল তিনটি উন্নত চিত্রপদ্ধতি — কালীঘাট পটচিত্র, বটতলার ছবি/পাটাচিত্র এবং কোম্পানি চিত্রপদ্ধতি। কালীঘাট পটচিত্রের রমরমা ১৯ শতকে। কিন্তু এর উদ্ভব কখন ঘটে তা সঠিকভাবে বলা যায় না। শিল্পী মুকুল দে এর জন্ম-ইতিহাস সম্পর্কে আলোকপাতের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর এবং অন্যান্য আলোচকদের ধারণা এই শতকের গোড়ায় বা কিছু পূর্বে এর উদ্ভব। কালীঘাটের পট প্রকৃতপক্ষে চৌকো পট। কারো কারো ধারণা চৌকো পটের জন্ম ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে, এবং তার রমরমা ছিল ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ অবধি। প্রখ্যাত শিল্প সমালোচক শোভন সোম-এর ধারণা কলকাতায় কোম্পানি চিত্রকলার উদ্ভব ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এবং এই চিত্রকলার সঙ্গে সমান্তরালভাবে কালীঘাটেও পটচর্চা চলেছিল। এবং আমাদের ধারণা কালীঘাটের পটের উদ্ভব অনেক আগেই। এরূপ ধারণার পক্ষে যুক্তি এই যে, ভারতের সব প্রাচীন তীর্থক্ষেত্রে পট বিক্রয়ের রেওয়াজ ছিল। কাশী বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে, পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরে, কন্যাকুমারিকা মন্দিরে, তাঞ্জোরে, নাথদ্বারে — ইত্যাদি স্থানে মন্দিরের বাজার যেমন, তেমনই কালীঘাটের মন্দির বাজার। তবে এসব মন্দিরের বাজার থেকে সস্তা দামে শুধু নিম্ন মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্তরা ধর্মীয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ ছবি কিনে নিয়ে যেতেন। কালীঘাটের পটও যখন আঁকা হয়েছিল, তখন এদেশের ভদ্র শিল্প রসিকেরা পটের রস উপভোগ করেননি এবং কথাসাহিত্যিক ও শিল্পগবেষক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়-এর একটি নিবন্ধ (১৮৮৬) থেকে জানা যায় যে, পটশিল্পকে বাঙালী নিম্নমানের চিত্ররূপে অবহেলা করত। যদিও তখন ধর্মীয় ও লোকায়ত দু'ধরনের ছবিই পাওয়া যেতো। সে রস তাঁরা উপভোগ করেননি। অবশ্য অবনীন্দ্রনাথ, কুমারস্বামী, হ্যাভেল, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মনীষী ব্যতিক্রম ছিলেন।

কালীঘাটের পটে যে ধর্মীয় বিশ্বাসের ছবি দেখা যায়, তা লৌকিক ধর্মেরই প্রতিচ্ছবি। একথা সত্য যে, কালীঘাটের পটুয়ারা লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী, দুর্গা, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা নিয়ে

ছবি আঁকতেন। কিন্তু এঁদেরকে মানবিক করে আঁকা হতো। দেখা যায়, পায়ে বুট-পরা রাবণ হনুমানের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন; হনুমানও লাথি, চড় ও গুঁতো মারছেন; চমৎকার সরু গোঁফওয়ালা, আদ্দির পাঞ্জাবী-পরা, পাম্প সু-পরা কার্তিক, সাজপোষাকে একেবারে খাঁটি বাঙালী; দেবী ষষ্ঠী বাঙালী ঘরের বধূর মতো। একেবারে পারিপার্শ্বিকের ছাপ — আকারে, পোষাক-পরিচ্ছদে। সে-সব চিত্রে আঁকার বাহাদুরিতো ছিলই, মাটির গন্ধও লেগে থাকতো বৈকি!

কালীঘাটের লোকায়ত পটগুলিতে উচ্চতর সমাজেরও উজ্জ্বল ছবি ফুটিয়ে তোলা হতো। সে-শতকে কলকাতার যে সব বাঙালী প্রচুর অর্থ ও প্রতিপত্তির অধিকারী হয়েছিলেন তাঁরা কেউ কেউ-বা মুৎসুদ্দী, কেউ বা সরকার, দেওয়ান বা চাকুরে ছিলেন। এঁরা বাবু সম্প্রদায়ের আদি পুরুষ। তাঁদের সন্তানেরা চূড়ান্ত বিলাসিতায় জীবন অতিবাহিত করতেন। বাবুর চেহারা অদ্ভুত, বিচিত্র! ভাঁজ-করা ধুতির লম্বা কোঁচা, নক্সা-করা কোর্তা, নাগরাই জুতো, টানা টানা লম্বা চোখ, বাবরি চুল ইত্যাদি। এইসব বাবুদের উচ্ছৃঙ্খল জীবন, বারাঙ্গনার কাছে বশংবদ ভাব প্রকাশ, বাবুর ছবির সঙ্গে বিবিদেরও ছবি। বারবনিতাদেরও ছবি দেখা যায় পটে। গোলাপ হাতে গোলাপ সুন্দরী; আলবোলা হাতে তামাকসেবিনী। কেউ বা প্রসাধনরতা; কেউ বা বীণা বাদনরতা-কেউ বা তবলা-বাদিকা; কেউ বা ফিরিঙ্গি কেতায় অভ্যস্তা, সব কিছুতে বিদ্রূপরস মাখানো। সে সব ব্যঙ্গচিত্র খুবই উপভোগ্য। অবশ্য কিছু উচ্চস্তরের রমণী মূর্তিও আঁকা হয়েছে। হয়তো এই তিক্ত বিদ্রূপের জ্বালায় কিংবা পটের মর্যাদাহানিকর স্বল্পমূল্যের জন্য, উচ্চশ্রেণীর সম্পন্ন গৃহস্থেরা গৃহসজ্জার উপকরণ থেকে নির্বাসন দিয়েছিলেন কালীঘাটের পটকে।

কালীঘাটের শিল্পীরা সে সময়ের সামাজিক ঘটনার সমালোচক-শিল্পীও ছিলেন। এইসব সামাজিক পটের অধিকাংশই ১৮৬০ থেকে ১৯০০ এর মধ্যে আঁকা। তাঁরা প্রাচীন পরম্পরার পাশাপাশি নতুন পরম্পরায় ছবি আঁকতে অভ্যস্ত ছিলেন। এই অভ্যাস বা রীতি ভারতের অন্যান্য তীর্থস্থানের শিল্পীদের মধ্যে দেখা যায় না। পুরী, তাঞ্জোর, নাথদ্বার ইত্যাদি তীর্থক্ষেত্রে অঙ্কিত চিত্র অত্যন্ত পরম্পরাগত; বিষয় ও শৈলীর দিক থেকে এসব স্থানের ছবি বড় আনুষ্ঠানিক ও ধর্মীয় এবং শৈলী গতানুগতিক। কালীঘাটে ঘটতো অন্যরকম ঘটনা। কালীঘাটের ধর্মনিরপেক্ষ পটচিত্রগুলি আমাদের তথাকথিত 'বাবু' সমাজের চিত্র উপহার দিয়েছে ১৯ শতকে। তার আগে কি এদেশের সমাজচিত্র প্রতিফলিত হয়নি কালীঘাটের পটচিত্রে? এ প্রশ্নের উত্তর সহজে মেলে না, কিংবা যা পাওয়া যায় তাও স্পষ্ট নয়। কারণ কালীঘাটের সুপ্রাচীন পটচিত্র দুর্লভ। ২-১ খানি পাওয়া যায়। দেবী মহিমা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ও প্রচুর তীর্থযাত্রীদের আগমন ঘটতে থাকলে দেবী মহিমাজ্ঞাপক ও স্মারকচিহ্ন হিসাবে পটচিত্রের সূত্রপাত ঘটা স্বাভাবিক। এই দিক থেকে কালীঘাটের পটের উৎপত্তিকালকে আমরা প্রাচীন কালের দিকে নিয়ে যেতে পারি। এর উৎপত্তিকাল নিয়ে যেমন মতভেদ আছে তেমনি এর উদ্ভাবন বা সূত্রপাত কীভাবে ঘটেছে এবং কাদের দ্বারা ঘটেছে এসব নিয়েও মতভেদের অন্ত নেই। অশোক মিত্র কালীঘাটের ছবির উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন। বলেছেন, "কালীঘাটের ছবির উৎপত্তি দেবদেবীর মাটির প্রতিমা ও খেলার পুতুল থেকে।"[১৮] আমরা

পূর্বেই বলেছি তীর্থযাত্রীদের চাহিদা মেটাতে ও দেবী-মহিমা জ্ঞাপন করবার জন্য পটের উৎপত্তি। সেই সঙ্গে বলা যায় মৃত্তিকা শিল্পীরা সারা বছর মাটির প্রতিমা গড়তেন, অবসর সময় কাটাবার জন্য ছবি আঁকতেন। চিত্রলিখন এবং প্রতিমা-পুতুল গঠন একই হাতের সৃষ্টি। সূত্রপাত যখনই হোক, সকলেই একমত যে, সূত্রপাত যাঁরা করেছিলেন তাঁরা ছিলেন মাটির মূর্তির কারিগর; অবসর সময়ের পটশিল্পী।

উক্ত মত থেকে ধারণা হয় যে, কালীঘাটের মূর্তির কারিগররাই কালীঘাট পটের উদ্ভাবক বা প্রথম স্রষ্টা। প্রারম্ভিক পর্বে তাঁরাই ছিলেন পট-চিত্রকার। কিন্তু প্রশ্ন জাগে কোন স্থানের চিত্রকরের ভূমিকা কালীঘাট পটচিত্রের মূলে। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের সন্তোষ রায় যখন মন্দিরের নব সংস্কার করলেন, মন্দিরের চারপাশে বসলো বাজার, বেশি করে ঘটলো তীর্থযাত্রীর আগমন, তখন থেকে পটের বাজার উঠলো জমে। তার আগে হয়তো সুন্দরবন-সংলগ্ন কালীঘাট ব্যাঘ্রসঙ্কুল ও ডাকাত-লাঞ্ছিত স্থান ছিল। আমাদের মনে হয়, কালীঘাট পটুয়াসমাজও এ ব্যাপারে একমত। আশুতোষ মিউজিয়ামের সঙ্গে যুক্ত সুধাংশু কুমার রায় 'পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প' (১৯৭৬) গ্রন্থে 'পটশিল্পের ঘরানা' নিবন্ধে বলেছেন কালীঘাট উপসমাজের চারটি পাড়া — কঙ্গনবাড়িয়া, লিলুয়া, প্রশস্ত ও কালীঘাট। সেই কালীঘাট উপসমাজই কালীঘাটের পটে আত্মনিয়োগ করেছিল সর্বপ্রথম। আমাদের ধারণা তারা হয়ত সর্বপ্রথম ছিল, কিন্তু একমাত্র ছিল না। শোভন সোম প্রভৃতি বহু গবেষকের ধারণা ইংরেজ আগমনের পূর্বে শুধু কালীঘাটে নয় কলকাতায় সর্বত্র চিত্রকর সমাজ ছিল। এই ধারণা সত্য। কারণ কলকাতার পটুয়াটোলা, চিৎপুর অঞ্চলে পটুয়ারা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বাস করতেন। তাঁদের পল্লীর নাম পটুয়াটোলা, চিৎপুর ইত্যাদি — তাঁদের বৃত্তি অনুযায়ী চিহ্নিত হয়েছিল। অবশ্য আমাদের মনে হয় এসব স্থানের পটুয়ারাই কালীঘাটে গেছিলেন কালীঘাটে অন্যান্য স্থানের পটুয়াদের আগমনের পূর্বেই। কিন্তু একেবারে প্রারম্ভিক পর্বে পটুয়াটোলা, চিৎপুর প্রভৃতি স্থানের পটুয়ারা অনুপস্থিত ছিলেন। আমাদের মনে হয় জো. জে. হলওয়েল ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'ইন্টারেস্টিং হিস্টোরিক্যাল ইভেন্টস রিলেটেড টু দ্য প্রভিন্সেস অব বেঙ্গল এন্ড দি এম্পায়ার অব হিন্দোস্তান' গ্রন্থে যেসব শাস্ত্রীয় মূর্তিলক্ষণহীন দেবদেবীর চিত্র ছাপিয়েছেন, সেগুলিতে আছে বাঙলার পটুয়া ঘরানার দেশীয় ছাপ। সেগুলি পটুয়াটোলা, চিৎপুর প্রভৃতি অঞ্চলের পটুয়াদের দ্বারা অঙ্কিত হয়েছিল। আমাদের বিশ্বাস কালীঘাটের দ্বারা অশাস্ত্রীয় মূর্তিঅঙ্কন কিছুতেই সম্ভব ছিল না। শোভন সোমও অনুমান করেন যে, কলকাতার পটুয়াটোলা, চিৎপুর প্রভৃতি পটুয়াঅধ্যুষিত অঞ্চল থেকে পটুয়ারা এসেছিলেন কালীঘাটে। আমাদের বিশ্বাস নগরায়ণ ঘটায় — রুজি, রোজগারের সুবিধা হওয়ায়, শুধু শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবীরা কলকাতায় ভিড় করেছিলেন তা নয়, সাধারণ শিল্পজীবী পটুয়ারাও জীবিকার সন্ধানে উপস্থিত হয়েছিলেন কলকাতায়, কালীঘাটেও। তাঁরা হয়তো এসে থাকতে পারেন মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা, বীরভূম, বাঁকুড়া থেকে। কালীঘাটে পটুয়া চিত্রকর পদবীধারী পটুয়ার অস্তিত্ব থেকে অশোক ভট্টাচার্য অনুমান করেছেন যে, এরা সকলে মেদিনীপুর, ২৪ পরগণার পটুয়া চিত্রকর পদবীধারী পটুয়ার বংশধর। তাছাড়া কালীঘাটে কলকাতা-বহিরাগত পটুয়াদের অভিবাসনের পক্ষে যুক্তি এই যে, কোম্পানির

রাজপুরুষদের নির্দেশে, পৃষ্ঠপোষকতায় ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কলকাতায় যে চিত্রকলার চর্চা ইতিপূর্বে শুরু হয়ে গেছিল, উইলিয়াম আর্চার যার নাম দিয়েছেন 'কোম্পানি চিত্রকলা', তার আকর্ষণে কলকাতার বাইরে থেকে পটশিল্পীদের আগমন ঘটা স্বাভাবিক। আরও বৃটিশ রাজপুরুষদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকৃতি, জীবনের ফুল, পাখি, নানা প্রকার জীবজন্তু প্রভৃতি ছবি আঁকার কাজে প্রধানত উত্তর ভারতের শিল্পীরা নিযুক্ত হতেন জানা যায়। তবে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানের শিল্পীরা বাদ পড়েছেন এমন কথা ভাবা যায় না।

এইভাবে মেদিনীপুর, বীরভূম, ২৪ পরগণা, বাঁকুড়া ইত্যাদি নানা স্থানের পটুয়াদের উপস্থিতিতে, গড়ে উঠলো কালীঘাটের পটুয়া গোষ্ঠী। স্বাভাবিকভাবেই ধারণা করা যেতে পারে যে, পারস্পরিক মেলামেশার সমন্বয়ে তৈরি হলো সমন্বিত কালীঘাট পট শৈলী। সেই কালীঘাট পটশৈলীর চরিত্র লক্ষণগুলি সম্পর্কে এখন আলোচনা করা যেতে পারে। এই সূত্রে উনিশ শতকে কলকাতায় যে দু'টি উন্নত চিত্রধারা — কোম্পানি চিত্রকলা ও বটতলার ছবি, সেগুলিও ধর্তব্য। এক কথায় বলা যায়, কালীঘাট পটশৈলী ছিল সমৃদ্ধ, যা রেখাঙ্কনে, বর্ণপ্রয়োগে ও রূপবিন্যাসে স্বতন্ত্রও বটে। একই অঙ্গে প্রাচীনতা ও নবীনতার সমন্বয় — আদিম প্রাচীন শিল্পসুলভ অকৃত্রিম সারল্য, মুক্ত উদারতার সঙ্গে কিউবিস্টিক, রিয়ালিস্টিক, ইম্প্রেশানিস্টিক ইত্যাদি আধুনিক শিল্পরীতিসুলভ সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য এমন স্পষ্টভাবে পৃথিবীর খুব কম শিল্পধারাতেই চোখে পড়ে। এই রীতিতে আধুনিক কিউবিজম শিল্প বৈশিষ্ট্য যা য়ুরোপে ১৯ শতকের গোড়ার দিকে মাত্র সৃষ্টি হয়েছে, কালীঘাট পটশৈলীতে তারও ছাপ লক্ষ্য করা গেছে। মানুষের মুখ, দেহ, বস্ত্র, আসবাবপত্র, গৃহ প্রভৃতির সমস্ত প্রকৃতিকে জ্যামিতিক তলের দ্বারা অঙ্কিত চিত্ররীতিকে কিউবিজম বলে।

পেস্ট্রেইস্প্রেনানিজম যা ছবিকে নানাভাবে ভারাক্রান্ত করে না, তাও লক্ষ্য করা যায় কালীঘাট পটশৈলীতে, এছাড়া আছে শেডিং বা ছায়াপাতের রীতি, মোগল-রাজপুত দরবারী চিত্রকলার সূক্ষ্মতা, বর্ণাঢ্যতা ও আড়ষ্টতামুক্তভাব। এইরূপ আধুনিকতা ও নবীনতার সমন্বয় বিদেশী শিল্পরসিকদের চোখেও পড়েছে। ইংল্যান্ডের আলবার্ট মিউজিয়মের সঙ্গে যুক্ত মিঃ ডব্লিউ বি আর্চার সাহেব তাঁর 'বাজার পেন্টিংস অব ক্যালকাটা' গ্রন্থে লিখেছেন—বলিষ্ঠ সীমারেখা ও প্রাণময় ছন্দের দিক থেকে কালীঘাটের চিত্রকলা অজন্তা ও বাঘ-এর সমগোত্রীয়। আবার এই একই কারণে ও দুঃসাহসিক রঙের প্রয়োগে আধুনিক চিত্রকলার সঙ্গেও এর নৈকট্য লক্ষণীয়। অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রায় অনুরূপ বক্তব্য প্রকাশ করেছেন — "সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি ও আড়ম্বর পরিত্যাগ করে মিতব্যয়ী কয়েকটি রেখায় কী অসামান্য রূপ সৃষ্টি হতে পারে, কালীঘাটের পটগুলি তার চূড়ান্ত নিদর্শন"।[১৯] রেখাঙ্কনে এই অসামান্যতা আধুনিক চিত্রশিল্পীরও চোখ এড়ায়নি। তাঁর মতে রেখার ঋজুতা ও সাবলীলতা মাতিস বা পিকাসোর তুলিতে টানা রেখার সমতুল। অশোক ভট্টাচার্য কালীঘাটের পটশৈলীর রেখাঙ্কনে সাবলীলতা ও রূপনির্মিতিতে আধুনিকতা লক্ষ্য করেছেন। "রেখার নিরবচ্ছিন্ন প্রবহমানতার সাহায্যে রূপের গড়নকে ফুটিয়ে তুলে স্বচ্ছ বর্ণের সুমিত বিন্যাসে সেই গড়নকে পরিপূর্ণতা দিয়ে রূপনির্মিতিতে কালীঘাটের পটুয়া এমন এক নতুন চিত্রাদর্শ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন যা সাধারণভাবে বলা চলে আধুনিক কলাশিল্পের লক্ষণাক্রান্ত। বিশেষ করে চিত্রপটকে বহু কিছু

দিয়ে ভারাক্রান্ত না করে কোন একটি নির্ধারিত বস্তু বা ঘটনাকে বলিষ্ঠভাবে 'চৌকস' পটে ফুটিয়ে তুলে তাঁরা এই আধুনিক মননেরই পরিচয় দিয়েছেন।"[২০]

এতকিছু গুণের অধিকারী হলেও এই রীতি শুধু বড় রেখা ও রূপবিন্যাসের হাতিয়ার নিয়ে কারবার। এবং কালীঘাট-রীতিতে গ্রামীণ সমাজের সজীব চিরাচরিত ভাব ও সারল্য লক্ষণীয়। বিশেষতঃ এই কলকাতা নগর-পরিমন্ডলে শুধু আদান-প্রদানশক্তির দ্বারা এই পটশৈলী তার চিরাচরিতসজীব ভাব ও সারল্য বজায় রাখলেও, না-রাখাটাই স্বাভাবিক ছিল। কেননা মোগল, রাজপুত দরবার ভেঙে পড়লে, সে-সব স্থানের চিত্রধারা স্তব্ধ হয়ে গেলে, উত্তর ভারতের শিল্পীদের আগমন ঘটেছিল প্রথমে মুর্শিদাবাদ পাটনায়। কিছুকাল পরে তারা এই কলকাতায় চলে এসেছিল এবং গভীর প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে; ইংরেজ রাজন্যপুষ্ট কোম্পানি চিত্রকলাও নিষ্ক্রিয় ছিল না এ ব্যাপারে। কিন্তু কালীঘাট পটশৈলীর প্রাণশক্তির প্রাচুর্য হেতু এবং নিজস্বতার জন্য, তা সম্ভব হয়নি। কালীঘাট পটশৈলীর স্বাতন্ত্র্যের উল্লেখ আগেও করা হয়েছে। স্বাতন্ত্র্য থাকলেও অতীতের ভারতীয় চিত্রকলার ধারা থেকে — অতীত ঐতিহ্য থেকে—কখনো বিচ্যুত হয়নি কালীঘাট পটশৈলী। সে অতীত ঐতিহ্যের সন্ধান মেলে অজন্তা পাহাড়ের গুহাপ্রাচীরে, বাঘ গুহায়। কালের অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে কত রাজ্যের উত্থান-পতন, কত কিছুর পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু কালীঘাট পটশৈলী অন্যের কিছু প্রভাব মেনে নিয়েও যথাসম্ভব বজায় রেখেছে তার ঐতিহ্যমন্ডিত চরিত্র-লক্ষণটিকে। চলমানতাই প্রাণ, চলমানতাই জীবনের লক্ষণ। এই শিল্পরীতি প্রাণশক্তির জোরেই আধুনিক কোনো কোনো আঙ্গিকে সমৃদ্ধ হয়েছে চলতে-চলতেই। কিন্তু ভুলে যেতে পারেনি সাবেক কালের পদ্ধতিটি। ভুলে যেতে পারেনি সাবেক কালের পটের বিষয়গুলিকে — রাম, কৃষ্ণ, কালী, শীতলা, লক্ষ্মী, বেহুলা-লক্ষ্মীন্দর ইত্যাদি দেবদেবী ও দেবোপম চরিত্রগুলিকে এবং সংশ্লিষ্ট কাহিনীগুলিকে এবং অবশ্য পরে সমসাময়িক সমাজজীবনও হয়ে উঠেছে তাদের বিষয়বস্তু, যেগুলির মাধ্যমে সাধারণ মানব-মানবীর মনে ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগানোই ছিল উদ্দেশ্য।

এখানে প্রারম্ভিক পর্বে মনে হয় বহু ছবিতে নানা রঙ ব্যবহার করা হতো না। জল বা আঠা গোলানো রঙই ব্যবহার করা হতো। তবে অদ্যাবধি প্রাপ্ত সর্বপ্রাচীন কালী পটটি রঙিন — ঘন জল রঙে অঙ্কিত। এই ঘন, অস্বচ্ছ রঙ ব্যবহারের রীতি পটশৈলীর প্রাচীন ও অন্যতম লক্ষণ। স্বচ্ছ জলরঙ ব্যবহারের রীতি পরবর্তীকালে অনুসৃত হয়। ১৮শ শতকের শেষভাগে যখন ব্রিটিশ চিত্রকররা দলে দলে এলেন এদেশে, আঁকতে শুরু করলেন এবং ফ্রান্সের বুকানন, রক্সবার্গ ওয়ালিচ এদেশের পটুয়াদের দ্বারা আঁকালেন নানান নিসর্গ দৃশ্য, সামাজিক বিষয়বস্তু, তখন থেকেই ব্যবহার শুরু হলো স্বচ্ছ ব্রিটিশ রাসায়নিক জলরঙ-এর এবং এদেশের কালীঘাট পটুয়ারাও যেন কিছুটা প্রভাবিত হলেন সেই জলরঙ ব্যবহার পদ্ধতিতে এবং রেখাঙ্কনে; প্রাচীন রীতির সঙ্গে শেডিং-এর ব্যবহার অভ্যাস করলেন পটুয়ারা। সে যা হোক, প্রারম্ভিক পর্বে রঙিন ছবি স্বল্প-সংখ্যক অঙ্কিত হয়েছিল, একথা বলা যায়। আশুতোষ মিউজিয়ামে রক্ষিত অদ্যাবধি প্রাপ্ত প্রাচীনতম কালীপট যেন জল রঙে রঞ্জিত হয়েছে। তখন পট আঁকা হতো শুধু কালো রেখা ও কালো রঙের সাহায্যে। পরবর্তীকালেও

এবৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হয়নি, রঙিন চিত্রের সঙ্গে সমান্তরালভাবে এই রীতি অনুসৃত হতে থাকে। বিষয়বস্তু নির্বাচনেও প্রাচীন বিষয়ের সঙ্গে সমকালীন সামাজিক বিষয়ও গৃহীত হতে থাকে। মনে হয় সামাজিক বিষয় নিয়ে পট রচনার সূচনা ব্রিটিশ শিল্পীর আগমনের পরে। দেবদেবীর পটের পাশাপাশি মাছ, বেড়াল, টিয়াপাখি, বাবু-বিবি ইত্যাদি পটের বিষয় হয়ে ওঠে। কালীঘাট পটের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ তার সামাজিক বিষয়ের পটগুলি। জলরঙের ব্যবহার—সেটিও বিশেষ কারণ বটে।

আমাদের মনে হয়, উজ্জ্বল কালো রঙ দিয়ে অভগ্ন কালো রেখার দ্বারা বেশি সংখ্যক পট অঙ্কিত হতো। যুক্তি এই যে, এভাবেই দ্রুত পট অঙ্কন সম্ভব, যার ফলে বহু সংখ্যক যাত্রীকে দ্রুত খুশি করা যেত। দ্বিতীয়ত, বেশি পারিশ্রমিক দেবার সামর্থ ছিল না নিম্নমধ্যবিত্ত বা দরিদ্র তীর্থযাত্রীদের। ক্রেতাদের আর্থিক ব্যাপারটাও পট অঙ্কনের মালমশলা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কৌশলকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে। রঙিন পট-চিত্র আঁকবার আগে কালো রেখা দিয়ে ছবি এঁকে নেওয়া হতো, তারপর যথাযথ রঙের বিন্যাস করে স্থানগুলি ভরাট করে নেওয়া হতো। এই ছিল সাধারণ রীতি। পরে ব্রিটিশ চিত্রকরদের রঙ-ব্যবহারের স্বতন্ত্র পদ্ধতি, বিষয় নির্বাচন ও কাগজ নির্বাচনে পৃথক রীতি, কিছুটা প্রভাবিত করলেও প্রথম প্রথম সাবেকী রীতি থেকে সরে আসেন নি তাঁরা। পরে পরে ব্যবহৃত হতে শুরু করে বিদেশী, রাসায়নিক নানান স্বচ্ছ রঙ, বিলেতী ঝকঝকে কাগজ।

রঙ ও কাগজ ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রভাব পড়লেও রূপবিন্যাসে তেমন প্রভাব পড়েনি। এক্ষেত্রে সেই সাবেকী রীতির ছাপ লক্ষ্য করা যায়। পুরুষ কিংবা নারী, দেব কিংবা দেবী — সবার মূর্তিতে অসীম সৌন্দর্য সৃষ্টির আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। পুরুষের বাবরি চুল, টানা টানা সরু গোঁফ, টানা টানা বড় বড় চোখ, ধনুকের মতো বাঁকানো ভ্রূ, টিকালো নাক, রমনীর টানা টানা চোখ, টিকালো নাক ইত্যাদি অঙ্কনের রীতিই অনুসৃত হতো। সেই রীতির ছাপ কি আজও মাটির পুতুলের, প্রতিমায়, চিত্রে অস্তিত্ব রক্ষা করে চলে না? তাই এমন ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, পটচিত্র, পুতুল-প্রতিমা-চিত্র ভাস্কর্যেরই সমন্বয়। কালীঘাটের পটুয়ারা আধুনিক শিল্পাদর্শ কিছুটা গ্রহণ করলেও পটরচনার উদ্দেশ্য ও আদর্শ বিস্মৃত হননি। কিংবা বর্জন করেননি অন্তত ১৯ শতকের শেষাবধি। পটুয়াদের পট রচনার উদ্দেশ্য বা আদর্শ ছিল জনসাধারণের মধ্যে ধর্মবোধ ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত রাখা। অলৌকিক ধর্মবোধ জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী, চৈতন্য, যীশু প্রভৃতি দেবোপম চরিত্রের উপস্থাপনা এবং সামাজিক-ধর্মনিরপেক্ষ পটপরিকল্পনায় মূল্যবোধ প্রসারের উদ্দেশ্য ছিল নিহিত। কালীঘাটের পটুয়ারা যেদিন পট রচনার অন্যতম সে-উদ্দেশ্য বা আদর্শ বিস্মৃত হয়ে শুধু আনন্দ দান ও রসসৃষ্টির উদ্দেশ্যেই পটচর্চা করতে লাগলেন, তখন হাজার হাজার পুণ্যার্থী আশাহত হয়ে শূন্য মনে, শূন্য হাতে ফিরে যেতে লাগলেন কালীঘাট থেকে। পট বিক্রয় বন্ধ হলো। পট-চর্চা স্তব্ধ হলো। পটুয়ারা হারিয়ে যেতে লাগলেন। ইতিমধ্যে বহু পূর্ববর্তী পটুয়াদের অঙ্কিত পট-চিত্রও বিদেশ থেকে ছাপা ছবি হয়ে যখন এদেশে উপস্থিত হতে লাগলো, সেদিন থেকে পট ও পটুয়ারা সরে যেতে লাগলেন লোকচক্ষুর অন্তরালে ক্রমে ক্রমে।

কালীঘাট শৈলী আজ জীবিত না হলেও অনুভবে আসে। এর উদ্দেশ্যগুলি ছিল মহৎ। সেগুলির মাধ্যমে তৎকালীন মানুষের ধর্মীয়-আকর্ষণ ও সামাজিক রুচি স্পষ্ট হয়। এই শৈলী দূরের-কাছের বহু শিল্পী-সমালোচককে মুগ্ধ করেছে। পটশিল্প যামিনী রায়ের মতো শিল্পীর চিন্তায় ও কর্মে প্রভাব বিস্তার করেছিল যথেষ্ট। তার ঐতিহ্য শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

নান্দনিক তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে পটের শৈল্পিক গুণগত মান সম্পর্কে আলোচনা

পূর্ববর্তী আলোচনাগুলিতে পটচিত্রের উপাদান, নির্মাণ-প্রণালী ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখন এর শৈল্পিক গুণগত মান সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। লোক-ইতিহাসবিদ ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, কবি জসীমউদ্দিন থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককালের লোকশিল্পরসিক গবেষকগণের অনেকেই পটচিত্রের ও পটুয়ার জীবনের নানা দিক আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা পটচিত্রের শিল্পগুণগত মূল্যায়নকে ততটা গুরুত্ব দেন নি কিংবা মূল্য-বিচার কবলেও পরিমাণে যথেষ্ট নয়। অবশ্য ইতিমধ্যে পটচিত্রের প্রথম লক্ষণীয় সংগ্রাহক গুরুসদয় দত্ত এর শিল্পমূল্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই করেছেন তাঁর গ্রন্থে।[২১]

"To me these multiple pats of rural Bengal appears to me of the highest artistic importance not only from the point of view of their origin, their relation to the art currents of other provinces of India as well as their intrinsic merit as art; but also from the point of view of their significance in the history and development of art in general throughout the world and the movements and impulses of the new art of Europe and America of the present day."

গুরুসদয় দত্তের পটচিত্রের শিল্পমূল্যায়নে কিছুটা অতিশয়োক্তি আছে, একথা কেউ কেউ হয়তো ভাবতে পারেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর মূল্যায়ন অভ্রান্ত এবং তুলনামূলক। তবে তাঁর আলোচনা বিস্তারিত নয়। আমরা তারই শিল্পের গুণগত মান নির্ণয়ের পদ্ধতি অনুযায়ী এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তৎপরবর্তী অন্যান্য পটচিত্র গবেষকদের প্রাসঙ্গিক ভাবনা-চিন্তার উল্লেখ ও আলোচনা করতে পারি।

অধ্যাপক কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'পট ও লোকচিত্র' প্রবন্ধে লিখেছেন — "পটুয়া রঙ ও রেখা দিয়ে যে আলেখ্য রচনা করত শিল্পবস্তু হিসাবে সেগুলি অতুলনীয়।"[২২] অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় পটের অন্যান্য দিকেরও আলোচনা করে একে অতুলনীয় শিল্পবস্তু বলে অভিহিত করলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালার সঙ্গে যুক্ত সুধাংশু রায় সামগ্রিকভাবে বাঙালীর অঙ্কনকলার মধ্যে পটচিত্রকে বাঙালীর নিজস্ব অঙ্কনকলার

সর্বোত্তম অভিব্যক্তি বলেছেন। উভয়েই পটচিত্রের শিল্পগুণের কথা স্বীকার করেছেন, কিন্তু উভয়েই এবিষয়ে স্বল্পবাক। বাঙালীর নিজস্ব অঙ্কনকলার সর্বোত্তম অভিব্যক্তি পটুয়াদের এই পটচিত্রের যথাযথ মূল্যায়ন আজও হয়নি। পটের অনুসন্ধান, সংগ্রহ-সংরক্ষণ, আলোচনা-অধ্যয়ন, মূল্য-নির্ণয় ইত্যাদি সূত্রে যেটুকু সমাদর তার কপালে জুটেছে, তা তার মূল্যের তুলনায় যৎকিঞ্চিৎ! সেদিনের পয়সা-পয়সা দামের কালীঘাট তীর্থের পটচিত্র আজকাল বহুমূল্যে বিক্রি হয়, — বিশ্বজুড়ে তার কদর। তুচ্ছমূল্যের জিনিসটির এমনতর অতুচ্ছ আদরে মন খুশি হয়। বিস্ময়ের ও আনন্দের ব্যাপার এই যে, এটি অত্যাধুনিক চিত্রকলা না হলেও পশ্চিমের আধুনিক চিত্রকলার চিত্রলক্ষণে-সমৃদ্ধ এই চিত্রকলাটি, বিদেশের আধুনিক চিত্রকেও প্রভাবিত করেছে। পটচিত্রের বৈভবের যুগে পাবলো পিকাসো, মাতিস, প্রভৃতি সুবিখ্যাত পশ্চিমী শিল্পীকেও নাকি প্রভাবিত করেছে। বিশেষভাবে হেরে নাদলেজে কালীঘাট পট থেকে বহু শিল্প-বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছেন। এসব ব্যাপার কার না ভালো লাগে? আমরা আশ্চর্য হই যখন উইলিয়ম আর্চার-এর রচিত 'কালীঘাট পেইন্টিংস' (১৯৬৮/৭১) বইতে পড়ি—যে সেকালেও ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের বাজারে আধুনিক শিল্পীরাও হুমড়ি খেয়ে পটচিত্র কিনতেন এবং এক-একটি পটের একাধিক নকল হতো ইত্যাদি। একথা সত্য। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, এক সময় য়ুরোপীয় চিত্র-ব্যবসায়ীরা অজস্র পটচিত্র নিয়ে গেছে এদেশ থেকে বেশি দামে বিক্রি করবার জন্য। বিদেশী চিত্র-ব্যবসায়ীর এবং বিদেশী শিল্পীর চোখে তার শিল্প-বৈভব ধরা পড়েছিল নিশ্চয়। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, দীনেন্দ্র রায় বলেছেন — সাধারণের কাছে তার আদর ছিল প্রচুর, মেলায় বিক্রি হতো প্রচুর ইত্যাদি। কিন্তু সেকালে কলকাতার শিক্ষিত বাঙালীর কাছে এর ততটা কদর ছিল না। তখন ধনীরা ঘর সাজাতেন বিদেশী শিল্পীর চিত্র দিয়ে। কেন জানা যায় না বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ এর প্রশংসা করতে পারেন নি। অবশ্য সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের মতো কোনও কোনও ব্যক্তি বাঙালীর সূক্ষ্ম শিল্পের অনাদর দেখে তীব্র দুঃখ অনুভব করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে লিখেছিলেন — "আর্ট স্কুলে ভর্তি হইয়াছি, কিন্তু আমাদের দেশের শিল্পকলার আদর্শ যে কি তা আমরা জানি না।"[২৩] তবে অবনীন্দ্রনাথের মতো উচ্চতরস্তরের শিল্পী ও সমালোচকগণ এর শিল্প-সুষমায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কোনও কোনও শিল্পবস্তু মূল্যবান উপাদানে নির্মিত হয়, আবার কোনও শিল্পবস্তু তুচ্ছ উপকরণে নির্মিত হয়ে অতুচ্ছ শিল্প-সৌন্দর্যের আধার হয়। পটচিত্র তুচ্ছ উপকরণে-নির্মিত অতুচ্ছ শিল্প-সৌন্দর্যের আধারবিশেষ।

শিল্পসৃষ্টির সচেতন-প্রয়াস শিল্পবস্তুকে রমণীয় করে তোলে। পটচিত্রের ক্ষেত্রে সচেতন বা আয়াস-পটুত্ব লক্ষ্য করা যায় না ববং এর সর্বাঙ্গে একটি সজীব স্বতঃস্ফূর্ততার ভাব লক্ষ্য করা যায়। শিল্প যখন জীবনধারণের উপায়স্বরূপ জীবিকা হয়, তখন তা থেকে স্বতঃস্ফূর্ততা হারিয়ে যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় পটচিত্র পটুয়াদের জীবনধারণের একটি উপায় হলেও, এতে এতটুকু কৃত্রিমতা বা যান্ত্রিকতা চোখে পড়ে না। পটচিত্র অঙ্কনশিক্ষার জন্য কোনও সরকারি বা বেসরকারি শিল্পবিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হতে হয় না। পটুয়ারা মৌলিক বৃত্তি অনুযায়ী—বংশানুক্রমে পটচিত্রাঙ্কন শেখেন। তবুও পটচিত্র

অতুলনীয় হয়ে ওঠে।

শিল্পগবেষক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, আজ থেকে প্রায় শতাধিক বছর আগে অর্থাৎ কালীঘাট পটচিত্রের যখন রমরমা বাজার ছিল—জনসাধারণ হাজার হাজার পটচিত্র কিনতেন বাজার থেকে, তখন পটচিত্রকে নিম্নমানের চিত্র আখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কোন্‌দিক থেকে একে নিম্নমানের ভেবেছেন, তা বলেন নি। তিনি হয়তো এর রং, কাগজ ইত্যাদি উপকরণগত তুচ্ছতার দিকটি লক্ষ্য করেছিলেন, কিংবা জয়পুরী দরবারী চিত্রসুলভ অতিআলঙ্কারিকতা ও সূক্ষ্মতার দিকটির সঙ্গে তুলনামূলক বিচার করেছেন। সেকালে অনেক শিক্ষিত মানুষ এইসব দিক লক্ষ্য করতেন এমন নজির যথেষ্ট আছে। কিন্তু চিত্রশিল্পের শৈল্পিক গুণতো শুধু সূক্ষ্মতার ওপর নির্ভর করে না বরং অনেকাংশে নির্ভর করে তাতে অঙ্কিত অবয়বের সৌন্দর্য ও ভাবভঙ্গির ওপর। অঙ্কিত অবয়বে কাল্পনিক রূপ-সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা যেত না। পটে-অঙ্কিত কোন বীর পুরুষদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, পেশী-বাহুল্য বা পেশী-তরঙ্গ সৃষ্টি করে সৌন্দর্য সৃষ্টির অযথা প্রয়াস লক্ষ্য করা যেত, তাও নয়। বীরোচিত ভাব-ভঙ্গি অঙ্কনের দক্ষতায় বীরভাব ফুটে উঠত। তেমনি সুন্দর কোনও নারীদেহের রূপসৌন্দর্য ফোটাতে যথাযথ সৌন্দর্য কল্পিত হতো, অযথা বাড়াবাড়ি ছিল না। বিস্ময়ের ব্যাপার পুরুষদেহের দৃঢ় বীরভাব এবং নারীদেহের কমনীয়ভাব ফোটাবার অঙ্কন-রীতিটিই লক্ষ্য করা যেত পটচিত্রগুলিতে। দর্শকের দৃষ্টি-সুখদায়ক রূপ অঙ্কনেই তাদের মনোযোগ ব্যয়িত হতো না। আয়োজন এমন কিছু নয়—শুধুমাত্র রঙ রেখা এবং রূপবিন্যাস। ভাব ও ভক্তিরসের কাহিনীগুলি চিত্রসৌন্দর্যে অপূর্ব ও ঐশ্বর্যময় হয়ে উঠতো। সে-সৌন্দর্য বলতে বোঝায় সরলতা, তেজস্বিতা, রূপলাবণ্য, প্রাণবন্ততা, পৌরুষের দৃপ্তভাব এবং সরসতা। এসব বৈশিষ্ট্য সাধারণত আদিম চিত্রকলায় লক্ষ্য করা যেত। গুপ্ত সাম্রাজ্যের আগে, গুপ্তযুগে ও তার কিছু পরবর্তী কালে অঙ্কিত অজন্তা গুহাচিত্রে, বাঘ গুহার প্রাচীরের, চিত্রাবলীতে এসব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছিল। একথা সত্য যে, শুধুমাত্র বলিষ্ঠ, অভঙ্গ, লম্বা, দৃঢ়ভাবে টানা সুপুষ্ট কালো রঙের রেখার দ্বারা জীবদেহ, বৃক্ষ-লতাপাতা ইত্যাদি অঙ্কন করা হতো, তাতেই জীবদেহের উচ্চ-নীচতা স্পষ্ট হয়ে উঠত। চিত্রবিষয়ের সীমারেখা বেশ মার্জিত, এবং স্পষ্টও হয়ে উঠত।

পটের বিষয়ভেদে শিল্পকলার বৈচিত্র্য দেখা দিত। কিন্তু শিল্পকলার ঘাটতি লক্ষ্য করা যেত না। পট নানা রকমের। যেমন—রামায়ণ-মহাভারত, বেহুলা-লখীন্দর ইত্যাদি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক পট; ডাকাতের পট, সাহেব পট ইত্যাদি সামাজিক অঞ্চলবিশেষের ঘটনা বা কাহিনী ভিত্তি করে পট। সব ক্ষেত্রেই বলিষ্ঠ রেখার টান লক্ষণীয়। পটচিত্রে রেখার টানে বলিষ্ঠতা, ঋজুতা, সাবলীলতা অজন্তা গুহাচিত্রকে স্মরণ করায়। কালীঘাট পটচিত্র ছিল কী অপূর্ব! অথচ সেগুলি ছিল অনাড়ম্বর, খুঁটিনাটি মাপজোখ-বিবর্জিত—শুধু কয়েকটি রঙ ও রেখার অপূর্ব সমাবেশ। রঙের ব্যবহারে ও রেখার অঙ্কনে পটুয়ার দক্ষতা বিস্ময়কর। কলা-সমালোচক আর্চার সাহেব এই প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, "বলিষ্ঠ সীমারেখা ও প্রাণময় ছন্দের দিক থেকে কালীঘাটের চিত্রকলা অজন্তা ও বাঘ-এর সমগোত্রীয়। আবার এই একই কারণে ও দুঃসাহসী রঙের প্রয়োগে আধুনিক চিত্রকলার সঙ্গেও এর নৈকট্য লক্ষণীয়।"[২৪] পটরসিক

গুরুসদয় দত্ত লিখেছেন — 'ইহা কেবল রেখার সতেজ, সুনিপুণ, প্রখর ও ভাবব্যঞ্জক প্রয়োগ.......।"[২৫]

রেখা-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা আমাদের মূল উদ্দেশ্য নয়, তুচ্ছ রেখার সাহায্যে কী অতুচ্ছ তেজস্বিতা, প্রাণবন্ত ভাব, সরসতা, সরলতা ও শিল্পশোভা সৃষ্টি হতো, তা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য। যেমন তুচ্ছ কয়েকটি রেখায়, তেমনি প্রাথমিক কয়েকটি রঙের ব্যবহারে পটে কী অপূর্ব শিল্পশোভা সৃষ্টি হতো, তা ভাবলে বিস্ময় জাগে। গুরুসদয় দত্ত যথার্থই বলেছেন—"লীলায়িত রেখার সঙ্গে নানা রঙ-এর অতি মনোহর ও রসপূর্ণ সমাবেশ এই শ্রেণীর চিত্রগুলিকে শিল্প হিসাবে অতি গৌরবময় বৈশিষ্ট্য দান করে।"[২৬] তিনি এই প্রবন্ধেই অন্যত্র পটে স্বল্পসংখ্যক রঙ ব্যবহারের কথা জানিয়েছেন ব'লে আমাদের এখানে 'নানা'-অর্থে বিভিন্ন বা একাধিক ভাবাই সঙ্গত। বহুবর্ণ পটচিত্রে লাল-ফিকে, হলদে, ঘন কালো, উজ্জ্বল নীল ইত্যাদি কয়েকটি রঙকে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। বহুবর্ণ পটগুলি ছিল সত্যিই অনুপম। পটুয়ারা পটে উজ্জ্বল রঙ ব্যবহার করতেন বলে তা সম্ভব হয়েছিল। তাছাড়াও, সে-সব রঙকে ঘষে-মেজে আরও উজ্জ্বল করে তুলতেন পটুয়ারা। পটের শৈল্পিক সৌন্দয দ্বিগুণতর হতো পাশাপাশি সামঞ্জস্যপূর্ণ রঙ ব্যবহারে—রঙের ঐকতান সৃষ্টির ফলে। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে, বহুবর্ণবিশিষ্ট পটচিত্রের তুলনায় একবর্ণবিশিষ্ট চিত্রের আকর্ষণ গভীরতর নয়। রঙ যাই হোক, তার উৎস বা উপাদান খুব উচ্চমূল্যের ছিল না। কোনও খনিজ বা উদ্ভিদজাত পদার্থ কিংবা বাজারের স্বল্প দামের রঙ ছিল পটচিত্রের রঙ। ঘরে বসে সস্তা দামের রঙ তৈরি করে বা ক্রয় করে পট সৃষ্টি করা পটুয়াদের অন্যতম কৃতিত্ব।

পটের বিষয়বস্তুর রূপবিন্যাস তার অতুলনীয় শিল্পসৌন্দর্যের অন্যতম কারণ। দেহাবয়ব—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠনে, সাজ-সজ্জায়, কোনও ঘটনা বা কাহিনীকে ক্রম-অনুযায়ী চিত্রণে, কাহিনী বা বিষয়বস্তু যেন সজীব হয়ে উঠতো। পটচিত্রে বিষয়বস্তুর এই জীবন্তভাব এবং ভাবের যথাযথ অভিব্যক্তি পটুয়াদের বাস্তব অভিজ্ঞতারই পরিচায়ক। আদিম লোকশিল্পে যেমন স্বাভাবিক প্রাণশক্তির প্রাচুর্য ছিল পটচিত্রে বিষয়ের জীবন্তভাবে তারই প্রকাশ। পটচিত্র যেমন আদিম শিল্প-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, তেমনি বহু আধুনিক শিল্প ঘরানা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এতে লোকশিল্পের ঘরানা যেমন উপস্থিত, আবার কিউবিস্টিক, রিয়্যালিস্টিক, ইম্প্রেশানিস্টিক, অ্যাবস্ট্রাক্ট, এক্স-প্রেশানিস্টিক, সুরিয়ালিস্টিক ঘরানার কম-বেশি প্রকাশও লক্ষ্য করা যায়। যেমন ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে য়ুরোপে উদ্‌ভাবিত কিউবিজম, যাতে বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় কালীঘাট পটচিত্রে তা আভাসিত হয়েছিল ১৯ শতকেই। এবং শেডিং-এর ব্যাপার, যা কালীঘাট পটচিত্রে দেখা যায়, তাও ভারতীয় শিল্পরীতির মধ্যে অনেক আগেই ছিল। অলংকার দেহের সৌন্দর্য বর্দ্ধন করে। চিত্রের ক্ষেত্রে একথা সত্য। তবে অলংকারের প্রাচুর্য নয়, অলংকরণের পদ্ধতির ওপর সৌন্দর্য অনেকটাই নির্ভর করে। পটুয়াগণ সেই পদ্ধতিতে চূড়ান্ত দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। বৃক্ষলতা, নদী, পাহাড় ইত্যাদির সৌন্দর্যবর্দ্ধনের জন্য উৎকৃষ্ট আলংকারিক রীতি অনুসরণ করতেন তাঁরা।

পটচিত্র সাধারণত গ্রাম বা শহরের সাধারণ মানুষের কাছে প্রদর্শিত হয়। এবং সাধারণের

মনোরঞ্জনের ব্যাপারটিকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হয়। সে-উদ্দেশ্যে চিত্রকে রস-সমৃদ্ধ করার প্রয়োজন থাকে। রস-সমৃদ্ধ করতে গিয়ে কিন্তু মূর্তির ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর রূপ কল্পিত হতো না কিংবা সে-কল্পনায় আতিশয্যও ছিল না। রস-সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পটুয়ারা বরং লোককাহিনীর রসসমৃদ্ধ ঘটনাগুলি নির্বাচন করতে অভ্যস্ত ছিলেন। পটচিত্রে মনুষ্য বা জীবজন্তুর মূর্তি-অঙ্কনে এবং মূর্তির প্রকৃতি-পরিস্ফুটনে পটুয়াদের দক্ষতা অবশ্যই স্বীকার্য। কেননা, মূর্তিগুলির হাবভাবে কোনপ্রকার অস্বাভাবিকতা বা কৃত্রিমতা এবং গতানুগতিকতাও ফুটে উঠত না। বরং অঙ্কিত বিষয়বস্তুর জীবন্তভাব ও অন্তর-ভাব ফুটিয়ে তুলতে পারতেন পটুয়ারা। যে-কোন ভাবকে প্রত্যক্ষ বা রূপে জীবন্ত করে তোলাই শিল্পের কাজ। তাতেই শিল্পীর কৃতিত্ব। পটুয়ারা পটচিত্রকে সজীব ও ভাবব্যঞ্জক করে যথেষ্ট দক্ষতারই পরিচয় দিতেন। পটচিত্রে কোনও কাহিনী বিবৃত ক'রে কাহিনীর মূল ভাবটিকে দর্শকের মনের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়াই পটচিত্রের অন্যতম কাজ। পটচিত্রে পরিষ্কারভাবে কাহিনী বিবৃত করবার ক্ষমতা তার উদ্ভবকাল থেকেই লক্ষ্য করা যায়। সহজ, সরল ভাষায়, সরল ভঙ্গিতে সর্বসাধারণের বোধগম্য করে কাহিনী বিবৃত করবার সহজাত ক্ষমতা ছিল পটুয়াদের। পাঠক পটচিত্রের মাধ্যমে কাহিনী আস্বাদন করত ও কাহিনীর ভাব-রসে সমৃদ্ধ হতো। যেমন—রামপটে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার বনবাসের কাহিনী বিবৃত করা হয় এবং তা থেকে রাম-লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভাব ও সীতার পতিভক্তির ভাবটি দর্শকচিত্তে সঞ্চারিত হয়ে যায়। যমপটে—যমের কাহিনী, সেই সঙ্গে পাপ-পুণ্য ও তার পরিণামভাব দর্শক-সাধারণ আহরণ করে। ধর্মবোধ ও নীতিবোধ জাগরণে পটশিল্পের অতুলনীয় ভূমিকার কথা অনেকেই স্বীকার করেছেন। পটুয়ারা যেমন লৌকিক ধর্মীয় পট আঁকতেন, তেমনি সামাজিক পটও আঁকতেন। ধর্মীয় পটের মাধ্যমে ধর্মবোধ জাগ্রত করতেন এবং সামাজিক পটের মাধ্যমে লোকশিক্ষা, নীতিশিক্ষা ও পরামর্শ দিতেন পটুয়ারা। লোকশিক্ষায় সামাজিক পট-প্রসঙ্গে অধ্যাপক কল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায় কয়েকটি সামাজিক পটের উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন—সেকালের কলকাতার ধনী সমাজের বিলাসী বাবু'র মদ্যপান ও বারাঙ্গনাগৃহে গমন, নায়িকার পাশে গলায় দড়ি-বাঁধা বাবু, ব্যাভিচারিণী স্ত্রী-হত্যা ইত্যাদি। এগুলি ভারি উপভোগ্য ব্যঙ্গচিত্র। যাত্রা কথকতার মতো এগুলি নীতিশিক্ষাদায়ীও বটে।

পটুয়ারা একটি সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও তারা সংকীর্ণ, সাম্প্রদায়িক বোধ-বুদ্ধিশূন্য, উদার ও মুক্তমনের অধিকারী শিল্পী জাত। হিন্দু, মুসলিম, জৈন, খ্রীস্টান ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত লোককাহিনী নিয়ে পটুয়ারা পট আঁকতেন। বিশেষ কোনও সম্প্রদায়ের বা ধর্মমতের প্রচার তাঁদের লক্ষ্য ছিল না। গাজীর পট ইত্যাদি বাদ দিলে, বলা যায়, পটুয়ারা অসাম্প্রদায়িক এবং তাঁদের অঙ্কিত পটচিত্র সাম্প্রদায়িকতামুক্ত উদার মনের সৃষ্টি। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, ভারতের মানুষ নানা ধর্মে ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হলেও, আজকাল কিছু মানুষ যেভাবে ধর্ম ও সম্প্রদায়বোধে বিভক্ত হয়ে জাতির ঐক্য নষ্ট করতে প্রয়াসী হয়েছে, তা থেকে দেশকে রক্ষা করতে হলে এক জাতীয় ভাব ও সমভাবাপন্ন সংস্কৃতিতে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে এই অসাম্প্রদায়িক চিত্রপদ্ধতি বা এর তুল্য কোনও চিত্রপদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা বিধেয়।

◆ সূত্র ঃ তৃতীয় অধ্যায় ◆

১. বিনয় ঘোষ; বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব (১৯৮৯)/পটুয়া ও পটশিল্প পৃঃ ১২৩
২. ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য; বাঙলার লোকসাহিত্য (১ম খন্ড) (১৯৬২), পৃঃ ২৩৫
৩. ঐ পৃ ঃ ২৩৫-২৩৬
৪. দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়; বীরভূমের যম পট ও পটুয়া (১৯৭২), পৃঃ ৬
৫. ঐ পৃঃ ৭
৬. ঐ পৃঃ ৭
৭. ডঃ বারিদবরণ ঘোষ; পট পটুয়া পটগীতি (১৯৯২), পৃঃ ১৫
৮. প্রণব রায়; বাংলার পট কথা/ 'কৌশিকী' ২য় বর্ষ, ৮-৯ সংখ্যা, ১৩৭৯।
৯. ডঃ কল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়; বাংলার লোকশিল্প (১৯৬১) পৃঃ ৫২-৫৩
১০. শান্তিনিকেতন কলাভবন ছাত্রাবাস ও শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমানন্দ ট্রাস্ট আটপুর থেকে প্রচারিত পুস্তিকা।
১১. Sudhansu Kr. Roy; The Ritual Art of the Bratas of Bengal, (Jan, 1961), P-52
১২. Hall - GIGEC, British Museum (London 1930), P - 226
১৩. পটুয়া সঙ্গীত (১৯৩৯)
১৪. পটুয়া ও পটশিল্প/বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব, (১৯৮৯) পৃঃ ১২২
১৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য ঃ মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (১৯৩৯)
১৬. স্বদেশ, দেশীয় রাজ্য শীর্ষক প্রবন্ধ
১৭. দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বীরভূমের যমপট ও পটুয়া (১৯৭২), পৃঃ ২৭
১৮. ভারতের চিত্রকলা, পৃঃ ২৫৪
১৯. অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বঙ্গলক্ষ্মীর ঝাঁপি (১৯৭৯)
২০. অশোক ভট্টাচার্য ঃ বাংলার চিত্রকলা/কালীঘাটের পটশৈলী, (১৯৯৪), পৃঃ ৯৭
২১. Gurusaday Dutta : Folk art and crafts of Bengal : The collected papers (cal 1990, P 67)
২২. পট ও লোকচিত্র/বাংলার লোকশিল্প, পৃ ঃ ৪৬ (১৯৬১)
২৩. স্বদেশ 'দেশীয় রাজ্য' (প্রবন্ধ)
২৪. বাজার পেইন্টিংস্ অব্ ক্যালকাটা ঃ জি. আর্চার (১৯৫৩)
২৫. পটুয়া সঙ্গীত ঃ (১৯৩৯)
২৬. ঐ



আধুনিকা স্ত্রী

● চতুর্থ অধ্যায় ●

পটচিত্রে বর্ণিত সমাজচিত্র

সাহিত্য যেমন সমাজের দর্পণ, সেইরকম চিত্রশিল্প থেকেও আমরা সমাজকে চিনতে পারি। কারণ চিত্রশিল্পীরাওতো প্রচলিত সমাজ থেকেই তাঁদের বিষয়বস্তু গ্রহণ করেন। পটুয়ারা পৌরাণিক বিষয়ে বেশি ছবি আঁকলেও সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা, আন্দোলন অনেক কিছুই তাঁরা এঁকেছেন। পটুয়ারা তাঁদের চিত্রশিল্পে বাস্তববাদকে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের শিল্পকর্ম কেবলমাত্র নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকার কারণে কালীঘাটের পটুয়ারা আজও অমর। সমাজের বিভিন্ন দিক পটুয়াদের বিষয় হয়েছে। পটশিল্পীদের তুলির টানে অষ্টাদশ—উনবিংশ শতাব্দীর সমাজের নানা দিক ফুটে উঠেছে।

অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তায় গ্রামীণ শিল্পীরা কালীঘাটে এলেন। তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য একক চিত্রের পট সাজালেন। বিষয় হিসাবে এলো বিভিন্ন দেবদেবী এবং সামাজিক নানা ঘটনা। কালীঘাটের পটে আঁকা হলো বারবিলাসী, স্বৈরিণীর বস্ত্রহরণ প্রভৃতি অনেক কিছুই। উনিশ শতকী বাঙালী পুরুষের চরিত্রে মদ, মেয়ে মানুষ-সম্ভোগ, এমনকি বেলেল্লাপনা, নষ্টামি ছাপ ফেলত। চিত্রশিল্পী পটুয়াদের নজর এড়িয়ে যায় নি এই বিষয়গুলি। তাঁরা এঁকেছেন পুরুষের কোলে মহিলা, পাশাপাশি পুরুষ এবং মহিলা—পুরুষ মহিলাটিকে মদ খেতে পীড়াপীড়ি করছে, বিলাসী'বাবু'দের গণিকাগমন, মদ্যপান বা বারাঙ্গনা বশীভূত অবস্থার ছবিও যথেষ্ট আঁকা হয়েছে। নায়িকার পাশে গলায় দড়ি বাঁধা অবস্থায় এমন 'বাবু'ও আঁকা হয়েছে, যার মুখটি শুধু মানুষের, বাকি শরীরটা বশংবদ ভেড়ার। একসময় বাঙালীর ঘরে ঝি বা রাঁধুনীর সঙ্গে বাবু-র সম্পর্ক—এই ছিল কেচ্ছার উৎস। পুটয়ারা তাও এঁকেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর 'বাবুকালচার' সুন্দরভাবে পটুয়াদের পটে চিত্রিত হয়েছে, তাঁরা তাঁদের অঙ্কিত চিত্রের মাধ্যমে বাবুদের সমালোচনা করেছেন। বাবুদের কোলে বিবি, বিবির পায়ে বাবুর হাত, এসবইতো পটুয়াদের পটে বাবু কালচারের নিদর্শন। কালীঘাটের পটের মধ্যে আমরা বাবু আর তাদের ভালবাসার বিবিদের বিভিন্নভাবে দেখতে পাই। পাকানো ধুতির কোঁচা, নক্সা করা কোর্ত্তা, নাগরাই জুতো, টানাটানা চোখ আর বাবরি চুল বাবুরা নানাভাবে তাঁদের বিবিদের সোহাগ করছেন। সুডোল, নিতম্বিনী বারবনিতাদের নানা ঢঙে দেখা যায়। কেউ ময়ুর কোলে খেলছেন, কেউ আলবোলা নিয়ে বসে আছেন, কেউ হাওয়াই ডুরে শাড়ি, আবার কেউবা নব্যসুন্দরীদের মতো বীণাবাদিনী তবলা-সুন্দরীরূপে অবির্ভূতা। পটে চিহ্নিত বাবুরা কেনা গোলামের মতো। সেকালের স্বনামধন্য বারবনিতা বকনা পিয়ারী, সুপনজান, বেলারানি, পারুলবালা, তুলসীসুন্দরী প্রমুখের মুখাবয়বও প্রাচীন পটগুলিতে লক্ষ্য করা গেছে। পটুয়ারা একটি চৌকো পটে কালচারের বিশদ দৃশ্য চিত্রিত করতে পারে নি ঠিকই, তবে উল্লেখযোগ্য বিচ্ছিন্ন কয়েকটি দৃশ্য চিহ্নিত করেছে —যা থেকে সেকালের বাবু সমাজকে বুঝতে অসুবিধা হয় না।

'বাবু' সমাজ ছাড়াও পটুয়াদের পটে সমাজের নানা দিক চিহ্নিত হয়েছে। এই চিত্রগুলি

থেকে সমসাময়িক জীবনকে বোঝা যায়। হাতির পিঠে চড়ে ইংরেজ বাঘ-শিকারী (১৮৩০), ঘোড়দৌড়ের জকি (১৮৩০), বাঘের সঙ্গে লড়ছে শ্যামাকান্ত (১৮৩০), এক জন স্বামী তার বিবিয়ানি করা বউকে মারছে (১৮৮০), আলিঙ্গনরত প্রেমিক-প্রেমিকা (১৮৮০), খুনের বিচার : জনৈক ইংরাজ বিচার করছেন (১৮৪৫), অনুগ্রহপ্রার্থী প্রেমিক (১৯০০), একটি মেয়ে লাথি মারছে তার প্রেমিককে (১৯০০)—এইগুলি পটুয়াদের পটচিত্রে জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছিল।

শুধু চিত্রণ নয়, পটুয়ারা সমাজ-সমালোচকদের ভুমিকাও নিয়েছিল। স্ত্রীকে প্রহাররত হিংস্র স্বামীর প্রতি ব্যঙ্গ করা হয়েছে একটি পটে; দুষ্ট অপরাধীর সমালোচনাও করা হয়েছে। যেমন —তারকেশ্বরের মোহন্তের ধূর্ততা ও এলোকেশী হত্যার চিত্রণ। ঘটনাটি তখন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। কারণ তাতে এক মোহন্তর ধূর্ততা প্রকাশ পেয়েছিল। অথচ এই ঘটনায় জড়িত মোহন্তটির ধর্মীয় ভূমিকা সম্মানীয় হওয়া উচিত ছিল। ব্যঙ্গ ছিল এক স্ত্রী লোকের কর্মে, সে একজন বিখ্যাত সাধুকে তাড়াচ্ছিল। একটি পটে দেখানো হয়েছে বিড়ালের মাছ খাওয়ার দৃশ্য। ব্যঙ্গ আছে নিশ্চিন্ত বিড়ালের আনন্দোচ্ছলতায়—যার ঘরের মালিক বারাঙ্গনা নিয়ে ফূর্তিতে রত ছিল। একটি পটে খেমটা নাচের দৃশ্য দেখানো হয়েছে। বাবুদের বেলেল্লাপনার জন্য বাগানবাড়িতে এই নাচ হতো। একটি বালিকা কেশ সজ্জায় ব্যস্ত একটি পটে। অন্য একটি পটে দেখানো হয়েছে—একটি মেয়ে তার মাথায় খোঁপা বাঁধছে। এইসব থেকে মেয়েদের সৌন্দর্য-সচেতনতার বিষয়টি ধরা পড়ে। আয়নার সামনে মহিলা—এক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। ভাই-ফোঁটা বাঙালী জীবনের এক বড় উৎসব। এই দিনটি শুধুমাত্র ভাই আর বোনের। অন্য কারোর প্রবেশাধিকার নেই এই দিনটিতে। ভাই বোন যত দূরেই থাকুক এই দিনটিতে একজায়গায় মিলিত হয় সবাই। শুধুমাত্র ভাই বোনকে কেন্দ্র করে হলেও বাড়ি উৎসবের রূপ নেয়। দিনটিকে উপভোগ করেন সকলেই। এই ভাইফোঁটার দৃশ্যটিও চোখ এড়ায়নি পটুয়াদের। পুটয়ার তুলির টানে ফুটে উঠেছে—ভাই বসে আছে পিঁড়িতে, এক বোন তাকে ফোঁটা দিচ্ছে। অন্য বোনেরা থালায় মিষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে। বোনদের মুখে যৌথ পরিবারের তৃপ্তি। এদের মধ্যে এক মহিলার কোলে শিশু। শিশুরা যে মাতৃক্রোড়ে পরম শান্তিতে থাকে সে দৃশ্যটিও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কালীঘাট পট যে শতকে আঁকা হয়েছিল তখন সঙ্গীত অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায় পটুয়াদের আঁকা পটে। আঁকা হয়েছে এক সঙ্গীত শিল্পী বসে আছেন, সেতার বাজাচ্ছেন এক মহিলা। ১৯১৭ সালে আঁকা হয়েছে মহিলারা নৃত্যরত অর্থাৎ মহিলারাও যন্ত্র সঙ্গীতে কিংবা নৃত্যে অংশগ্রহণ করতেন। এ বিষয়ে সমাজে মহিলাদের কোন বাধা ছিল না। সমাজ উদার মনে এটা গ্রহণ করেছিল। তাই পটুয়ারাও এটা আঁকতে পেরেছিলেন। কারণ পটূয়াদের পট বিক্রি হতো বলেইতো এই ধরণের ছবি আঁকা হয়েছিল।

১৯১৯ সালে আঁকা বীরভূম থেকে প্রাপ্ত একটি চৌকো পটে দেখা যাচ্ছে —লক্ষ্মীর মূর্তি, এক ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণী নাম জপ করছে—হাতে জপের মালা, মাঝি নৌকা চালাচ্ছে, সূর্যমণ্ডল, ঢেঁকিতে ধান ভাঙছে মহিলা, চরকায় সুতো কাটছে মহিলারা। এই চৌকো পট থেকে ব্রাহ্মণ দম্পত্তির ধর্মীয় মনোভাব ফুটে উঠেছে। তখনকার সমাজের ধর্মপরায়ণতার

দিকটি উপলব্ধি করা যায়। গ্রামবাংলায় ধান ভাঙার যন্ত্র ছিল ঢেঁকি, এখনকার মত যন্ত্রচালিত মেসিন নয়। আর এই ঢেঁকিতে ধান ভাঙতেন মহিলারা। সেটিও চিত্রিত। মহিলারা স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করতেন বিভিন্ন কাজকর্মের মধ্য দিয়ে। যেমন, তাঁরা চরকায় সুতো কাটতেন। এটি চিত্রিত। ১৯১২ সালে আঁকা, রাজদরবারের দৃশ্য চিত্রিত হয়েছে বীরভূম থেকে পাওয়া একটি পটে। এখানে দেখানো হয়েছে রাজা পারিষদবেষ্টিত হয়ে বসে আছেন। ছবিতে দেখা যাচ্ছে হিন্দু, মুসলমান, শিখ সব সম্প্রদায়ের লোকই রয়েছে। অর্থাৎ সমাজের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দিকটি ধরা পড়ে। বীরভূম থেকে পাওয়া একটি চৌকো পটে বিবাহ অনুষ্ঠান চিত্রিত হয়েছে। এটি ১৮৯৮ সালে আঁকা। ছবিতে দেখা যাচ্ছে বিয়ের কন্যা অতি ছোট। তাকে পিঁড়িতে বসিয়ে পুরুষেরা বিয়ের বেদীতে নিয়ে যাচ্ছে। আর, গৃহবধূরা দাঁড়িয়ে তা দেখছে। অন্যদিকে বর বসে আছে। ব্রাহ্মণ তাকে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় আদবকায়দা শেখাচ্ছেন। ব্রাহ্মণের হাতে পুঁথি। বরের কাঁচুমাচু মুখ। ব্রাহ্মণের পেছনে বরযাত্রীর দল। বিয়ে হচ্ছে পাকা দালান বাড়িতে। ১০১ বছর আগে আঁকা এই পট থেকে আমরা বুঝতে পারি তখন বাল্যবিবাহ চালু ছিল। ছবিতে যে মেয়েটির মুখ দেখানো হয়েছে সেটি একেবারেই অল্পবয়সী। তবে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণের অত্যাচার যে বেশ ভালই ছিল তা বোঝা যায় বরবেচারীর কাঁচুমাচু মুখ দেখে। সম্ভবত সে ভীতও বটে। ১৮৯৯ সালে বীরভূম থেকে পাওয়া গেছে বিবাহ অনুষ্ঠানের ছবি আঁকা একটি চৌকা পট। দেখা যাচ্ছে বরকন্যা একসঙ্গে কাঠের পিঁড়িতে। মহিলাদের কোলে কলসী। তাঁরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সম্ভবত তাঁরা কোন মঙ্গ লাচারে ব্যস্ত। পেছনের দিকে দেখা যাচ্ছে হুঁকো হাতে এক বৃদ্ধ। তাঁর সঙ্গে নত নম্র হয়ে কথা বলছেন একজন। সম্ভবত হুঁকো হাতে বরকর্তা আর দাঁড়িয়ে কথা বলছেন কন্যা-কর্তা। এই ছবি থেকে বিবাহের মঙ্গলাচারের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। বিবাহের মঙ্গলাচারের সঙ্গে মহিলারা যে অধিকভাবে যুক্ত ছিলেন তা ছবিতে দেখানো হয়েছে। বিবাহের সময় কন্যা কর্তা সব সময় দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকেন। পান থেকে চুন খসলেই পাত্রপক্ষ তুলকালাম ঘটাতে পারে। এমনকি পণ্ড হতে পারে বিয়ে। তাই কন্যাকর্তা সর্বদা চেষ্টা করেন পাত্র-কর্তা তথা পাত্রপক্ষকে তোয়াজ করে খুশি রাখতে। আর 'ছেলে আমার রাজহংস' এই ভাব করে বিয়ের দিন বিবাহ তদারকি করেন পাত্র-কর্তা। ছবিতে এইসবই তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। বীরভূম থেকে পাওয়া একটি চৌকোপটে বিবাহের শোভাযাত্রা আঁকা হয়েছে। এটি ১৯০০ সালে আঁকা। দেখা যাচ্ছে বরকন্যা পালকিতে চেপে যাচ্ছে। শোভাযাত্রায় ঢুলি, বাঁশিওয়ালা, তল্পীবাহক, বাক্সবাহক যেমন আছেন সেরকম মহিলারাও আছেন। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকেরই ছাতা আছে। বাদ্যকারদের প্রত্যেকের কাঁধেও ছাতা। আর নেশা মানে হুঁকো—তাও চিত্রিত হয়েছে। গ্রাম বাংলায় এই চিত্র কিছুদিন আগে পর্যন্তও চোখে পড়ত। কিন্তু এখন আর এই দৃশ্য তেমন দেখা যায় না—বাদ্য-বাদ্যকারসহ বরকন্যা পাল্কিতে যাচ্ছে। গ্রাম বাংলায়ও আজকাল বরকন্যা গাড়িতে নতুবা ভ্যানরিক্সায় যায়। পালকি যারা বয়, সেই বেহারারা ক্রমশ লুপ্ত হয়েছে। তবে গাড়িতে চেপে বাদ্যযন্ত্রীরা কিংবা ভ্যান রিক্সার পিছনে বাজনাসহ বাদ্যযন্ত্রীরা—এ দৃশ্য যে একেবারে দুর্লভ তা অবশ্য নয়। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের অনেকটা দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হবে। পথে রোদ-বৃষ্টি, ঝড় ঝঞ্ঝার

সম্ভবনা। তাই কেউ ছাতা নিতে ভোলে না। এখনকার বাদ্যযন্ত্রীদের মত সেই বাদ্যযন্ত্রীরা সম্ভবত মদ গাঁজা খেত না। হুঁকোর প্রতি তাদের আসক্তি ছিল। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মহিলাদেরও দেখা যাচ্ছে। এই মহিলারা কন্যা বিদায়ে ভারাক্রান্ত। ছবিতে বোঝা যাচ্ছে না, এই মহিলারা শোভাযাত্রার সঙ্গে যাবেন নাকি, বরকন্যাকে বিদায় জানাতে খানিকটা এগিয়ে এসেছেন।

১৯০৬ সালে আঁকা একটি চৌকো পটে সেই সময়ের গার্হস্থ্য-দৃশ্য আঁকা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে বাবু শুয়ে আছেন খাটে। সুসজ্জিত এক পুরুষ বগলে বই হাতে হুঁকো নিয়ে বাবুকে দিতে এসেছেন। সম্ভবতঃ ইনি বাবুর পুত্র। বাবু খুব আরামে শায়িত — তা তাঁর চোখ-মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। পায়ের দিকে বাবুর স্ত্রী, তার কোলের শিশুটির পরিচর্যায় ব্যস্ত। পায়ের কাছে একটি কুকুর। বাইরের ঘরে দু'জন ফকির গান গাইতে এসেছে। তাকে ভিক্ষে দিচ্ছেন এক মহিলা। ফকির এবং দাতা দু'জনের চোখ মুখেই পরম তৃপ্তি। দু'জন ফকিরের বড় জন ভিক্ষে নিচ্ছে, আর ছোট জন গান করছে। ওর হাতে বেহালা জাতীয় একটি যন্ত্র। যে বাড়িটিতে এই দৃশ্যটি চিত্রিত হয়েছে সেটি বেশ সুন্দর! হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক যে খুব ভালো ছিল, তা ফকিরের ভিক্ষা-নেওয়া থেকে বোঝা যায়। ফকিরেরা সঙ্গীতানুরাগী, তাও বোঝানো হয়েছে। চিত্রিত বাড়িটি দেখে বোঝা যায়, এই গৃহস্থ অবস্থাপন্ন। এই গৃহস্থের পরিচর্যায় তাঁর পুত্র এবং স্ত্রী ব্যস্ত। যদিও গৃহকর্ত্রী কোলের শিশুকে নিয়ে ব্যস্ত, তবুও তিনি তাঁর স্বামীর পদতলেই ঠাঁই নিয়েছেন। বধূর ধারণা এতে তাঁর মঙ্গল। কুকুরটি দেখে বোঝা যাচ্ছে এরা গৃহপালিত জন্তুদের প্রতি দরদী। তাই তার ঠাঁই হয়েছে একেবারে ঘরের মধ্যেই।

আমাদের জীবনধারণের ক্ষেত্রে বৃক্ষের ভূমিকা অপরিসীম। বন জঙ্গলে জন্তুজানোয়ারের হাত থেকে বাঁচতে বৃক্ষ সাহায্য করে। ঘর বাড়ি তৈরি, খাদ্য সংগ্রহ প্রভৃতিতে বৃক্ষের ভূমিকা আছে। আদিম মানুষেরা এইসব বিশ্বাস থেকেই শুরু করল বৃক্ষ পূজা। ১৮৯৭ সালে একটি চৌকো পটে এই ধরণের বৃক্ষ পূজা চিত্রিত হয়েছে। ছবিতে বৃক্ষ পূজা করছেন ব্রাহ্মণ। হাতে তাঁর পুঁথি। উপবীত ধারণ করে তিনি ফুল পাতা নিবেদন করছেন বৃক্ষতলায়। অংশগ্রহণকারী সকলেই মহিলা। একটি পাত্রে তাঁরা ফুল এবং সম্ভবত আরো কিছু নিয়ে এসেছেন। চিত্রিত বৃক্ষটি মনে হচ্ছে খরাপ্রবণ এলাকার। বৃক্ষ পূজা যদিও লোকসমাজের সৃষ্ট তবুও এখানে দেখা যাচ্ছে পূজা করছেন ব্রাহ্মণ। কিন্তু সাধারণত আমরা দেখি লোকসমাজের পুজোতে ব্রাহ্মণরা অংশগ্রহণ করেন না। দেখা যাচ্ছে ব্রাহ্মণ উপবীত স্পর্শ করে বৃক্ষতলায় ফুল নিবেদন করছেন। ১৮৯৫ সালের চিত্রিত হয়েছে একটি লোকনৃত্যের দৃশ্য। এখানে দেখা যাচ্ছে মহিলারা নৃত্যরত। একটি শিশু কাঁসর বাজাচ্ছে। ঢোল বাজাচ্ছেন এক পুরুষ। তিনিও এদের তালে পা ফেলছেন। মহিলাদের চোখ মুখে নাটকীয়তার ছাপ। সেই সমাজও মহিলা-পুরুষ নৃত্যকে সাদরে গ্রহণ করেছে। ১৯১৩ সালের একটি চিত্রে তৎকালীন বাজার চিত্রিত হয়েছে। সে সময় মানুষের মূল্যবোধ খানিকটা বেশি ছিল। অসততার জন্য শাস্তি ছিল। যেসব মহাজনরা টাকার কারবার করতো তারা বাজারে বসেই তাদের ব্যবসা করতো। ছবিতে দেখা যাচ্ছে—জিনিসপত্র বেচা কেনা হচ্ছে। অসৎ কাজ করার জন্য গাছে বেঁধে রাখা হয়েছে

একজনকে। বাজারের মধ্যেই মহাজনরা তাঁদের 'কারবার' চালাচ্ছেন। 'গোচারণ' দৃশ্যটি ফুটে উঠেছে ১৯১০ সালে আঁকা বীরভূমের একটি পটে। মাঠে গরু চরাতে গিয়ে বিভিন্ন রকম লোকক্রীড়ারও আয়োজন হয়। গরুরাও এই সব খেলা থেকে বাদ যায় না। একসময় শ্রীচৈতন্যদেব সবাইকে মাতিয়েছিলেন তাঁর প্রেমের জোয়ারে। নদীয়ার নবদ্বীপের একটি চৌকোপটে এই দৃশ্যই চিত্রিত হয়েছে। বর্ণিত এই চৌকো পটগুলির সব কটিই গুরুসদয় সংগ্রহশালা'য় প্রদর্শিত। অঙ্কিত পটগুলিতে শিল্পীর নাম পাওয়া যায় না।

এবার আধুনিককালের কিছু পটের প্রসঙ্গে আসা যাক। সে পটগুলির থেকে আমরা সমাজকে চিনতে পারি। পটুয়ারা 'পণপ্রথা'র পট এঁকেছেন। দেখানো হয়েছে বিবাহ হলো। কিন্তু বিবাহের কিছুদিন বাদেই কথামতো পণ না দেওয়ার জন্য বধূটিকে মৃত্যুবরণ করতে হচ্ছে। এটি জড়ানো পট। তাই অনেকগুলি দৃশ্য চিত্রিত, বিবাহের সম্বন্ধ , বিবাহের দৃশ্য, শ্বশুর-শাশুড়ীর অত্যাচার, বধূর লাঞ্ছনা, অবশেষে সব সমস্যার অবসান ঘটিয়ে বধূর মৃত্যু। এই চিত্রগুলি থেকে আমরা সমাজকে সহজেই চিনতে পারি। দাবিমত পণ না মেটালে বেঁচে থাকা যায় না—এই দৃশ্য চিত্রিত করে পটুয়ারা সমাজকে খোঁচা দিয়েছেন। পটুয়ারা 'সাক্ষরতা অভিযান' এর ছবি এঁকেছেন। আমাদের দেশ নিরক্ষরতায় ছেয়ে যাচ্ছে। এ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সরকারি উদ্যোগে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান চালু হয়। বয়স্ক গ্রামবাসীরা সারাদিন পরিশ্রমের পর রাত্রে বই, শ্লেট-পেন্সিল নিয়ে শিক্ষক মহাশয়ের কাছে পড়তে আসেন। আশা, সবাই সাক্ষর হবে। পটচিত্রে এসবই চিত্রিত। পথে-ঘাটে নারীরা এখনও অসহায়। রক্ষক পুলিশই স্বয়ং কোন কোন সময় ভক্ষকের ভূমিকা নেয়। তারা অসহায় নারীকে আশ্রয় দেবার বদলে ধর্ষণ করতেও পিছপা নয়। সম্প্রতিকালে কলকাতার ফুলবাগান থানার এক কনস্টেবল এই ধরণের কাণ্ড ঘটিয়েছে, মেদিনীপুরের নয়াগ্রামের পটুয়া আনন্দ চিত্রকর তার পটচিত্রে এই 'নারী ধর্ষণ' কাহিনীটিকে রূপ দিয়েছেন। এই জড়ানো পটটি দেখে অবশ্যই আমরা 'পুলিশ-পাবলিক' সম্পর্কটি সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি করতে পারব। অসহায় নারীকে কু- প্রস্তাব দেওয়ায় এক ড্রাইভারকে সেই মহিলার দ্বারাই খুন হতে হয়েছিল। পরে সেই মহিলা পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। 'ড্রাইভার খুন' পটচিত্রে এটি দেখা যায়। এথেকে মহিলাটির বুদ্ধিমত্তা এবং বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। মেদিনীপুরের নিরঞ্জন চিত্রকরের 'মানুষের কথা' পটে মানুষের বিভিন্ন দিক চিত্রিত হয়েছে। ধূমহীন চুল্লী, গর্ভবতী মায়েদের ইঞ্জেকশন, নেশার ক্ষতি চাষের উপকারিতা — সব কথাই জানা যায়। প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় পটুয়ার আর আসক্তি নেই—তাই তাদের নতুন সমাজ গড়ার আহ্বান — 'নতুন সমাজ গড়ব মোরা দেখব জগৎটাকে'।

পটচিত্রে কৌতুকধর্মিতা

আমাদের শিল্পশাস্ত্রে নবরসের কথা বলা হয়েছে। শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত, শান্ত — এসবই কোনও না কোনভাবে মানবজীবনের অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত আছে। কৌতুক কিংবা হাস্যরস ছাড়া আমাদের জীবন নীরস, শুষ্ক। মানুষ কিংবা মানুষজনিত কোনও বিশেষ বিশেষ অবস্থাকে ঘিরেই কৌতুক, ব্যঙ্গ তথা বিদ্রূপাত্মক শিল্পের

উৎপত্তি। কমিক অথবা ব্যঙ্গাত্মক দিক হাস্যরসের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। প্রাক স্বাধীনতা যুগের বিভিন্ন নিন্দনীয় দিক নিয়ে চিত্রকর গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অসাধারণ সব ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছিলেন। গগনেন্দ্রনাথের পর দেশে কার্টুনিস্টদের সংখ্যা বেড়েছে। এঁদের বেশিরভাগই রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্রী। কিন্তু সামাজিক সমস্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সমস্যাগুলি চিত্রায়িত করার জন্য সামাজিক ব্যঙ্গচিত্রীর প্রয়োজন ছিল। এই কাজটি করেছিলেন আমাদের দেশের চিত্রকর শিল্পী পটুয়ারা। তাঁরা সমাজের নানারকম অসঙ্গতিমূলক আচরণ তুলে ধরেছিলেন। যদিও অন্যান্য শিল্পীদের তুলনায় তাঁদের প্রথাগত শিক্ষা কম ছিল, তবুও তাঁদের অঙ্কিত ব্যঙ্গচিত্র এক অন্য মাত্রা পেয়েছিল।

নব্যবঙ্গের বাবুবিবিরা উনিশ শতকের পটুয়ার তুলিতে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে ক্ষত-বিক্ষত। এই ব্যঙ্গের উপাদান তাদের কুড়িয়ে বেড়াতে হয়নি। বিভিন্ন লোকসাহিত্য থেকে শিল্পীরা প্রয়োজনীয় ধ্যান-ধারণা খুঁজে পেয়েছেন। 'ঘোরকলি' বুঝাতে তাঁরা আধুনিকা স্ত্রী-কে স্বামীর কাঁধে চাপিয়েছেন, আর মায়ের নাকে গৃহপালিত জন্তুর মতো দড়ি পরিয়েছেন। 'বাহিরে কোঁচার পত্তন, ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন' বুঝাতে তাঁরা নববাবুকে নিয়ে রসিকতার চূড়ান্ত রূপ দেখিয়েছেন। কালীঘাটের তিলক-কাটা মৎস্যাশী বিড়ালতো এক অপূর্ব ব্যঙ্গ-চিত্র। ভন্ড তপস্বীর এমন প্রতীক আর কোথাও পাওয়া মুশকিল। শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই লৌকিক ধারাকে ক্রমে নাগরিকতায় পুষ্ট করেছিলেন।

পটুয়াদের আঁকা ছবিগুলিতে দেখা যায় এঁরা সমাজকে কীভাবে ব্যঙ্গ করেছিলেন। একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে একজন পুরুষ এক মহিলাকে খুশি করতে তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। একটি ছবিতে বিবির পায়ে বাবুর হাত। কোনও ছবিতে দেখানো হয়েছে সুসজ্জিত পুরুষ ঢেঁকিশালে তার স্ত্রীকে চাল পরিষ্কারে সাহায্য করছে, কিংবা কোনও এক মহিলা এক পুরুষের পরিধেয় কাপড়টি ধরে টানছে, প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের ছবি। কালীঘাট পটগুলিতেই ব্যঙ্গচিত্র কিংবা কৌতুকধর্মিতার প্রাধান্য দেখা যায়। কালীঘাট তীর্থস্থান হওয়ায় এখানে বহু মানুষের আনাগোনা হয় — স্থানীয় মানুষের মানসিক উন্নতি বা পরিবর্তন দ্রুত হয়। এক বারবণিতা বৈষ্ণবকে আলিঙ্গনরত। এখানেও সমাজকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। ব্যঙ্গচিত্রের বিষয় হয়েছে বাবু, সুরা ও সাকী। মেদিনীপুরের বিখ্যাত একটি 'সাহেব পটে'র গানে আছে ঃ

'বারজন সাহেব সাতজন মেমকে নিয়ে বিচার
কবতেছেন কি কি বিচার? — কাকে মারবে
কাকে তোপে উড়াবে, কাকে নজরবন্দী রাখবে
মুহুরিরা সব কাগজ জোগাচ্ছেন
উপরে চিক ফেলে বিবিরা সব তামাশা দেখছেন।'

ব্যঙ্গের ছলে পরাধীন ভারতবর্ষের কথা বলা হল। অতিমাত্রায় শরীরসর্বস্ব, কামুক ও একই সঙ্গে পত্নীপরায়ণ সাহেব এবং তাদের বিবিদের কথা ছবি ও গানের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে।

বিদেশী ব্যঙ্গচিত্রগুলির সঙ্গে পটুয়াদের আঁকা ছবির কৌতুকধর্মিতার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কালীঘাটের পটুয়ারা এঁকেছেন — এক বাবুর মাথায় একটি পাখি। বিদেশে মেয়েদের

ম্যাগাজিনের একটি পাতায় আঁকা হয়েছে—এক মধ্যবয়সী মহিলা এবং কথা কওয়া পাখির বাজার। সেখানে কাকাতুয়া, ময়না, টিয়ে পাখি ইত্যাদি দাঁড়ের ওপর পায়ে শেকল বাঁধা অবস্থায় রাখা আছে। একটি কাকাতুয়া মহিলার কানের কাছে ঝুঁকে বলছে, "Buy me. I know lots of dirty stories."

প্রকৃতপক্ষে এসব পটগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল নিরক্ষর জনসাধারণকে চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষিত করে তোলা। এতে বিবৃত হতো সামাজিক অসংলগ্নতা। সবচেয়ে বড় দিক হলে, সামাজিক অসঙ্গতিগুলিকে ব্যঙ্গ করে শুধরে তোলা। তা না হলে যুবকের বোকামি, দেশীয় লোকের বিবি বউ, নারী ও সুরা, সতীনের ঝগড়া, বৈষ্ণব ও বেশ্যা, তারকেশ্বরে মোহন্ত কেলেঙ্কারির ছবি তাঁরা কেন আঁকলেন?

গণমাধ্যমরূপে পটশিল্পের ভূমিকা

ভারতবর্ষের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ গ্রামে থাকেন। সেই গ্রামগুলিকে যথাযথ বিশ্লেষণ না করে আধুনিক সভ্যতার প্রয়োগ করার জন্য তা ব্যর্থ হচ্ছে। জনসংযোগের জন্য আধুনিক সভ্যতায় সংবাদপত্র, বেতার, দূরদর্শন ইত্যাদি ব্যবহৃত হচ্ছে। অথচ নিরক্ষরতায় ভরা এই দেশে একমুখীন মাধ্যমগুলি জনমনে খুব বেশি প্রভাব ফেলতে পারছে না। এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে সংযোগ কিংবা গণমাধ্যমরূপে লৌকিক উপাদান তথা পট শিল্পের কী ভূমিকা রয়েছে।

সংযোগ-প্রক্রিয়া সাধিত হয় মূল তিনটি বিষয়কে অবলম্বন করে — মেসেজ বা বক্তব্য, রিসিভার বা গ্রহণকারী এবং ফিডব্যাক বা প্রত্যাগত সাড়া পেলেই সংযোগের সাফল্য নির্ণীত হয়। যোগাযোগ এবং মাধ্যম দু'টি শব্দ একে অপরের পরিপূরক। যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে মাধ্যম বা বাহনকে অবলম্বন করেই। শূন্যের ওপর ভর করে যোগাযোগ কার্যকরী হয় না। প্রচারকারী আর গ্রহণকারীর মধ্যেকার দূরত্ব কমলেই নৈকট্য স্থাপিত হয়। এই নৈকট্যের আর এক নাম — যোগাযোগ। পাঁচটি উপাদানের উপর যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্ভরশীল। সেগুলি হল ঃ (ক) বার্তা প্রেরণকারী (Communicator বা sender), (খ) বার্তা গ্রহণকারী (Communicant বা receiver), (গ) যোগাযোগের তথ্য এবং ভাবগত বিষয় (Content), (ঘ) মাধ্যম বা বাহন (media বা vehicle), (ঙ) যোগাযোগের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া (effect of communication)। এই উপাদানগুলি সহযোগে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ দু'ধরনের যোগাযোগ হতে পারে। আধুনিক সভ্যতায় বৈদ্যুতিন মাধ্যমের অগ্রগতি হয়েছে। এর পাশাপাশি রয়েছে যুগপরম্পরাগত লোকমাধ্যমগুলি। গ্রামের নিরক্ষর মানুষ সাহিত্য, শিক্ষা, ধর্ম ও আনন্দ উপভোগ করত এই লোকমাধ্যমগুলির মাধ্যমেই। সাধারণত যে মাধ্যমের দ্বারা গ্রামের নিরক্ষর মানুষ বেশি আকৃষ্ট হয় তাকেই আমরা লোকমাধ্যম বলি। গ্রামীণ অনুভূতি কিংবা আবেগ লোকমাধ্যমের দ্বারা নিরক্ষর লোকসমাজের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। লোকসঙ্গীত, লোকনাট্য প্রভৃতি লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলি সংযোগ-মাধ্যম হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংবাদপত্র, মুদ্রাযন্ত্র, দূরদর্শন, বেতার, ভিডিও প্রভৃতি মাধ্যমগুলি সমাজের উপরের স্তরের মানুষের জন্য। সাধারণ লোকসমাজ এগুলিতে কোনও আগ্রহ বোধ করে

না। এই প্রসঙ্গে বিকল্প মাধ্যম হিসেবে লোকমাধ্যমের কথা অবশ্যই ভাবা যেতে পারে।

এখানে আমরা আলোচনা করব লোকসংস্কৃতির অন্যান্য উপাদানের মতো পট শিল্প কিভাবে লোকমাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কিভাবে আরও জনপ্রিয় মাধ্যম হিসাবে পট এবং পট-নির্মাতা পটুয়াদের কাজে লাগানো যায়, সেই সম্পর্কে। পটের প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করে আমরা দেখেছি ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় হাজার হাজার বছর ধরে জনগণের শিক্ষা, চিত্তবিনোদন ও বিভিন্ন ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো জড়ানো কিম্বা চৌকোপট। সেই সময় শিক্ষা বিস্তারের এটাই ছিল audio-visual, mass media.

"অনেকেই হয়তো শুনে আশ্চর্য হবেন যে দু'চারশো বছর নয়, আড়াই হাজার বছর আগে থেকে ভারতবর্ষের নানা জায়গায় জড়ানো ও চৌকো পট জনসাধারণের শিক্ষা, চিত্তবিনোদন ও বিভিন্ন ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো, সেটা ক্রমশঃ আমরা জানতে পেরেছি।"[১] অধিকাংশ পটের শেষে লোকশিক্ষা প্রচারের জন্যই যমপুরীর এক বিভীষিকাময় চিত্রের উপস্থাপনা করা হয়। অপরাধপ্রবণ মানুষের মন এই চিত্র দেখে আঁতকে ওঠে। পাপ কাজ থেকে তারা বিরত হয়। ভয় থেকেই দেবতার উপর ভক্তি জন্মায়।

'কেও ধরে চুলের মুঠি কেও ধরে গায়।
পাপী লোক হলে লোহার ডাঙ্গে বেড়ে সে তার মস্তক ফাটায়।'

শুধু গান নয় এর সঙ্গে থাকে বর্ণিতব্য দৃশ্যটিও। যমপুরীর সদস্যরা পাপী লোকের চুলের মুঠি ধরে টানা-হ্যাঁচড়া করছে, কেউবা 'লোহার ডাঙ্গে' মাথাও ফাটাচ্ছে। সঙ্গে চিত্রকরের কল্পিত আরও অনেক রকম দৃশ্য। কখনও বা গরম তেলের কড়ায় পাপীকে চোবানো হচ্ছে। এই দৃশ্য দেখার পর অপরাধপ্রবণ মানুষ আঁতকে ওঠেন। অবচেতন মনে চোখটা বন্ধ হয়। মনে মনে বিড়বিড় করে বলেন 'আর নয়'। এখানেই পটুয়ার সাফল্য। এই কথাটি কিন্তু কোন ইলেকট্রনিক কিংবা অন্য কোন জনপ্রিয় মাধ্যমে বক্তৃতা দিলে ততটা কার্যকরী হতো না। তাই লোকশিক্ষার উদ্দেশ্য প্রতিটি পালার শেষেই পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্ব, পুণ্যের জয়, অধর্মের পরাজয় এবং পাপীর নরকবাস ও যম যন্ত্রণা ইত্যাদির প্রসঙ্গ থাকে।

রাজা হচ্ছেন রাজ্যের প্রধান আর গিন্নী হচ্ছেন সংসারের কান্ডারী। এই দু'জনের উপর রাজ্য এবং সংসার বড় বেশি নির্ভরশীল। এদের ভাল মন্দের প্রভাব অন্যের উপর খুব করে পড়ে। রাজা পাপ করলে নষ্ট হয় রাজ্য আর কষ্ট পায় প্রজা আর ঘরের গিন্নী পাপ করলে নষ্ট হয় সংসার, ঘরের লক্ষ্মী যায় উড়ে। পটের গানগুলির শুরুতে লৌকিক ছড়ার সুরে সেই উপদেশই থাকে।

'রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট প্রজা কষ্ট পায়
গিন্নীর পাপে গেরস্ত নষ্ট ঘরের লক্ষ্মী উড়ে যায়।'

কেবলমাত্র লোকশিক্ষার জন্যই এইসব অপ্রাসঙ্গিক ছত্রের অবতারণা করা হয়।
'সিন্ধুবধ' পালায় পটুয়া গাইতে শুরু করেন —

'গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা সুরাপান যে জন করে
চারপাশে পাপী তারা

তাদের পাপের পরিত্রাণ নেই।'

এই কথা শোনার পর খুব কম মানুষ আছেন যিনি গো হত্যা, ব্রহ্ম হত্যার মতো সাংঘাতিক কাজগুলি করতে পারবেন। অবশ্য সুরাপান করলেও যে পাপ হয় সে কথাও এখানে বলা হয়েছে। এই সব কাজ করলে যে পাপ হয়, সেই পাপ থেকে মুক্তিরও কোনও উপায় নেই। অতএব, এসব কাজ থেকে বিরত থাকাই ভাল। স্বামীভাগ্য সকলের ভাল হয় না। অথচ কপাল-দোষে যদি স্বামী খারাপ হয় তবে জীবনটাই নষ্ট। তাই সকল মেয়েরই লক্ষ্য একটি, ভালো স্বামীলাভ। আর এই ভালো স্বামী পাওয়ার উপায়টা পটুয়ারা বলে দিয়েছেন—

'দেখো সতী নারীর পতি যেমন আসমানের চূড়া
অসৎ নারীর পতি যেমন ভাঙা নায়ের গোড়া।'

অর্থাৎ সতী নারীর স্বামী ভালো এবং অসৎ নারীর স্বামী খারাপ হবে। স্বাভাবিক কারণেই মহিলারা সৎ থাকার চেষ্টা করবেন।

আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগের এলোকেশীর মামলা একটি নিন্দিত ঘটনা। মোহন্তের এই ঘৃণ্য কাজের কথা প্রথমে ছড়া ও গান রচনা করে প্রকাশ করেছিলেন ভাটেরা। ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম (বর্তমান বাংলাদেশ), ত্রিপুরা ও কাছাড়ে পল্লীকবিদের 'ভাট' বলা হতো। এলোকেশীদের মামলার ব্যাপারে সেদিন ভাটদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন কালীঘাটের পটুয়ারা, মোহন্তের জঘন্য-কদর্য ঘটনা নিয়ে পটুয়ারা পট এঁকে প্রচারে নেমেছিলেন। কারাগারে গিয়ে মোহন্তকে ঘানি টানতে হয়েছিল। সেদিন গাওয়া হয়েছিল —

'মোহন্তের তেল নিবি যদি আয়।
এ তেল এক ফোঁটা দিলে,
টাক ধরে না চুলে,
কানায় চোখে দেখতে পায়।'

কৃষিভিত্তিক সমাজে গরুর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দু সমাজে গরু দেবতা হিসেবে তাই পূজিত। গরু সম্পদ। গরুর যত্ন নেওয়া তাই জরুরী। পটুয়ারা এই কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তাঁদের সৃষ্ট সঙ্গীতের মাধ্যমে—

'পান খায় পিকি ফেলে গোহালের ভিতর
রাত্র প্রভাত হলে পরে দেয়না ঘর ঝাঁটি
সন্ধ্যে লাগিলে পরে দেয় না বাতি।'

গোয়ালের ভিতর পান খেয়ে পিক ফেলতে নেই। সঙ্গে একথাও বলা হয়েছে সকাল বেলায় উঠে ঘর ঝাঁট দিতে হয় এবং সন্ধ্যার সময় ঘরে প্রদীপ জ্বালানো উচিত। গোয়ালে বসে মাছ ভাত খেলে গরুর নাকে রক্তপিনাসী নামে একটি রোগ ছাড়াও গরুর গায়ে উকুন হয়।

'বাড়া ভাত মৎস্য রাধা গোয়ালে বসে খায়
রক্তপিনাসী মাতাল গরুর নাকে হয়।'

কিংবা

'রবিবার দিনে যে জন মৎস্য ভেজে খায়
উঁকুন এঁটোলী গরুর গায়ে হয়
শনিবারে মঙ্গলবারের দিন গোবর বিলায়
দিনে দিনে গেরস্থালী মেটিয়ে যায়।'

পটুয়ারা ভিক্ষাজীবী হলেও যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে তাঁরা সামাজিক দায়দায়িত্ব পালন করে এসেছেন। কলিযুগ পটে তাঁরা দেখিয়েছেন মদ্যপান এবং লাম্পট্যের পরিণতি — স্বাধীনতা পটে আঁকা হয়েছে বৃটিশের অত্যাচার, শহীদের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ এবং সর্বশেষে স্বাধীনতা লাভ। অতি আধুনিককালে সাম্প্রতিক ঘটনাবলী তাঁদের তুলিতে এবং গলায় এসেছে। এক্ষেত্রেও তাঁরা দায়িত্ববান, কর্তব্যপরায়ণ নাগরিক। তাঁরা গেয়েছেন পণপ্রথা, বৃক্ষরোপণ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রভৃতি বিষয়ে। 'বৃক্ষরোপণ' পটে সবাইকে গাছ লাগানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। গাছ লাগানোর উপকারিতার কথাও বলা হয়েছে —

'ও জনগণ সবাই মিলে কর গাছ রোপন
ওগো গাছ লাগাইলে পরে মানুষের উপকার করে
বাতাসে নিঃশ্বাস ধরে গাছেরই ধরন।'

নিরক্ষরতা আমাদের দেশে এক অভিশাপ। ভারতবর্ষের ৬৭ শতাংশ মানুষ নিরক্ষর। নিরক্ষরতা দূরীকরণে সরকারি প্রচেষ্টা হয়েছে। বিভিন্ন পোস্টার, হোর্ডিং, রেডিও, টিভি, সংবাদপত্র প্রভৃতি মাধ্যমগুলিতে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে প্রচার চালানো হয়েছে। সকলকে সাক্ষরতা অভিযানে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। এই প্রচার অভিযান থেকে দূরে সরে থাকে নি আমাদের পটুয়ারাও। কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় কিংবা সরকারি নির্দেশে এই দায়িত্ব তারা পালন করেছে! তাদের আহ্বান —

'শুন শুন ওগো বাবু শুন দিয়া মন
নিরক্ষরকে সাক্ষরতা বাবু করগো এখন
দলমত নির্বিশেষে এসো গো সবাই
আজকে আমরা শপথ নেবো কাজে লেগে যাই।'

সাক্ষরতা অভিযান কোনও কোনও ক্ষেত্রে সার্থকতা লাভ করতে পারেনি দলীয় সংকীর্ণতার কারণে। দলীয় সংকীর্ণতার বিষয়টি পটুয়ার চোখ এড়িয়ে যায়নি। তাই তারা 'দলমত নির্বিশেষে' কথাটি ব্যবহার করেছেন।

পটে অঙ্কিত ছবিগুলির ভাব খুবই সরল। পটের সঙ্গে যে গানটি গাওয়া হয় তার ভাষা এবং সুর সাধারণ মানুষকে সহজেই আকর্ষণ করে। এই কারণে পটুয়ারা খুব সহজেই লোকশিক্ষা এবং লোকমাধ্যমের কাজটা করতে পারেন। পটসঙ্গীত রচয়িতা সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনও নিয়ম না মানলেও পরিবেশকের দক্ষতায় দর্শক-শ্রোতারা আপ্লুত হন, কমিউনিকেশনের মূল-মন্ত্র ফিডব্যাক বা প্রত্যাগত সাড়া পেতে অসুবিধা হয় না।

প্রাচীন বাংলার পটের ছিল অসাধারণ অডিওভিসুয়াল এফেক্ট। "পটই আধুনিকতম 'অডিওভিসুয়াল' মাধ্যম চলচ্চিত্রের উদ্ভবে ভাবনাগত উপকরণের যোগান দিয়েছে। অর্থাৎ জড়ানো পটই চলচ্চিত্র শিল্পের আদিরূপ।"[২] অবশ্য অডিওভিসুয়াল মাধ্যম হিসেবে পটের

কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। প্রথমত পটের আকার ছোট হওয়ায় একসঙ্গে অনেক লোক বসে দেখতে পারেন না। দ্বিতীয়ত বৈচিত্র্যহীন পটের গানের সুর শ্রোতাকে অনেক সময় অমনোযোগী করে। তৃতীয়ত পটের ছবি দ্বিমাত্রিক এবং স্থির হওয়ার কারণে দর্শকের মনে ক্রিয়াত্মকতার মাত্রা তেমন থাকে না। অথচ দৃশ্যধর্মিতার প্রধান শর্তই হল ক্রিয়াত্মকতা। কোন কোন লোকসংস্কৃতি গবেষকের মনে হয়েছে আজকের গতিশীল জীবনে পট ও পটুয়ার গান অচল। মৃতপ্রায় লোকসংস্কৃতির অঙ্গ এরা। "একটা সময় ছিল যখন মানুষের জীবন-যাপনের ফাঁকে সময়ের প্রাচুর্য্য ছিল। সেই সঙ্গে অভাব ছিল সংযোগ ব্যবস্থার। প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ নিজের মতন সংযোগব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল এবং বিভিন্ন লোকমাধ্যম সেই সংযোগব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে উৎপাদন ব্যবস্থারও পরিবর্তন হতে থাকল এবং বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে সংযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। সকল রকম আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা মানুষের জীবনের গতিপথ পরিবর্তন করে দিল।"[৩]

আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা মানুষের জীবনের গতিপথে পরিবর্তন ঘটিয়েছে ঠিকই, যার ফলস্বরূপ মানুষ আজ শহরমুখী। কিন্তু 'বিনোদন কিংবা সংযোগ মাধ্যম হিসেবে পটের যুগ শেষ হয়েছে' — একথা সর্বতোভাবে মেনে নেওয়া যায় না। হয়তো যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পদ্ধতি-প্রকরণের পরিবর্তন ঘটবে কিন্তু পট এবং পটুয়া উভয়েই থাকবে।

যামিনী রায়ের ছবিতে পটচিত্রের প্রভাব

পট শিল্পের প্রভাব আধুনিক চিত্রশিল্পীদের উপর পড়েছে একথা বলা যায়। ফরাসী চিত্রকর পাবলো পিকাসোর ছবিতেও পটের প্রভাব কেউ কেউ লক্ষ্য করেছেন। বাঙালী চিত্রকর যামিনী রায়ের তুলিতেও কি পটুয়ার টান আছে?

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলায় চাষীপ্রধান পল্লীগ্রামে কৃষির উপর নির্ভরশীল এক মধ্যবিত্ত পরিবারে যামিনী রায়ের জন্ম। ছবি আঁকা শেখেন কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলে। অবনীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে যে 'ভারত-শিল্প আন্দোলন' গড়ে উঠেছিল যামিনী রায় তাতে আকৃষ্ট না হয়ে পাশ্চাত্য ধরনেই তেলরঙা ও জলরঙা ছবি আঁকতেন। 'সোসাইটি অব ফাইন আর্টস' নামে সেই সময়ের 'আধুনিক' শিল্পীগোষ্ঠীর পত্তনে তিনি অতুল বসু, যামিনী গাঙ্গুলী প্রভৃতিকে সহযোগিতা করেন।

ইউরোপীয় চিত্রশিল্পশৈলীতে আঁকতে-আঁকতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন। পাশ্চাত্য রীতির গতানুগতিকতায় তিনি হাঁফিয়ে ওঠেন। এই সময় যামিনী রায়ের মানস চোখে বেলিয়াতোড়ের পটচিত্রের কথা ভেসে ওঠে। বেলিয়াতোড়ের পটুয়াদের ঘরে তিনি পৌঁছে যান। এর বাইরেও তিনি যান মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম, কলকাতার কালীঘাট প্রভৃতি জায়গায়। এইসব জায়গা থেকে তিনি সংগ্রহ করেন প্রচুর পট। এবার তাঁর শিল্পজীবন অন্যদিকে মোড় নেয়। শুরু করেন পটচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ। সারাজীবন ধরে পটুয়াদের পটচিত্র অনুসরণ অনুশীলন করলেও অনুকরণ করেননি কোনদিন। আর এখানেই কৃতিত্ব, স্বাতন্ত্র যামিনী রায়ের। এক

নতুন আঙ্গিকের প্রয়োগে পটচিত্রে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন সহজিয়া তথা লোকায়তধর্মী শিল্পী-চেতনা, এই চেতনার দ্যুতিতে তিনি হতে পেরেছিলেন এদেশের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী।[৪] পটচিত্রের মাধ্যমেই যামিনী যায়ের বিশ্বে এত নাম। এই বিশ্বখ্যাত পটচিত্রকরকে কি আমরা 'পোটো' আখ্যায় আখ্যায়িত করতে পারি? তিনি 'পোটো' ছিলেন কি ছিলেন না সেটা আলোচনার বিষয়, তবে আমরা জানতে পারি, যামিনী রায় পটুয়াদেরকে নিয়ে গর্ববোধ করতেন। এই প্রসঙ্গে যামিনী রায়ের নিজের উদ্ধৃতির আশ্রয় নিচ্ছি। ''যে ছবি আসল পটুয়া ছবি, ইংরেজ আগমনের বহু পূর্বে কলকাতা শহর গড়ে উঠবার অনেক আগে, বাংলায় তার প্রচলন ছিল। বরং বিদেশীদের আগমনের অনেক আগেই তার দেহে প্রকৃত প্রাণ ছিল। যে আদিম শিল্পীদল বহুদিনের প্রচেষ্টায় এই ছবির মূল গড়ন ও বক্তব্য খুঁজে পেয়েছিল তাদের কথা ভাবলে বিস্ময় লাগে। কারণ ছবির জগতে যে কথাটা ধ্রুব সত্য, এরা তার সন্ধান পেয়েছিল। তারপর অবশ্য, দিন যত গেল, পটের ছবি বাংলা দেশে চলিত রইল পটুয়া মহলের নিছক অভ্যাস হিসেবে, এবং শিল্পীরা হয়ে রইল অজ্ঞানেরও অধম। বাংলাদেশে লোকশিল্পের প্রথম যে বোধ এসেছিল সে বোধ আজকের পটুয়ারা ভুলে গিয়েছে। কিন্তু, যে শিল্পী সম্প্রদায় এ-বোধ প্রথম পেয়েছিল তারা এত পাকা ভিত্তির উপর একে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিল যে বাংলাদেশ আজও অন্তত অভ্যাস হিসেবে, তার জের টেনে চলেছে, তাকে সম্পূর্ণ ভুলতে পারেনি। পটুয়া শিল্পের মূল তথ্যকে তাই শুধু বাংলাদেশের ছবির ইতিহাসে একটি বিশেষ অধ্যায় বললে কমই বলা হবে। ''[৫]

যামিনী রায় চিত্রকলার আদিতম ও শুদ্ধতর রূপের দিকে ঝুঁকেছেন ক্রমশ। পটুয়াদের ছবি থেকে শিক্ষা নিয়েছেন। চিত্রের গড়ন ক্রমে তাঁর কাছে পরিত্যক্ত হয়েছে। তাঁর শৈলীর চরিত্র হয়ে উঠল দ্বিমাত্রিকতায় পরিপূর্ণতা দান। পটচিত্রের মতো বিস্তৃত চক্ষুবিশিষ্ট চিত্র অঙ্কিত করে তিনি যেন সমস্ত দেহকে বাদ দিয়ে কেবল চক্ষুর উপর মনোনিবেশ করে ছিলেন বলে মনে হয়। বিষয়বস্তুতে পরিবর্তন এলো। গ্রাম্যজীবন আর গ্রামের মানুষের প্রিয় ধর্মকাহিনী ছাড়াও সাঁওতালদের নাচ-গান, মাদল-বাদন, সাঁওতালি রমণীর প্রসাধন, সাঁওতাল মা ও শিশু সবই যামিনী রায়ের তুলিতে স্থান পেল। এর বাইরেও রামায়ণের কাহিনী, চৈতন্য জীবন, যীশুর জীবনকথা, কৃষ্ণ-রাধা-বলরামদের লীলা, লাঙল হাতে চাষী, কীর্তন গায়ক, বারব্রত ও পূজা-রত গ্রাম্য-মেয়ে প্রভৃতি বিষয়ে ছবি এঁকেছেন। পুরোপুরি দেশজ উপাদান দিয়ে তৈরি রঙে, মোটা মোটা বলিষ্ঠ, সামান্য কয়েকটি রেখায় অপূর্ব ধাঁচে বিচিত্র সব ছবি। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে বৃটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিটে তাঁর আঁকা ছবির প্রথম একক প্রদর্শনী হয়। এর মধ্যেই শিল্প-সমালোচক সুরাওয়ার্দি', অর্ধেন্দু গাঙ্গুলী ও স্টেলা ক্রামরিশ প্রভৃতির লেখায় ও আলোচনায় প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল যে, যামিনী যায় বাংলার পটশিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন। নির্মল কুমার ঘোষ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, ''ওড়িশার পটচিত্র, প্রাচীন গুজরাটি চিত্র, কালীঘাটের পট, বাঁকুড়ার পটচিত্র --- এদের সঙ্গে যেন কোথায় যামিনী রায়ের আঁকা ছবির আত্মিক মিল রয়েছে।''[৬] এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে শিল্প-বিশেষজ্ঞ ডঃ অশোক ভট্টাচার্যের মূল্যবান মন্তব্য। তিনি বলেছেন, ''তিনি (যামিনী রায়) একজন জাত পটুয়ার মতোই গুণগত উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে ছবির সংখ্যাগত আধিক্যের

ওপরও জোর দিয়েছেন। তিনি চেয়েছেন তাঁর ছবি যাতে সহজলভ্য হয়—কেবল ধনীর প্রাসাদে নয়, মধ্যবিত্তর ঘরেও ছড়িয়ে পড়ে। ....প্রথম পর্বে তাঁর ছবি যতখানি গ্রাম বাংলার পটুয়াদের কাজের সমগোত্রীয়, দ্বিতীয় পর্বে তা ততখানিই কালীঘাটের পটের কাছাকাছি।''[৭] দ্বিতীয় পর্বে যামিনী রায়ের রং ও রেখা গড়নধর্মী হয়ে উঠেছে। পটচিত্রের আদর্শে চিত্রপটে পরিপ্রেক্ষিত বা অবকাশ সৃষ্টি না করে কাহিনীর কুশীলবদের ওপর নিচে বিন্যস্ত করে ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে।

যামিনী রায়ের ছবিতে কতটা লোকচিত্রকলার প্রভাব আছে সেই বিষয়ে অহিভূষণ মালিকের প্রসঙ্গ স্মরণ করা যেতে পারে। "Jamini Roy took many things from the patchitras to recast them with well measured and well polished lines which are not folkish. .....Jamini Roy proceed with the folk form and developed it into an art which is hardly folkish."[৮]

দুর্গা পট ঃ পট পূজা

কালীঘাটের মন্দিরকে ঘিরে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে কালীঘাট পটুয়া সমাজ গড়ে উঠেছিল। এঁরা সামাজিক বিভিন্ন ছবি ছাড়াও ঠাকুর দেবতার কিছু ছবিও আঁকতেন। শারদীয়া পুজোর আগে এঁরা সব থেকে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। আসলে সেকালে মাটির তৈরি মূর্তির আগে, ঘটে-পটে দুর্গা পুজোর প্রচলন ছিল বেশি। পটে দেবী দুর্গা সপরিবারে বাহনসহ চিত্রিত হতেন।

বর্তমানে কোজাগরী লক্ষ্মী পুজোয় পটের ব্যবহার থাকলেও দুর্গা পটের ব্যবহার নেই একথা বলা যেতে পারে। 'একমাত্র বীরভূম জেলার নানুর থানার হাটসেরান্দি গ্রামে গত দু'শ বছর ধরে বংশপরম্পরায় পটে আঁকা দুর্গা পুজো হয়ে আসছে।'[৯] হাটসেরান্দি চৌদ্দ পাড়ার দুর্গোৎসবের একসময় খুব রমরমা ছিল। কিংবদন্তী এই গ্রামের চট্টোপাধ্যায় পরিবারের অষ্টম পুরুষ গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় পট পুজোর প্রচলন করেন। একবার অর্থাভাবে গঙ্গাধর দুর্গার মূর্তি তৈরি করতে পারলেন না। তিনি শোকে আকুল হলেন। এমন সময় এক অচেনা কিশোরী তাঁকে পরামর্শ দিলেন — অল্প খরচে ঘটে-পটে পুজো করতে। গঙ্গাধরের মনে হলো এটাই দেবীর আদেশ। ঠাকুর দালানে পটে আঁকা পুজো শুরু হলো। সেই থেকেই চাটুজ্যে পরিবার ছাড়াও গ্রামের আরও চৌদ্দটি পরিবার চিত্রিত-পটে দুর্গা পুজো করছে।

চট্টোপাধ্যায় পরিবারের পট দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে পাঁচ ফুট। আকার প্রকারে, রূপ জৌলুসে, ঐশ্বর্যে দুর্গাপট বেশ আড়ম্বরপূর্ণ। সারা বছরই দুর্গা দালানে এই পট রাখা থাকে। এই পট তৈরিতে অন্যান্য পটের তুলনায় অতিরিক্ত প্রয়োজন হয় বাঁখারির কাঠামো। চালচিত্র সমেত প্রতিমার আয়তন অনুযায়ী বাঁখারির কাঠামো তৈরি করা হয়। তার ওপর মিহি কাদার প্রলেপ মাখানো একখন্ড শুকনো কাপড় টানটান করে লাগানো হয়। তুলির টানে পটের প্রতিমা আঁকা শেষ হয়। এক বছর রাখা হয় এই দুর্গা পট। বিজয়ার অপরাহ্নে পট-বিসর্জিত হয়।

অর্ধ শতাব্দী আগেও হাটসেরান্দি গ্রামে দুর্গা পুজোর যে-জাঁক ছিল এখন আর তা অবশিষ্ট নেই। ধীরে ধীরে উৎসাহ উদ্দীপনা আরও কমছে।

বাংলার হিন্দু পালাপার্বণ ও দেবদেবী পূজার রীতিতে দেখা যায় না একসঙ্গে একই কাঠামোয় লক্ষ্মী-সরস্বতী পুজোর দৃষ্টান্ত। লোকসংস্কৃতি গবেষক ডঃ সুধীর চক্রবর্তী একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন।[১০] তিনি জানিয়েছেন মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জে জৈন পরিবারে আশি থেকে নব্বুই বছরেরও বেশি সময় ধরে শ্রীপঞ্চমীতে লক্ষ্মী-সরস্বতী মূর্তি যৌথভাবে পূজিত হয়। পূজার উদ্যোক্তা একজন জৈন ভদ্রলোক, যদিও পূজাবিধি হিন্দুমতে এবং হিন্দু পুরোহিতের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। এটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার, কারণ জৈনরা ধর্মবিশ্বাসে অনিশ্বরবাদী। মূর্তি পূজায় তাঁদের আগ্রহ নেই। এমন কি তাঁরা ঈশ্বরও বিশ্বাস করেন না। ডঃ চক্রবর্তী জিয়াগঞ্জের জৈন পরিবারে পূজিত বিগ্রহ-যুগলের বৈশিষ্ট্য হিসেবে বলেছেন, ডাকের সাজের দৃষ্টিনন্দন চালচিত্রের একদিকে লক্ষ্মী আর একদিকে দাঁড়ানো সরস্বতী মূর্তি। চালচিত্রে আঁকা আছে দুর্গা পট। ডানদিকে লক্ষ্মী বাঁদিকে সরস্বতী। তাঁদের দু'পাশে জয়া-বিজয়ার মূর্তি। 'জিয়াগঞ্জের ছোট গোবিন্দবাড়ির এখন জীর্ণদশা।.......বর্তমানের অন্যতম সেবায়েত শ্রী মহিমরঞ্জন গোস্বামীর প্রকোষ্ঠে বসে পুরানো কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ চোখ আটকে গেল দেয়ালে টাঙানো কাগজে আঁকা একটি প্রাচীন পটে। কালীঘাট শৈলী কিংবা তারও আগেকার হয়তো। বয়োপ্রবীণ মহিমরঞ্জন জানান তাঁর পিতামহের আমল থেকে এই পট ঠাকুরঘরে তিনি দেখে আসছেন।............পটের নিচে সিঁদুর চন্দনের ছাপ নিত্যপূজার চিহ্ন। পটের বিষয়টাইতো চমকপ্রদ সমাপতনে ভরা। একই পটে লক্ষ্মী-সরস্বতী।'

পট ও পটেশ্বরী

নদীয়া জেলার শান্তিপুরের নানারকম দেবদেবীর মধ্যে বৈচিত্র্যপূর্ণ মূর্তি হল পটেশ্বরী। যখন রাস হয় তখন অন্যান্য ঠাকুরের সঙ্গে এঁরও পূজা হয়। এই মূর্তি অঙ্কিত হয় একটি কাঠের পাটাতনের উপর। প্রায় একশ বছরের পুরনো বার্মীজ সেগুন কাঠের তৈরি এই পাটাখানি ৬ ফুট লম্বা ও সাড়ে চারফুট চওড়া। প্রথমে পটখানি ভাল করে মেজে শুকিয়ে নেওয়া হয়, এরপর খড়ি মাটি জলেও গুলানো রং-এ জমি তৈরি হয়। এরপর নিয়ম অনুযায়ী পট আঁকা হয় — শিবের ওপর কালী মাতা, দু'পাশে জয়া বিজয়া।

পটেশ্বরীর মূর্তি আঁকতে গিয়ে শিল্পী কয়েকটি বিধি নিষেধ (taboo) মেনে চলেন। পট আঁকার দিনগুলিতে তিনি আমিষ ভক্ষণ করেন না। প্রস্রাব, পায়খানা, থুতু ফেলা প্রভৃতি বন্ধ থাকে, যতক্ষণ ছবি আঁকা চলে। স্নান করে কাজে বসার পর অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বন্ধ রাখতে হয়। এই পূজার উৎপত্তি সম্পর্কে নানারকম কিংবদন্তী শোনা যায়। কারো কারো মতে মুসলমান আমলে মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ থাকার সময় এই পটের মূর্তি সৃষ্টি হয়েছিল। কেউ বলেন বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে বনের মধ্যে লুকিয়ে এটি পূজা করা হতো। জনসাধারণের নজরে আসাতে পরবর্তীকালে প্রকাশ্যে এঁর পূজার ব্যবস্থা হয়। বাংলার পটশিল্পের ইতিহাসে শান্তিপুরের এই পটেশ্বরী এক উল্লেখযোগ্য কীর্তি।

◆ সূত্র ঃ চতুর্থ অধ্যায় ◆

১. দেবপ্রসাদ ঘোষ, বাঙলার পট/ভারতীয় শিল্পধারা, (১৯৮৬) পৃঃ ৫০-৫১

২. ডঃ ধ্রুব দাস ঃ পশ্চিমবঙ্গের লোকনাট্য, সংস্কৃতি মঞ্চ, শারদ '৯৪

৩. সৌমেন রায়, 'পট'—বাংলার লোকশিল্প ঃ আজকের প্রেক্ষাপট, অমৃতলাল পাড়ুই সম্পাদিত 'গ্রামোন্নয়ন' জুলাই-সেপ্টেম্বর '৯৬, পৃঃ ১২

৪. মন্টু দাস, দৈনিক ওভারল্যাণ্ড পত্রিকা, ২৯.৪.৯৪

৫. ডঃ বরুণ চক্রবর্তী ও ডঃ দিব্যজ্যোতি মজুমদার সম্পাদিত, পটুয়া শিল্প ঃ যামিনী রায়, বাঙলার লোকসংস্কৃতি, পৃঃ ১০১

৬. ভারত শিল্প (১৯৮৩) পৃঃ ৮৩

৭. বাংলার চিত্রকলা (১৯৯৪) পৃঃ ১৫৭

৮. The two great Indian artists : Jamini Roy's art : is it folkish? p. 42-43

৯. নির্মল কর ঃ পটের দুর্গা, দৈনিক বর্তমান পত্রিকা, ১৩.১০.৯৬

১০. জৈন পরিবারের সরস্বতী পূজা ও একটি পট চিত্র, দেশ, ২৩.১.৮৮, পৃঃ ৭৯



রাম লক্ষ্মণ সীতা—একটি চৌকো পট

● পঞ্চম অধ্যায় ●

সাহিত্যে পট-পটুয়া প্রসঙ্গ

সাহিত্য-দর্পণে সমাজ — তার রীতি-নীতি, শিল্প-সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয় সব যুগে, সর্বত্র। সাহিত্য মৌখিক কিংবা লিখিত হোক, শহরে কিংবা গ্রাম-পরিবেশে রচিত হোক, তার স্রষ্টা সমাজের যেকোনও স্তরের মানুষই হোক, সাহিত্যে সমাজ-প্রসঙ্গ থাকবেই। এইভাবে লোকচিত্রকলা সাহিত্যের সঙ্গী হয়েছে কালের পর কাল ধরে। প্রাচীন যুগ থেকে ভারতে বিভিন্ন লোকচিত্রকলার মধ্যে পট অন্যতম ও উল্লেখ্য। সেকারণে প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যে পটের উল্লেখ ও বর্ণনা লক্ষ্য করা যায়।

কবি বাণভট্ট-এর সংস্কৃতে রচিত উৎকৃষ্ট গদ্যকাব্য কাদম্বরী-তে পট স্থানলাভ করেছে। কাদম্বরী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য — 'সমস্ত কাদম্বরী কাব্য একটি চিত্রশালা'— যে তাৎপর্যই বহন করুক আমাদের অনুমান পট রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এবং বাণভট্টও পটকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। রাজরানী বিলাসবতীর সন্তান প্রসবের পর মহারাজ সূতিকাগৃহে মন্ত্রীসহ পুত্রমুখ-সন্দর্শনে এসে দেখলেন—'সূতিকাগৃহের দ্বারদেশে দুই পার্শ্বে সলিলপূর্ণ দুই মঙ্গল কলস, স্তম্ভের উপরিভাগে বিচিত্র কুসুমে গ্রথিত মঙ্গল-মালা, পুরস্ত্রীবর্গ কেহ বা ষষ্ঠী দেবীর পূজা করিতেছে, কেহ বা মাতৃকাগণের বিচিত্র মূর্তি চিত্রপটে লিখিতেছে।' এখানে লক্ষণীয়, লোকচিত্রকলার দু'টি প্রকবণের স্পষ্ট উল্লেখ। প্রথমতঃ রাজভবনে নানাবিধ আলপনা-চিত্রিত মঙ্গলকলস ও তার অবস্থান, যে প্রথা আজও প্রচলিত। দ্বিতীয়তঃ চিত্রপটে দেবী-মূর্তি এবং পুরস্ত্রীগণ শুধু যে মাতৃকা-মূর্তিই আরাধনা করতেন তা নয় পটে দেবীমূর্তি অঙ্কন করেও পূজাপার্বণ করতেন। অষ্টম শতাব্দে বিশাখদত্ত-এর সংস্কৃতে রচিত প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক নাটক মুদ্রারাক্ষস-এও পট প্রসঙ্গ চোখে পড়ে। পট সেখানে সাধারণের নিছক আনন্দদানের উপায় নয়। রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকারী। শুরুতেই প্রথম অঙ্কের একটি খন্ড দৃশ্যে রাজপথের বিস্তারে পটুয়া ছদ্মবেশী চরের যমপট হস্তে প্রবেশ ঘটেছে। চরের মুখে উক্তি ঃ

পণ সহ জমসম চলনে
কিং কজ্জং দে অ এহিং অন্নিহিৎ
এসো খু মারেই অন্ন ভত্তানৎ চড়পড়ন্ত.....

প্রাকৃত ভাষায় কথিত এই উক্তির বঙ্গানুবাদ —

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়—

প্রণম যমের পদে
অন্য দেবে আমাদের বল কিবা কাজ
অন্য দেব ভক্তদের
প্রস্ফুরন্ত হরি লন মহারাজ।

এখানে যমপট দেখানোর ব্যাপারটি চোখে পড়ে। পট-প্রসঙ্গ এটুকুতেই সমাপ্ত নয়। চর খিরোধগুপ্তের মুখে জানা যায় সেকালে বেশি পটুয়া চর নিয়োগের সুবিধা এবং যমপটের তাৎপর্য ইত্যাদি। দেখা যায়, অষ্টম শতাব্দীর কবি ভবভূতির উত্তরচরিত-এর কাহিনী রচনায় — কাহিনীর জটিলতা সৃষ্টিতে, পট ও পটুয়ার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। উত্তরচরিতের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই পট-প্রসঙ্গ চোখে পড়ার মতো বিস্তারিত। এখান থেকে আমরা জানতে পারি সেকালে পট ও পটুয়ার অস্তিত্ব এবং চিত্রকর নিয়োগের দ্বারা চিত্রাঙ্কন প্রথার কথা। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের সংলাপ—

লক্ষ্মণ "..............সেই চিত্রকর আমাদের আদেশমত এই চিত্রপটে আপনার কার্যগুলির সমস্ত চিত্র করেছে— এই দেখুন।" দ্বিতীয় দৃশ্যে—উদ্যান মন্ডপ। এখানে রামচন্দ্র ও সীতার পটচিত্র দর্শনের কথাই দৃশ্য জুড়ে এবং হুবহু পটের উল্লেখ আমাদের চোখে পড়ে। যেমন— মন্ত্রঃপূত জম্ভুক অস্ত্রের চিত্র, হরধনু ভঙ্গ, বশিষ্টের আশ্রম, চার ভ্রাতার বিবাহ-দৃশ্য, পরশুরাম ও রামচন্দ্র, মন্থরা, চিত্রকূট পর্বত, জনস্থান-মধ্যবর্তী প্রস্রবন, পম্পা সরোবরে হনুমান ইত্যাদি পটগুলি পৃথক পৃথক চৌকো পট কিংবা জড়ানো পট মধ্যবর্তী হতে পারে। এখানে পট-প্রদর্শক লক্ষ্মণ।

সপ্তম শতাব্দের কবি বাণভট্ট-এর 'হর্ষচরিত'-এ পট-প্রসঙ্গ চোখে পড়ে। এর পঞ্চম উচ্ছ্বাসের নাম 'মহারাজমরণবর্ণনং'। এই অংশে অন্তিম শয্যাশায়ী রাজার দর্শনার্থী শ্রীহর্ষ বিপনি বীথিতে প্রবেশকালে দেখেছিলেন, পটুয়া প্রদর্শনরত যম পটুয়াকে। প্রবোধেন্দু ঠাকুরের অনুবাদ থেকে অংশবিশেষ—পটুয়ার "ডান হাতে প্রকাণ্ড শর/আর বাম হাতে —ভীষণ মহিষে চড়া প্রেতনাথের চিত্তির-বিচিত্তির ছবি।" অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে বাণভট্ট এই যম-পটুয়ার জন্য আরও স্থান ব্যয় করেছেন তাঁর গ্রন্থে। পটুয়ার মুখে শাশ্বত সত্য ও নীতিকথা বসিয়েছেন বাণভট্ট—

মাতা-পিতৃ সহস্রানি পুত্রদার শতানিচ।
যুগে যুগে ব্যতীতানি কস্য তে কস্য বা ভবান।।

প্রবোধেন্দু-কৃত অনুবাদ ঃ হাজার হাজার মা আছে, হাজার হাজার বাপ আছে; ওরে, ছেলে ও মেয়ে আছে; ওরে, স্ত্রী-ও আছে। যুগের পর যুগ চলে যাচ্ছে তুই কে, ওরা তোর কে?" এই বইয়ের চতুর্থ উচ্ছ্বাস - "চক্রবর্তী জন্মবর্ণনঁ" অংশে রাজশ্রীর বিবাহ-উপলক্ষে রাজপ্রাসাদ অলংকরণ প্রসঙ্গে পুনরায় চিত্রকরের উল্লেখ করেছেন। বাণভট্ট পটুয়াদের এখানে প্রাণবন্ত—সক্রিয় করে এঁকেছেন। প্রবোধেন্দুর ভাষায়—"আলেপকরা বালুকা কন্টকের সঙ্গে বহুল মিশিয়ে সেই প্রলেপ দিয়ে তৈরি করতে লেগে গেল চিত্রাঙ্কনের জন্য নতুন নতুন ভিত্তি। চতুর চিত্রকরেরা জটলা বেঁধে লিখতে বসে গেল মঙ্গল-আলেখ্য।" হর্ষচরিত এবং মুদ্রারাক্ষসে যে যমপট ব্যবসায়ীর উল্লেখ আছে, তারা যমের মূর্তি ও যমালয়ের নানা ভয়ঙ্কর দৃশ্য এঁকে এবং গান সহযোগে গৃহস্থ বাড়িতে সে সব পট দেখাতেন।

একাদশ বা দ্বাদশ শতকে রচিত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ-এর দশম অধ্যায়ে চিত্রকর জাতির উৎপত্তির একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। ব্রাহ্মণবেশী ভগবান বিশ্বকর্মার ঔরসে গোপকন্যাবেশী

অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভে চিত্রকর জাতির আদিপুরুষ জন্মলাভ করেন। তাঁদের নয় জন পুত্র — মালাকার, কর্মকার, শঙ্খকার, কুন্দিবক (তন্তুবায়), কুম্ভকার, কাংস্যকার, সূত্রধার, চিত্রকার (চিত্রকর) এবং স্বর্ণকার। পরশুরামের শ্লোক থেকে জানা যায় কী কারণে পটুয়ারা হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হলেও সম্মান হারিয়ে সমাজচ্যুত হন।

ব্যতিক্রমেন চিত্রানাং সদ্যশ্চিত্র করস্তথা।
পতিতো ব্রক্ষশাপেন ব্রাহ্মণানাঞ্চ কোপত ঃ।।

[চিত্রকর চিত্রগুলির ব্যতিক্রম করায় ব্রাহ্মণগণ-কর্তৃক ক্রোধে শাপগ্রস্ত হয়ে সদ্য পতিত হয়েছে।]

খ্রীঃ পূর্ব চতুর্থ শতকে লেখা পানিনীর 'অষ্টাধ্যায়ী'। লেখকের মতে শিল্পীশ্রেণীর দু'টি ভাগ। (১) গ্রাম্য শিল্পী, যাঁরা কেবলমাত্র গ্রামের লোকদের প্রয়োজনমতো ছবি আঁকেন বা মূর্তি তৈরি করেন পোড়া মাটিতে কাঠে কিংবা ধাতুতে। (২) রাজশিল্পী অর্থাৎ কাশিকাকথিত রাজানুগ্রহপুষ্ট সভাশিল্পী, যারা রাজার আদেশমতো বা রুচি অনুযায়ী শিল্প সৃষ্টি করতেন। মহামতি ভাস রচিত 'প্রতিমানাটক'-এ পট-প্রসঙ্গ এবং 'রামায়ণ' মহাকাব্যেও পট-প্রসঙ্গ চোখে পড়ে। পতঞ্জলি-ও তাঁর 'মহাভাষ্য' গ্রন্থে বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন কীভাবে লোকচিত্রশিল্পীরা কংসবধের পালা চিত্রিত করে পটের সাহায্যে দেখাচ্ছেন। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে এই শ্রেণীর শিল্পীকে 'শৌভিক' বা 'শোভনিক' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। 'বুদ্ধচরিত'-এ উল্লেখ আছে যে, ভগবান বুদ্ধদেব চরণচিত্র নামে পরিচিত একটি আলেখ্যের প্রশংসা করেন। বুদ্ধ ঘোষ চরণচিত্রের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, চরণচিত্র সেই ধরনের চিত্র যা ভাবকল্পনাদীপ্ত ও যাতে ছবি একের চরণে অর্থাৎ নিম্নে ক্রমিকভাবে সাজানো। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' ও 'মালবাগ্নিমিত্র' নাটকদ্বয়ে, বৈষ্ণবশিরোমণি রূপগোস্বামী রচিত 'বিদগ্ধমাধব' নাটকে, গোপাল ভট্ট-রচিত 'হরিভক্তিবিলাস' গ্রন্থেও চিত্রপটের উল্লেখ সারা ভারতবর্ষে দীর্ঘ পটচর্চার নিদর্শন।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে অর্থাৎ খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতকে রচিত বৈষ্ণব পদাবলীর 'পূর্বরাগ' পর্যায়ে পটচিত্রের উল্লেখ আছে। পদকর্তার পদে উল্লেখ আছে যে, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের পটচিত্র দর্শন করে পূর্বরাগগ্রস্ত হয়ে পড়েন। চন্ডীদাসের পদে আছে—

'হাম সে অবলা, সরলা অখলা ভালমন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া, পটেতে লিখিয়া শাখা দেখলে আনি।।

মধ্যযুগে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর চন্ডীমঙ্গল কাব্যে 'কবিকঙ্কন চন্ডী'-তে (পৃঃ ৬৮) ভ্রাম্যমান পটশিল্পীদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। লিখেছেন—'পট পড়িয়া বলে কেহ নগরে নগর।'

আধুনিককালে বাংলা সাহিত্যের সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর 'রাজসিংহ' উপন্যাসে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। রাজসিংহের প্রথম পরিচ্ছেদে বৃদ্ধা তসবীরওয়ালীর 'হস্তীদন্তনির্মিত ফলকে লিখিত' চিত্রাবলীর দীর্ঘ বর্ণনা পাই। 'প্রাচীনা প্রথম চিত্রখানি বাহির করিলে এক কামিনী জিজ্ঞাসা করিল, এ কাহার তসবীর আয়ি?' প্রাচীনা বলিল, 'এ শাহাজাদা বাদশাহের

তসবীর।' ইত্যাদি। পট-প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র ২য় খন্ডের২য় পরিচ্ছেদেও পট-প্রসঙ্গ ও পটুয়াদের রাজনৈতিক ভূমিকার কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন—'জেবউন্নিসা একজন প্রধান politician, মোগল সাম্রাজ্যের হাল একপ্রকার তাঁর হাতে। ......সংবাদ সংগ্রহের জন্য তাঁর কতকগুলি লোক নিযুক্ত ছিল। তার মধ্যে তসবীরওয়ালা খিজির একজন। তার মা নানা দেশে তসবীর বেচিতে যাইত। খিজির তাহার নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিতেন।' রাজসিংহে পটের উল্লেখ ও বর্ণনা বারংবার এবং কাহিনীবয়নে পট ও পটুয়ার ভূমিকা স্মরণীয়। কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও পটের মর্যাদা দিয়েছেন। তারই প্রকাশ— 'থাকুন তিনি পটে আঁকা।' কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলার পটুয়াদের সম্পর্কে অতিমুগ্ধ। 'আমরা' কবিতায় তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ—

'আমাদের কোন সুপটু পটুয়া লীলায়িত তুলিকায়,
বাংলার পট অক্ষয় করে রেখেছেন অজন্তায়।'

মাইকেল মধুসূদন দত্ত পটচিত্রকে যথেষ্ট গুরুত্ব দান করেছেন, তাঁর 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে পটচিত্র কৃষ্ণকুমারী ও মানসিংহের মধ্যে প্রণয় সৃষ্টির মাধ্যম। রবীন্দ্রনাথেরও এক স্মরণীয় কাব্য-পংক্তিতে পটের উল্লেখ। শাজাহান সম্পর্কে লিখেছেন — 'তুমি কি কেবলি ছবি, শুধু পটে লিখা।'

গিরিবালা দেবীর 'রায়বাড়ি' উপন্যাসে লক্ষ্মীপুজোর বর্ণনায় পটচিত্রের প্রসঙ্গ লক্ষ্য করা যায়। সেখানে ঠাকুমা বলছেন—''আমাদের লক্ষ্মী প্রতিমা নেই — ঘটে-পটে পুজো। আমাকে আলপনায় আঁকতে হয় — লক্ষ্মীর মুখ, জোড়া জোড়া চরণ, ধানের শিষ, পদ্মলতা, শংখলতা।'' লক্ষ্মী প্রতিমার স্থলে আজকের মতো সেকালেও লক্ষ্মীর ছবিতে পূজার প্রচলন ছিল। এদেশে ধর্মীয় জীবনে রথযাত্রার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বিশেষত জগন্নাথদেবের রথ-প্রসঙ্গ সাহিত্যে বহু। সে-রথে দারু-ভাস্কর্য থাকলেও চিত্রকাহিনীতে সজ্জিত করা একটি প্রথা। একাজটি করতেন পটুয়ারা। 'বঙ্গলক্ষ্মীর ঝাঁপি' বইয়ে অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ফকিরচন্দ্র দে নামের এক শিল্পীর কথা বলেছেন। পট-অঙ্কনেও তিনি সুপটু ছিলেন। কিন্তু তা চৌকো পট বা জড়ানো (দীঘল) পট নয়; তাঁর অঙ্কন-স্থান ছিল নিজের তৈরি রথের কাঠের অবয়ব। এরকম বহু রথশিল্পী হারিয়ে গেলেও কবি-সাহিত্যিকেরা তাঁদের প্রশংসায় মুখর। তাঁরা লেখেন —

''ছুতোর ডেকে রঙিন এ'রথ গড়ল পুলকে!
আসল গাঁয়ের বৃদ্ধ পোটো রঙিন তুলির সনে,
রেখায় রেখায় বাঁধল সে কোন সোনার স্বপনে।
আজ সে রথ জীর্ণ; পটও অদৃশ্য!
ছবিগুলো যাচ্ছে মুছে, ভাঙা কদম ডাল,
ত্যাগ করিয়া পালিয়ে গেছে নিঠুর বংশীলাল'।

পল্লীকবি জসীমউদ্দিন-এর কাব্যের একটি অতি প্রিয় বিষয় ছিল রথের অবয়বে চিত্র ও অলঙ্করণ। তাঁর 'ধানক্ষেত' কাব্যে 'চৌধুরীদের রথ' কবিতায় লিখেছেন 'এমনি কালের

কঠোর ঘায়ে দিনের পরে দিন,/এসব ছবির একখানিরও থাকবেনাকো চিন'। তাঁর 'ধামরাই রথ' কবিতায় পটুয়ার কীর্তি বর্ণিত—

'ধামরাই রথ, কোন অতীতের বৃদ্ধ সূত্রধর,
কতকাল ধরে গড়েছিল এরে করে অতি মনোহর।'

এই রথের অবয়বে তাঁর চিত্র বর্ণনাও চমৎকার—

'তারপর এলো নিপুণ পটুয়া, সূক্ষ্ম তুলির ঘায়
স্বর্গ হতে কত দেবদেবী আনিয়া রথের গায়;
রঙের রেখার মায়ায় বাঁধিয়া চিরজনমের তরে,
মহা সান্ত্বনা গড়িয়া রেখেছে ভঙ্গুর ধরা পরে।'

রথের অবয়য়ে কৃষ্ণের মথুরা গমন, রাধার বিরহ বেদনা, সীতাহরণ, রাম-লক্ষ্মণ-হনুমানের শোভাযাত্রা, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ইত্যাদি পটচিত্রাবলী বর্ণনায় কবির লেখনী ছিল অক্লান্ত। জনশিক্ষাদানে পটের ভূমিকাও কবি উল্লেখ করতে ভুলেন নি অন্যত্র।

'এই ছবিগুলি কাঠের রথের লীলায়িত রেখা হতে
কালে কালে তাহা রূপায়িত হতো জীবনদানের ব্রতে।
নারীরা জানিত এমনি ছেলেরা সাজিবে যুদ্ধ সাজে,
নারী-নির্যাতনকারীদের মহানিধনের কাজে।'

আধুনিক কবি জীবনানন্দ দাশ-ও তাঁর '১৯৪৬-৪৭' নামের কবিতায় পটের ছবির সৌন্দর্যের কথা বলেছেন।

বাংলার লক্ষ গ্রামরাত্রি একদিন
আলপনার, পটের ছবির মতো সুহাস্যা,
পটলচেরা চোখের মানুষী
হতে পেরেছিলো প্রায়; নিভে গেছে সব।''

একেবারে আধুনিক কালের প্রথম সারির সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্পেও পটুয়াদের কথা স্থান পেয়েছে। তিনি তাঁর 'শ্রেষ্ঠ গল্প' গ্রন্থে 'পটুয়া নিবারণ' নামে একটি গল্প লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, 'যদিও ঠিক পটুয়া ছিলেন না নিবারণ, তবু তাঁর আঁকার ধরনধারণ ছিল অনেকটা পটুয়াদের মতোই। তুলির টান, রঙের মিশ্রণ—সব কিছুই ছিল সেই পুরোনো ধরনের।'

অনিষেকান্তি পাল কিম্বদন্তির মনোহর ফাঁসুড়েকে নিয়ে গল্প লিখেছেন 'ডাকাতের মেয়ে রাহুতি'। এটি হল মেদিনীপুর জেলার একটি অঞ্চলে প্রচলিত ডাকাতের পটের কাহিনী। শ্রী পাল ডাকাতের পটের গানটি সংগ্রহ করেন, হরেন পটুয়ার কাছ থেকে। পটুয়াদের নিয়ে নাটকও লেখা হয়েছে। নাট্যকার অরূপশংকর মৈত্র লিখেছেন 'পটুয়া' নামের নাটক। লক্ষ্মী ভালবেসেছিল সাগরকে। সে ছিল একজন পটুয়া। চৈত্রমাসে লক্ষ্মীর 'পট' কিনতে গিয়ে লক্ষ্মী তার এই মনের মানুষের খোঁজ পায়। নাট্যদলগুলি 'পটুয়া' নাটকটি মঞ্চস্থ করছে।

কাজল মহান্তি রচিত ও পরিচালিত 'পট পটুয়ার পাঁচালী' নাটকেও স্বাভাবিকভাবেই পটুয়াদের কাহিনীই উপস্থাপিত হয়েছে।

সাহিত্যের একটি দিক লোকসাহিত্য। লোকসাহিত্যে লোকচিত্রকলার এদিকটি কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তা দেখা যেতে পারে। মহম্মদ আয়ুব হোসেন-এর 'বাংলার লোককথা' গ্রন্থে (পৃঃ ৫৩-৫৭) বাংলার পটুয়ারা কবে থেকে কীভাবে পট অঙ্কন শুরু করেন, তার একটি কাহিনী বিবৃত হয়েছে।

অতি প্রাচীনকালে আরব দেশে ছিল এক বাদশা। রাজ্য তার বিরাট। হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, উজির, নাজির ইত্যাদি নিয়ে রাজপুরী গমগম করে। কিন্তু বাদশার মনে সুখ নেই। কারণ, তার রাজ্যের দক্ষিণে বিশাল, গভীর বনে বাস করতো এক বিরাট দৈত্য, যে তার প্রতিদিনের খাবারের জন্য প্রজাদের ক্ষেত থেকে প্রচুর ফসল লুঠ করে নিয়ে যেত। ফলে প্রজাদের অভাব ঘটত। প্রজারা অনেকে অন্নাভাবে মারা যেত। বাদশা অনেক চেষ্টা করেও দৈত্যবধ করতে পারেনি। প্রজাদের রক্ষা করতে বাদশা দৈত্যের সঙ্গে এক চুক্তি করল। প্রতিদিন বনের এক বটগাছের নীচে প্রচুর খাবার রেখে আসা হবে। দৈত্য তা খাবে। দৈত্য খুশি হলো। কেননা বসে বসেই খাবার পাওয়া যাবে। মাঠে-মাঠে ঘুরতে হবে না। বাদশা চুপচাপ কিন্তু বসে থাকল না। দৈত্যের অগোচরে ঘোষণা করল — যে দৈত্য বধ করতে পারবে, তাকে প্রচুর অর্থে পুরস্কৃত করা হবে। ফল হলো, টাকার লোভে বহু শক্তিশালী মানুষ দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা পড়ল।

সে সময় বাংলা মুলুকে সমুদ্র কিনারের এক গাঁয়ে বাস করতো এক গরীব মানুষ আর তার যুবক ছেলে। ছেলেটি বেশ বলবান। আরব থেকে সে সময় সে অঞ্চলে আসত বণিকেরা, নৌকা করে। যুবকটি তাদের মুখ থেকে দৈত্যের অত্যাচার ও রাজার ঘোষণার কথা শুনল। বণিকেরা যুবকটিকে তার মৃত্যুর সম্ভবনার কথাও জানাল। যুবকটি বললে— এমনি খেতে পাইনা। যদি সফল হই বহু টাকা পুরস্কার। মরে গেলেও ক্ষতি নেই। একদিন তো মরতেই হবে; একটা ভালো কাজ করতে গিয়ে যদি প্রাণ যায়, যাক। নৌকায় চেপে আরব দেশে গিয়ে বাদশার কাছে জানাল তার দৈত্যবধের ইচ্ছা। বাদশাহ যুবকটির চেহারা দেখে আর মহৎ কাজে প্রাণ দেবার সিদ্ধান্ত শুনে খুশি হলো। তারপর যুবকটি কয়েকদিন বাদশাহের আশ্রয়ে থেকে ভালোভাবে আহারাদি করল। একদিন রাজার পালা পড়ল। সেদিন যুবকটি প্রচুর ফল, মিষ্টি, মাংস ইত্যাদি নিয়ে বনের বটগাছের তলায় গিয়ে 'দৈত্য, দৈত্য' ডাক দিল, আর নিজেই খাবারগুলো খেতে লাগল। দৈত্য ছুটে এসে সে-দৃশ্য দেখে রাগে অন্ধ হয়ে গেল। যুদ্ধ করতে করতে দু'জনেই গভীর বনে প্রবেশ করল। যুদ্ধে হারজিতের মধ্যে অবশেষে দৈত্যের মৃত্যু হলো। দূর, গভীর বন, সেখান থেকে মৃত দৈত্যের শরীর রাজধানীতে নিয়ে আসা সম্ভব হলো না। সে বনে ছিল একরকম গাছ, যার পাতা বড় ও মসৃণ। যুবকটি তার পাতা জুড়ে জুড়ে দীঘল পট তৈরি করে দৈত্যের রক্তের রঙে এবং গাছের ঝুরিতে তুলি তৈরি করে অঙ্কন করল ঘটনাবহুল ছবি। পটচিত্র তৈরি হলো। তা নিয়ে রাজার কাছে এসে যুবকটি গান সহযোগে পটচিত্র প্রদর্শন করেছিল।

শুন শুন শুন রাজা শুন বিবরণ
কীভাবে দৈত্য মারিলাম বলিব এখন।
তোমার দেশের লোকেরা সব বাঙলা মুলুক যায়
ধান কেটে পাটকে নৌকাতে চাপায়
তাদের মুখেতে শুনি দৈত্যটার কথা
অত্যাচার শুনে মনে পাই বড় ব্যথা।
কাহিনী এগোতে থাকে শেষ হয় এইভাবে—
এইভাবে মারি দৈত্য শুন মহাশয়।
চিৎ হয়ে আছে পড়ে করহ প্রত্যয়
নাকে মুখে রক্ত ঝরে বন লালে লাল
গহিন বনেতে আছে জ্বলিলে মশাল।

বাদশাহ যুবকের কাহিনী বিশ্বাস করলেন; দিলেন পুরস্কার এবং চিত্রকর উপাধি। যুবক বাঙলায় ফিরে এসে পট-অংকন শুরু করল। তার ছেলেরা তার কাছ থেকে পট-অংকন শিক্ষা করে ছড়িয়ে পড়ল দেশ-বিদেশে।

কোন কোন দেশের লোকগীতিতেও পটচিত্রের উল্লেখ আছে। ময়মনসিংহ (বাংলাদেশ) জেলায় শ্রাবণ মাসে মনসা দেবীর আবাহন-মন্ত্রে চিত্রপট কথাটি পাওয়া যায়।

"নমো মনসা দেবী শঙ্কর দুহিতা.....
আলিপন চিত্রপট রক্ত পদ্মপাতে।
আতপ, তন্ডুল, ক্ষীর, ঘৃত, মধু তাতে"।।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার-এর ঠাকুরদার ঝুলি এবং ঠাকুরমার ঝুলি সুপরিচিত, প্রাচীন গ্রন্থদ্বয়। ছবি বা পট দেখে নায়ক বা নায়িকার মনে অনুরাগ সৃষ্টির ঘটনা বাংলা সাহিত্যে কম নেই। তাঁর সংগৃহীত কাঞ্চনমালা'র কাহিনীতে অনুরাগ সৃষ্টিতে পটের ভূমিকা প্রবল ছিল। পটের যেমন মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে, তেমনি তাঁর বর্ণনা বিবরণও অবিস্মরণীয়। কাহিনীর শুরু থেকে শেষ অবধি — অধ্যায়ে-অধ্যায়ে —পট প্রসঙ্গ অপরিহার্যরূপে এসে পড়েছে। পট প্রবল প্রভাবক্ষম — পট নিজেই চরিত্র হয়ে উঠেছে। মনে হয় পট-প্রসঙ্গ এখানে বর্জিত হলে বা সংক্ষিপ্ত হলে কাহিনী এত রোমাঞ্চকর ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠত না। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর 'ক্ষীরের পুতুল' গ্রন্থেও এরকম একটি পট-প্রসঙ্গ আছে। এ দেশের একটি রূপকথা অবলম্বনে রচিত এটি। পাত্র ক্ষীরের পুতুলের জন্য পাত্রী সন্ধান করতে গিয়ে রাজকন্যার পটচিত্রই নিয়ে এসেছিল; যা দেখে রাজা খুশি হয়েছিলেন।

● ষষ্ঠ অধ্যায় ●

বিভিন্ন সংগ্রহশালায় পটের সংগ্রহবিষয়ক আলোচনা

লোকজীবন চর্চা ও মানস চর্চার সামগ্রিক রূপায়ন লোকসংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলির মধ্যে বস্তুগত এবং অবস্তুগত দুই ধরনের উপাদানই আছে। যে কোন জাতিরই আপন আত্মার অবস্থান লোকসংস্কৃতির গভীরে প্রোথিত। ফলে কোন জাতির অস্তিত্ব খুঁজে পেতে লোকসংস্কৃতির উপাদানের উপর নির্ভর করতে হয়। সেই কারণে লোকসংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত বিষয়বস্তুগুলি সংরক্ষণে সংগ্রহশালাগুলির যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। জাতির আত্মানুসন্ধান এবং সংস্কৃতির মূলানুসন্ধানে সংগৃহীত উপাদানগুলি বিশেষ সাহায্য করে। এই অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব লোকসংস্কৃতির উপাদান পট সংগ্রহ এবং সংরক্ষণে সংগ্রহশালাগুলি কী ভূমিকা নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে থাকা সংগ্রহশালাগুলি অধিকাংশই পুরাবস্তুনির্ভর। নৃতাত্ত্বিক উপাদান, লোকশিল্পের উপাদাননির্ভর কিছু সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত হলেও তার সংখ্যা অল্প। সর্বত্রই অর্থনৈতিক দুরবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে। অধিকাংশক্ষেত্রেই বিজ্ঞানসম্মত সংরক্ষণের উপায় নেই। আমরা এখানে আলোচনা করব সেই সংগ্রহশালাগুলির কথা, যেখানে পট সংগৃহীত আছে।

গুরুসদয় সংগ্রহশালা ঃ লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে গুরুসদয় সংগ্রহশালার গুরুত্ব অপরিসীম। গুরুসদয় দত্ত (১৮৮২-১৯৪১) প্রতিষ্ঠিত 'বাংলার ব্রতচারী সমিতি'র উদ্যোগে কলকাতার কাছেই ঠাকুরপুকুরের পাশে জোকা গ্রামে ১০০ বিঘা জমির খানিকটা অংশে এই সংগ্রহশালার প্রতিষ্ঠা হয়। প্রয়াত গুরুসদয় দত্ত সংগ্রহশালার উপাদানগুলি সংগ্রহ করেন। জড়ানো এবং চৌকো দু'ধরনের পটই এখানে সংগৃহীত রয়েছে। সংগ্রহশালায় জড়ানো পটের সংখ্যা ২৫৮। রামায়ণের কাহিনী ৫২টি পটে, ২টি পটে দশাবতার গল্প, ১৬টি পটে বেহুলা ও মনসার কাহিনী, ৮টি পটে শক্তিরূপিনী দুর্গার কাহিনী, ৬টি পটে চণ্ডীমঙ্গল, ৬টি গাজীর কাহিনী, ৫টি পটে রাজার গল্প, ১৩টি পটে গৌরাঙ্গের কাহিনী, ১০টি সাঁওতাল পট ও কৃষ্ণলীলাকে কেন্দ্র করে রয়েছে ৫৮টি পট। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে রয়েছে ৮২টি পট। উল্লিখিত এই পটগুলি আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১৬ শতক, ১৯ শতক ও ২০ শতকের। চৌকো পটগুলির মধ্যে চক্ষুদান ও কালীঘাটের পট বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কালীঘাট পটের সংখ্যা ৪০৬টি। গুরুসদয় সংগ্রহশালায় সংগৃহীত পটগুলি সংরক্ষণে সংগ্রহশালা কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট যত্নবান। এখানকার কর্মীরা বিজ্ঞানসম্মতভাবেই পট তথা অন্যান্য উপাদানগুলিকে সংরক্ষিত করেছেন। যে পটগুলি প্রদর্শিত নেই সেগুলিও দেখার সুষ্ঠু ব্যবস্থা আছে। এবং লোকসংস্কৃতিপ্রেমী মানুষদের পট বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন সময় এঁরা শুধু পটচিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থাও করেন। সেই প্রদর্শন কোন কোন সময় গুরুসদয় সংগ্রহশালার বাইরে ভারতীয় যাদুঘরেও হয়। পোষ্টকার্ড সাইজের পটচিত্র সম্বলিত ছবিও

এঁরা প্রচার করেন—যাতে বেশি করে সাধারণ মানুষ পট বিষয়ে আকৃষ্ট হন, ভালবাসতে শুরু করেন লোকচিত্রের প্রাচীন এই ধারাটিকে।

আনন্দনিকেতন কীর্তিশালা ঃ হাওড়া জেলার বাগনানে ১৯৬২ সালের ১৪ জানুয়ারী আনন্দনিকেতন কীর্তিশালার উদ্বোধন হয়। এখানে সংগৃহীত মোট পটের সংখ্যা ৮৬। সংগৃহীত পটশিল্পের দু'টি বিভাগ — (১) জড়ানো পট (২) চৌকো পট। জড়ানো পটগুলির মধ্যে ৪টি প্রদর্শিত রয়েছে। এর মধ্যে বিশ শতকের তৈরি কৃষ্ণলীলাবিষয়ক একটি পট রয়েছে। বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুর থেকে সংগৃহীত চক্ষুদান বিষয়ক পটও রয়েছে। কাপড়ের উপর আঁকা ঊনবিংশ শতকের তৈরি মনসা বিষয়ক একটি পট বাংলাদেশের ফরিদপুর থেকে সংগৃহীত হয়েছে। মেদিনীপুরের ঠেকুয়াচকের অজিত চিত্রকরের ১৯৭৮ সালে আঁকা একটি মনোহর ফাঁসুড়ের পটও রয়েছে। ১৯৭৮ সালের বিধ্বংসী বন্যায় পটগুলি জলে ভিজে যায়। এগুলিকে সংরক্ষণ করাই দায় হয়ে পড়ে। অবশেষে সংগ্রহশালা কর্তৃপক্ষ মেদিনীপুরের দুখুশ্যাম চিত্রকরকে দিয়ে পটগুলির পেছনে কাপড় লাগিয়েছেন। চিত্রিত রংগুলি বানের জলে বিবর্ণ হলেও পেছনে কাপড় থাকায় কাগজের পট অনেকটা শক্ত হয়েছে। স্থানাভাবে সেগুলিকে আলমারির মধ্যেই রাখা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ ভারতীয় যাদুঘরের সংরক্ষণ বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন যাতে পটগুলিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়।

আশুতোষ সংগ্রহশালা; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৩৭ সালে আশুতোষ সংগ্রহশালার উদ্বোধন হয়। আশুতোষ সংগ্রহশালায় দু'ধরনের পট রয়েছে — (১) জড়ানো পট, (২) চৌকো পট। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে সংগৃহীত ১৯টি জড়ানো পট রয়েছে। এর মধ্যে মেদিনীপুরের ৫টি, বাঁকুড়া ও বর্ধমানের ২টি করে, বীরভূমের ৩টি, হুগলীর ১টি পট রয়েছে। এছাড়া মানভূমের ২টি এবং ধলভূমের (বিহার) ১টি পট রয়েছে। বিভিন্ন বিষয়গুলি হল — কৃষ্ণলীলা বিষয়ক — ৩, চৈতন্যলীলা বিষয়ক — ২, কমলেকামিনী — ৩, বেহুলা — ২, রামলীলা — ২, যজ্ঞ পট — ১, সাঁওতাল পট — ১, পীর পট — ২, ভক্তি পট - ১, বিষ্ণু পট — ১। এর বাইরে অন্যান্য বিষয়েও পট আছে। কালীঘাটের পট, সাঁওতাল পট বা চক্ষুদান পট বা আদিবাসী পট মিলিয়ে চৌকো পটের সংখ্যা ২৪। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর আঁকা এই পটগুলি সংরক্ষণের জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফিউমেগেশান চেম্বার ব্যবহার করা হয়।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকসংস্কৃতি বিভাগের সংগ্রহশালা ঃ বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পূর্ণাঙ্গ লোকসংস্কৃতি বিভাগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯৯০ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণাঙ্গ লোকসংস্কৃতি বিভাগের প্রতিষ্ঠা হয়। তখন থেকেই বিভাগে একটি সংগ্রহশালা স্থাপনের উদ্যোগ দেখা দেয়। সংগ্রহশালাটি তৈরির পেছনে যাঁর অবদান সব থেকে বেশি তিনি হলেন বর্তমান বিভাগীয় প্রধান ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী। অনেকগুলি পট এখানে সংগৃহীত হয়েছে। অধিকাংশই জড়ানো পট। বেশিরভাগই এগুলো মেদিনীপুর থেকে সংগৃহীত। ৪টি পট প্রদর্শিত আছে। একটি রামায়ণ বিষয়ক জড়ানো পট

কাঁচের ফ্রেমে সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। পটগুলি সংরক্ষণের ব্যাপারেও কর্তৃপক্ষ সজাগ।

রজনীকান্ত জ্ঞান মন্দির ও গবেষণা কেন্দ্র ঃ মেদিনীপুর জেলার রামনগর থানার ধাড়াস গ্রামে বিশিষ্ট শিক্ষক প্রয়াত রজনীকান্ত মাইতি মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশে এই সংগ্রহশালার প্রতিষ্ঠা। এখানে শোলার কয়েকটি পট সংগৃহীত রয়েছে। পূর্বে মেদিনীপুরের এই অঞ্চলে শোলার পট অঙ্কিত হত। শোলার পটে দেবদেবীর চিত্র অঙ্কিত হত। পুজোতে এই পটের ব্যবহার ছিল। বর্তমানে এর প্রায় অবলুপ্তি ঘটেছে। কিন্তু কিছু শোলার পট বেশ যত্ন করেই সংগ্রহশালাটিতে সংরক্ষিত আছে।

তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্র ঃ মেদিনীপুর জেলার তমলুক পুরসভার দু'টি ঘরে সংগ্রহশালাটির উপাদানগুলি প্রদর্শিত হচ্ছে। এই সংগ্রহশালায় ১৫টি জড়ানো পট প্রদর্শিত হয়েছে। পটগুলি এই জেলার নয়া, ঠেকুয়াচক প্রভৃতি জায়গা থেকে সংগৃহীত। উল্লিখিত পটের বিষয়গুলি হল ঃ রাস বা কৃষ্ণলীলা — ১টি, কৃষ্ণ — ২টি, মনসামঙ্গল — ১টি, কমলেকামিনী — ১টি, সাহেব পট — ১টি, সাঁওতাল জন্মবিষয়ক — ১টি, মনসা—১টি, সত্যপীর—১টি, বন্যা—১টি ও আধুনিক বিষয়ক — ৫টি পট প্রদর্শিত হয়েছে। এগুলি জড়ানো পট।

আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন ঃ বিষ্ণুপুরের 'আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর একটি শাখা। এখানে সংগৃহীত জড়ানো পটের সংখ্যা ১০। এর মধ্যে সাঁওতালী ৪টি, পৌরাণিক বিষয়ক ১টি এবং অন্যান্য লোক-কাহিনী সম্বলিত ৫টি পট রয়েছে। একটি পট ওড়িশার, বাকি পটগুলি বাঁকুড়া জেলারই বেলিয়াতোড় থেকে সংগৃহীত। পটগুলি সংরক্ষণে আরও একটু যত্নশীল হওয়া দরকার।

হরিপদ সাহিত্য মন্দির ঃ পুরুলিয়ার তিন কক্ষবিশিষ্ট এই সংগ্রহশালাটিতে ৩০টি সাঁওতাল পট রয়েছে। অনিলকুমার চৌধুরীর উদ্যোগে মূলত এখানকার উপাদানগুলি সংগৃহীত হয়েছে।

গভর্নমেন্ট ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল এণ্ড কমার্শিয়াল মিউজিয়াম ঃ কলকাতার ৪৫ গণেশচন্দ্র এভেনিউর তিন তলায় এর অবস্থান। এটি সরকারি সংগ্রহশালা। এখানকার ৫টি জড়ানো পটের মধ্যে ১টি সাঁওতাল পট, ১টি রামায়ণ পট। ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পকেন্দ্রের উৎপাদিত বস্তুগুলি এখানে অস্থায়ীভাবে প্রদর্শিত থাকে।

রামকৃষ্ণ মিশন সংগ্রহশালা ঃ কলকাতার গোলপার্কে অবস্থিত এই সংগ্রহশালায় ওড়িশার পট রয়েছে। এর মধ্যে ৩টি জগন্নাথ পট এবং ১টি অষ্টাদশ শতকের তৈরি নবগ্রহ পট প্রদর্শিত রয়েছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক কালিদাস দত্ত সংগ্রহশালা ঃ দঃ ২৪ পরগণার জয়নগর মজিলপুরে প্রত্নতাত্ত্বিক কালিদাস দত্ত এই সংগ্রহশালাটি গড়ে তোলেন। এখানে বেশ কিছু পট রয়েছে। গাজীর পট ছাড়াও অন্যান্য কিছু পট আছে।

পঃ বঃ রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহশালা ঃ কলকাতায় বেহালা ট্রাম ডিপোর কাছে এর

অবস্থান। এখানে ১৭টি পট প্রদর্শিত আছে। কিছু কালীঘাট পটও আছে। একটিতে সুন্দরী রমণী — হাতে গোলাপ। একটি যমপটে মৃত্যুর পরে পাপীদের বিভিন্ন শাস্তির দৃশ্য চিত্রিত হয়েছে।

রাজ্য লোকসংস্কৃতি সংগ্রহশালা ঃ রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহশালার নিচের তলাতেই এর অবস্থান। মেদিনীপুরের ২টি পট প্রদর্শিত আছে। একটি সাহেব পট অপরটি কৃষ্ণলীলাবিষয়ক।

ভারতীয় যাদুঘর ঃ কলকাতায় 'এশিয়াটিক সোসাইটি'তে ১৮১৪ সালে এর উদ্বোধন হয়। ভারতীয় যাদুঘরে ৪০টি পট আছে। সংগ্রহশালা হিসেবে এর ঐতিহ্য সর্বজনবিদিত।

বিড়লা একাডেমি অব আর্ট এ্যাণ্ড কালচারাল সংগ্রহশালা ঃ মূলত এটি ভারতীয় ধ্রুপদী শিল্পের প্রদর্শন কক্ষ। তবুও এখানে ২টি কালীঘাটের পট রয়েছে। এর মধ্যে ১টি শিব অপরটি মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তি।

অমূল্য প্রত্নশালা ঃ হুগলী জেলার রাজবলহাটে ১৯৪১ সালে এর প্রতিষ্ঠা। এখানে রথের গায়ে কাঠের ফলকের উপর অঙ্কিত পটচিত্র রয়েছে।

ভুবন মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারী ঃ কলকাতার পর্ণশ্রী পল্লীতে ১৯৮৯ সাল থেকে এটি শুরু হয়েছে। দু'টি পট রয়েছে। ১টি মেদিনীপুরের অপরটি ওড়িশার পুরী থেকে



জয়কৃষ্ণপুরের এক পটুয়া পট দেখাচ্ছেন

• সপ্তম অধ্যায় •

পটশিল্পের ভবিষ্যৎ

এতক্ষণ কয়েকটি পরিচ্ছেদে বাংলার নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট ও গুণযুক্ত কিন্তু বিলীয়মান পটশিল্পের সমগ্র মূর্তিরূপের নানা তথ্যবিবরণ দেবার চেষ্টা করা হল। প্রকৃতপক্ষে তাদের অনাগত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা প্রয়োজনীয় বিষয় এবং এখনই সে ভাবনার উপযুক্ত সময়ও বটে। কোনো শিল্প বা সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত ভাবনা বলতে আমরা বুঝি ভবিষ্যতে তার অস্তিত্ব গতি-প্রকৃতি, বিকাশ পরিণাম ইত্যাদি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা, প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ইত্যাদি। পটশিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আজ আমাদের মনে দুশ্চিন্তার ঢেউ প্রবল আকারে কেন জাগছে — কেন পশ্চিমে বাতাস ঢেউকে প্রবল করে তুলেছে, যেমন অন্যান্য কার্যের ক্ষেত্রে তেমনি এই চিন্তাক্রিয়ায় কার্য-কারণ কোথায় নিহিত? পটশিল্প ও শিল্পীদের বর্তমান দুরবস্থাই এ চিন্তার মূল — বোধ হয় একথাটি জোরের সঙ্গে বলা যায়। পটশিল্প ইতিপূর্বে কোনো কোনো দেশী বিদেশী শিল্পরসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, এবং এর ভবিষ্যৎ তাঁদের চিন্তার জগতে আলোড়ন তোলেনি, এমন নয়। রবীন্দ্রভাবনায় এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় একথা আগেও বলা হয়েছে। তিনি এই দেশীয় শিল্পকলার মহিমামন্বিত রূপ ও শক্তি দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। এদের অবনতি ও এদের প্রতি অবজ্ঞা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তবে এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হয়তো তাঁর যথেষ্ট উদ্বেগ ছিল, তবে তার তেমন কোনো প্রকাশ বা প্রমাণ লক্ষ্য করা যায় না। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চিত্রশিল্পকে নিশ্চয় 'সূক্ষ্মশিল্পের' অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। সূক্ষ্মশিল্প তাঁর মনে বেদনা সৃষ্টি করেছিল। পটশিল্পের মত সূক্ষ্ম শিল্পে তাঁর দৃষ্টি না পড়ারও কোন কারণ নেই। রবীন্দ্র পরবর্তী যুগে আধুনিককালে পটশিল্পের ও পটুয়াদের ক্রমাবনতি লক্ষ্য করে কেউ কেউ এদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যথেষ্ট উদ্বেগ ও সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাঁদের অনেকের বিবরণ প্রত্যক্ষ-দর্শন ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক বলে বিশ্বাসযোগ্য।

গুরুসদয় দত্ত তাঁর 'পটুয়াসঙ্গীত' গ্রন্থে পট সম্পর্কে বলতে গিয়ে পটশিল্প সম্পর্কে তাঁর উন্নত শিল্পদৃষ্টি ও এর বিলুপ্তপ্রায় অবস্থার কয়েকটি কারণও উল্লেখ করেছেন। "বাংলার পল্লীচিত্রশিল্পের মধ্যে গ্রাম্য পটুয়াদের অঙ্কিত বহু চিত্রিত দীর্ঘ পটগুলিই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও উচ্চাঙ্গের রস শিল্প। বাংলার সামাজিক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় রীতিনীতির পরিবর্তনে এবং বর্তমান শিক্ষার ফলে ইহা এখন বিলুপ্তপ্রায়। কিন্তু এই বিলুপ্তপ্রায় অবস্থাতেও ইহা যে এখনও বাংলার জাতীয় জীবনের একটি শ্রেষ্ঠতম গৌরবময় সম্পদ তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।" গুরুসদয় দত্ত বাংলার লোকায়ত পল্লীসমাজের অনুশীলিত চিত্রশিল্পের মধ্যে পটচিত্রকে সর্বোচ্চ স্থানের মর্যাদা দিয়েছেন কিন্তু, তা বিলুপ্তপ্রায় দীনাবস্থা থেকে উদ্ধার করে ভবিষ্যতে অস্তিত্বের কঠিন গ্রানাইট প্রস্তরের ওপরে প্রতিষ্ঠিত করার তেমন কোনো কার্যকরী উপায়ের প্রস্তাব করেছেন বলে জানা নেই। তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় তাকে বাঁচিয়ে রাখার আন্তরিক উদ্দেশ্য ছিল তাঁর। এই উদ্দেশ্যেই নানা স্থানে পরিশ্রম সহকারে অনুসন্ধান কার্য তিনি চালিয়ে

আমাদের সামনে এই গৌরবময় বিলুপ্তপ্রায় জাতীয় সম্পদ সম্পর্কে নানা তথ্য দিয়েছেন এবং এদের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মহৎ কর্মটি সম্পাদিত করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়নি।

পরবর্তীকালে সুপরিচিত লোকসংস্কৃতিবিদ্ ও সমাজবিজ্ঞানী বিনয় ঘোষও উৎসাহ নিয়ে পটুয়াদের সম্পর্কে তথ্য বিবরণ সংগ্রহ করেছেন, সেই তথ্য বিবরণটি তাঁর গ্রন্থে[১] লিপিবদ্ধও করে গেছেন। তিনি বীরভূম জেলার ইটাগড়িয়ার বৃদ্ধ সুদর্শন চিত্রকরের কাছে শুনেছেন একদা ঐ জেলায় অন্তত ৫০-৬০টি গ্রামে প্রায় বিশটি পরিবারের অস্তিত্ব এবং পরবর্তীকালে সেগুলির প্রায় অস্তিত্ব অবলুপ্তির সংবাদ। সুদর্শন এই ক্রমাবলুপ্তির দ্রুততা এবং শিল্পচর্চার ক্ষীণতা (স্বল্পতা) বোঝাতে একটি পরিসংখ্যান (যদিও তা ছিল আনুমানিক মাত্র) উপস্থাপিত করেন। বলেছেন, একসময় সমগ্র বীরভূমে ৮০০-৯০০ পটুয়া কর্মরত ছিলেন। পরে ১৯৫৪-৫৫ সালে কর্মরত পটুয়ার সংখ্যা নেমে আসে প্রায় ১০০তে। দ্রুততার চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে সুদর্শন বলেছেন যে, এক সময় (১৯৩০) তাঁর গ্রামে ২৫-৩০ ঘর পটুয়া পরিবার ছিল, সেগুলি এখন (১৯৫৪) অভাব অনটনে প্রায় নির্বংশ — বংশধরশূন্য। পট ও পটুয়া অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পটুয়াদের অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পটশিল্পের অবলুপ্তির কথাও এসে যায়। বিনয় ঘোষ প্রদত্ত তথ্যও আজকের নয়, ১৯৫৪-৫৫ সালের কথা। পটুয়া বংশের ক্রমাবলুপ্তি অব্যাহত থাকে। ১৯৬৯-৭০ সালে, সেই সংখ্যা আরও ক্ষুদ্র হয় — ১০০ পরিবারের পরিবর্তে সাকুল্যে মাত্র ১০০ জন। পটুয়াবৃত্তি পালকের সংখ্যা নিঃসন্দেহে বলা যায়, ভয়াবহ দ্রুততায় কমে যাচ্ছে। পটুয়া বংশের এই ক্রমাবলুপ্তি -— ভবিষ্যতের অশুভ সংকেত বাংলার অন্যান্য জেলাতেও সমানভাবে চোখে পড়ে। পটুয়া সম্প্রদায় ধ্বংস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পট শিল্পের দিনও শেষ হল। প্রদ্যোৎ ঘোষ লিখেছেন[২] Pat painting was a hereditary handicraft of the patua families of the patua community. It is but natural, however tragic, that modern civilisation destroyed this articraft as well as the Patua Community. একদা পটুয়া অধ্যুষিত অনেক অঞ্চলে চোখে পড়ে জীর্ণ গৃহ কিংবা বাস্তুভিটার ধ্বংসাবশেষ মাত্র। সে বড় করুণ দৃশ্য! করুণ অবক্ষয়!

এই শিল্পের অবক্ষয় শুরু হয়েছে অনেক আগে। যখন ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের ফলে ইংরেজ বণিকের বাণিজ্যতরী নানা নয়নমনোহর শিল্পসম্ভার নিয়ে এদেশের তীরে উপস্থিত হয়; ইংরেজ শাসক সেসব শিল্প দ্রব্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে এদেশের গ্রামীণ শিল্পের ধ্বংসসাধনে উদ্যত হয়, তখন থেকেই অন্যান্য শিল্পের মতো এই শিল্পেরও ধ্বংস শুরু হয়। বিনয় ঘোষ তাঁর গ্রন্থে[৩] ১৯ শতকের শেষ পঁচিশ বছরে এই শিল্পের ক্ষয় শুরু হওয়ার কথা উল্লেখ করলেও প্রকৃতপক্ষে তারও আগে এর ধ্বংস শুরু হয়েছে, বলা যায়। বলা যায় যে, ১৯ শতকের শেষ থেকে এর অবক্ষয় দ্রুততর হয়েছে এবং বর্তমানে কোনরকমে এই শিল্প টিঁকে আছে। মোটামুটি নির্দিষ্ট সাল, তারিখ উল্লেখ করে এর ধ্বংসের সূচনা নির্দেশ করা যায় না। এর অবক্ষয় যেদিন থেকেই শুরু হোক, এর ধ্বংসের মূলে পূর্বোক্ত কারণ ছাড়াও অন্যান্য আরও গভীর কারণ নিহিত আছে। সেগুলিকে প্রশাসনিক ও বেসরকারি জনসাধারণগত,

পটুয়া ব্যক্তিকেন্দ্রিক—এই তিনটি পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কারণগুলি সুদর্শন চিত্রকর, অন্যান্য চিত্রকর ও অন্যান্য সূত্র থেকে সংগৃহীত।

প্রথমত পূর্বে পটুয়ারা পট আঁকতেন গ্রামে ঘট পটে পূজার প্রচলন যথেষ্ট ছিল বলে, গ্রামের মানুষ সেই সব পট ক্রয় করে পূজা করতেন। এখন হাতে আঁকা ছবির পরিবর্তে ছাপানো ছবি রেখে পূজা সমাপন করা শুরু হয়েছে। দ্বিতীয়ত আগে গ্রামের মালাকার সম্প্রদায় পূজামন্ডপের সাজসজ্জা করতেন, তাঁরাও এখন পূজার পট এঁকে দেন, যে কারণে পটুয়াদের ডাক পড়ে না। তৃতীয়ত মেলার সংখ্যাল্পতা ও সাধারণ মানুষের রুচির পরিবর্তন। 'বারো মাসে তেরো পার্বণের' এই দেশে এক সময় সর্বত্র অনুষ্ঠিত হতো ছোট বড় অনেক বেশি মেলা, যেগুলিতে পটুয়ারা নানা দেবদেবীর পটচিত্র, তাঁদের তৈরি কাঠের পুতুল ইত্যাদি বিক্রি করে কিংবা পট দেখিয়ে গান করে অর্থ রোজগার করতেন। নানা কারণে আজকাল মেলার সংখ্যাল্পতা দেখা গিয়েছে। তাছাড়া, এখনকার মেলাগুলিতে প্লাস্টিকের পুতুল ও সস্তা, মুদ্রিত চিত্রের আমদানি হওয়ায় পটুয়াদের পুতুল ও আঁকা ছবির চাহিদা নেই বললে চলে। এবং মেলায় সার্কাস, ভিডিও সিনেমার আকর্ষণ এড়িয়ে পটচিত্র ও পটসঙ্গীতে কজনই বা আকর্ষণ অনুভব করেন? এই সব কারণে পটুয়াদের রোজগার নেই বললেই চলে। ফলে পটশিল্প চর্চা কী করে অব্যাহত থাকে? পটুয়াদের অস্তিত্ব ও বিকাশই বা কী করে সম্ভব? চতুর্থত গ্রামের সাধারণ মানুষের দারিদ্র বৃদ্ধি অন্যতম কারণ। গ্রামে সাধারণত খেটে খাওয়া, স্বল্পবিত্ত মানুষের বাস অধিক। তাঁদের পটচিত্র ক্রয় করবার অর্থাৎ পারিশ্রমিক দেবার ক্ষমতা কিংবা পট দেখবার মানসিকতা হ্রাস পাওয়ায় পট শিল্পের চাহিদা কমে গেছে। পঞ্চমত জেলা শহর বা অন্যান্য বাণিজ্যকেন্দ্র বৃদ্ধি হওয়ায় শহরের সঙ্গে নিত্য নতুন যোগাযোগের ব্যবস্থা হওয়ায় শহরের ফ্যাসানকেন্দ্রিক সংস্কৃতির চর্চা শুরু হওয়ায় গ্রামীণ পটশিল্পের প্রতি মানুষের আকর্ষণ কমে গেছে। ষষ্ঠথ দেশের কোনো কোনো অঞ্চলের মানুষের ধর্মীয় গোঁড়ামি বা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা পট শিল্পের করুণ পরিণতি সৃষ্টি করেছে। মেদিনীপুরের দাঁতন-কেশিয়াড়ি অঞ্চলের মৌলবাদী কিছু মুনসী মুসলমান পট শিল্পী গায়কদের হিন্দু দেবদেবী বা হিন্দু সম্প্রদায়ের কোন বিষয় বা ঘটনাকেন্দ্রিক পট ও গান রচনায় বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন।[8] সামাজিক বয়কটও করেছেন। এ ব্যাপারে মুন্সীরা পটুয়াদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। ফলে ভীত, দরিদ্র মুসলমান পটুয়ারা পট চিত্রগুলি গোপন করে ফেলেন। আবার পটগুলি সম্পূর্ণ নষ্ট করে ফেলাও সম্ভব হয়নি বলে তাঁদের তীব্র এক মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করতে হয়েছে। সেই সঙ্গে তাঁদের রুজি রোজগার বন্ধ হওয়ায় অবর্ণনীয় দারিদ্রের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই ধর্মীয় ও সামাজিক সংকীর্ণতা — যা দেশের অন্যত্রও হয়তো লঙ্ঘিত হয় — পটুয়াদের জীবনে যে আর্থিক ও মানসিক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে উঠেছে তা কার্যত পটশিল্পকে অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। সপ্তমত পটুয়াদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না হওয়ায় পটুয়ারা জীবন-জীবিকার সন্ধানে শহরমুখী হতে বাধ্য হয়েছে। শহরও তাঁদের আর্থিক দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে — নানা প্রলোভনের জাল বিস্তার করে এবং সব শেষে গ্রাস করে। শহরমুখী হয়েছেন তাঁরা, কারণ পটের ক্রেতা শহরের মানুষ, কিছু শিল্পরসিক বিদেশী। সুযোগসন্ধানী, মুনাফাবাজ ব্যবসায়ী

পঁচিশ পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে পট কিনে নিয়ে অধিক মূল্যে বিদেশীদের কাছে বিক্রি করে। ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নগদ টাকা পাওয়ার প্রলোভনে পটুয়ারা সম্ভবত কাগজে নিম্ন মানের পট আঁকতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। পটুয়াদের কাছে শিল্পের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে অর্থ। মেদিনীপুর জেলার নয়ার অধিকাংশ পটুয়ার একমাত্র লক্ষ্য আজ, যেকোনোরকমের একখানা পট এঁকে তা শহরের মানুষ কিংবা বিদেশীদের কাছে বিক্রি করা। আর্থিক লাভের দিকটা তাঁদের চোখে এখন এত বড় হয়ে উঠেছে যে, নয়ার পটুয়াদের সম্মিলিত হয়ে পট দেখানো ও গান শোনানোর প্রস্তাব শুনে তাঁরা বলে ওঠেন 'আমাদের কী লাভ হবে? কিছু পট কি বিক্রি করা যাবে?'

সত্যই পটুয়াদের আজ অর্থের বড় প্রয়োজন; কিন্তু পট শিল্পের গরিমাময় ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে কিছুটা ত্যাগ ও সাধনার প্রয়োজন সে কথা ভুললে চলবে না। ত্যাগ তিতিক্ষা ও সাধনা না থাকলে কোনো শিল্পেরই অস্তিত্ব থাকে না। শিল্পীসত্তা হারিয়ে শিল্পী হয়ে পড়েন অদক্ষ কারিগর মাত্র। বর্তমানে এ ঘটনা সহজদৃষ্ট। রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় তার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন —"কিছুটা আর্থিক আনুকূল্য আসতে থাকলেই ব্যাপারটা আর চর্চার মধ্যেই থাকে না। পোটোদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।" সর্বক্ষেত্রে এই মন্তব্য প্রযোজ্য না হলেও অনেক ক্ষেত্রে কথাটি সত্য মনে হয়। প্রশাসন বা সরকারি ঔদাসীন্য ও অবহেলা এই শিল্পের ধ্বংস বা অবনতির জন্য অনেকাংশে দায়ী। এই শিল্প অনেক আগে সরকারি অনুদান বা আর্থিক সাহায্য লাভ করতো। এখন তা থেকে বঞ্চিত। এঁরা সরকারি অনুদানের জন্য আবেদন করে থাকেন বারংবার, কিন্তু পরিণাম শুধু হতাশা। এই সূত্রে উল্লেখ্য কালীঘাটের প্রবীণ পটশিল্পী শ্রীশচন্দ্র পাল ১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন এবং শিল্পটিকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করেন। তিনি সরকারের কাছে উপযুক্ত সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা, শিল্পীদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করতে আবেদন জানিয়েছিলেন। তাঁর মতে 'এ ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে পটশিল্প আগামী দিনে চিরকালের মতো হারিয়ে যাবে।'

লোকায়ত গ্রামবাংলার ঐতিহ্যপূর্ণ পট শিল্পকে দুর্গতির অন্ধকার থেকে আলোয় প্রতিষ্ঠিত করতে যথেষ্ট সরকারি আর্থিক বদান্যতা, সহানুভূতি ও সাংস্কৃতিক মনোভাব সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। সেই সঙ্গে বেসরকারি সাহায্য ও সহানুভূতিরও প্রয়োজন। সর্বাগ্রে সরকারি সুপরিকল্পনা ও তার সুষ্ঠু প্রয়োগ প্রয়োজন। প্রথমত অবহেলিত এই শিল্পের প্রতি সাধারণ মানুষের আকর্ষণ বৃদ্ধি করতে সরকারি প্রচার মাধ্যমগুলি — রেডিও, টেলিভিশন, প্রচার বিভাগ ডি.এ.ভি.পি. প্রভৃতি গণমাধ্যমকে যথেষ্ট সক্রিয় হতে হবে। আজকাল দূরদর্শন, রেডিও প্রভৃতি গণমাধ্যম সচেষ্ট হওয়ায় এর সম্পর্কে সাধারণ মানুষের যেমন ধারণা বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি কৌতূহলও বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তা সে প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প। দ্বিতীয়ত বাংলার এই নিজস্ব সম্পদটিকে সারা ভারতের মানুষের কাছে সুপরিচিত ও সমাদৃত করা দরকার। বিভিন্ন প্রদেশের মানুষের কাছে এর গভীর আবেদন পৌঁছে দিতে হবে। বিভিন্ন প্রদেশের মানুষের যাতে এই শিল্প সম্পর্কে কৌতূহল বৃদ্ধি পায় সে ব্যবস্থা করতে হবে সরকারি গণমাধ্যমগুলিকে। তৃতীয়ত উন্নত বিপনন ব্যবস্থার মাধ্যমে এই শিল্প এবং এর শিল্পীকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। প্রকৃত অর্থমূল্যের বিনিময়ে সাধারণ লোকে যাতে এগুলি

ক্রয় করতে পারে তাও সরকারের লক্ষণীয় বিষয় হওয়া উচিত। চতুর্থত দুঃস্থ এই শিল্প ও শিল্পীদের সাময়িক ও দীর্ঘস্থায়ী আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করা দরকার। শিল্পীরা অর্থাভাবে শিল্পোকরণ ক্রয় করতে পারেন না কিংবা উপযুক্ত উপকরণ যোগাড় করাও সম্ভব হয় না। পঞ্চমত এক বা একাধিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা দরকার। সেখানে প্রশিক্ষক উপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভ করবেন। ছাত্র-ছাত্রীদের আকৃষ্ট করার জন্য আর্থিক সাহায্যও দেওয়া প্রয়োজন। এর ফলে বর্তমানে পটুয়া শিল্পীদের ছবি আঁকায় ও সঙ্গীত পরিবেশনে অনুশীলনের যে অভাব প্রকটিত হয়েছে তা খানিকটা হলেও কমবে। ষষ্ঠথ দেশের বিভিন্ন স্থানে যে সব বড় বড় মেলা বসে সেখানে এই শিল্প যাতে যথাযোগ্য সমাদর লাভ করে, বিপননের সুব্যবস্থা করা যায় সেদিকেও যথেষ্ট নজর দেওয়া দরকার। শহরে শুধু পটুয়া মেলাও করা যেতে পারে। সপ্তমত পটুয়াদের সহজ কিস্তিতে ঋণ পরিশোধনের সুযোগ সহ ব্যাঙ্ক ঋণের ব্যবস্থা করলে ভালো হয়। অষ্টমত পটশিল্পের প্রসার ও উন্নতিকল্পে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা করা দরকার। নবমত পটুয়া শিল্পীদের সম্মেলন করে তাদের অভিযোগগুলি কিংবা অসুবিধাগুলি যথাযথ নথিভূক্ত করে সেগুলির প্রতিকার করলে মঙ্গ ল হয়। দশমত পটশিল্পকে সরকারি ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প নিগমের অন্তর্ভুক্ত করলেও মঙ্গ ল হয়। একাদশ পুরাতনী ঐতিহ্যকে আশ্রয় করেই বর্তমানের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা — পণপ্রথা, নারী নির্যাতন, এড্স সচেতনতা, গ্রামীণ স্বাস্থ্য, সেচ ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে ছবি আঁকা ও গান পরিবেশনের দিকে পটুয়াদের আকৃষ্ট করতে হবে। গ্রামের মানুষের দৈনন্দিন যন্ত্রণার কথা পটুয়ারা ঠিকমত উপস্থাপিত করতে পারলে পটুয়ারা আবার সুদিনের মুখ দেখবেন। দ্বাদশ একা একা নয় পটুয়ারা যদি ৩-৪ জন করে দল বেঁধে গ্রামে ঘোরেন তবে রোজগার বেশি হওয়ার সম্ভাবনা। ত্রয়োদশ গ্রামের ধনী মানুষদের একটু উদার এবং সৌখীন হতে হবে। তাঁরা যদি পট কিনে বাড়ি ঘর সাজান তবে পটুয়াদের পট বিক্রি হয়। চতুর্দশ পটুয়াদের সাহায্যের জন্য অবশ্যই কো-অপারেটিভ গড়া দরকার। কো-অপারেটিভের মাধ্যমেই পট বিক্রি এবং ঋণ গ্রহণের সুযোগ থাকবে। সরেজমিন তদন্তে জেনেছি কো-অপারেটিভের উপকারিতার ব্যাপারে পটুয়ারা সচেতন হলেও একতার অভাবে তাঁরা কিছু করতে পারছেন না। পঞ্চদশ দুঃস্থ পটুয়াদের চিকিৎসার জন্য সরকারি স্তরে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা রাখতে হবে। ষোড়শ তাঁত শিল্পের সঙ্গে পটুয়াদের যুক্ত করা যেতে পারে। শাড়িতে যে আল্পনা হয় সেগুলি পটুয়ারা আঁকতে পারবেন। এর ফলে পটুয়ারা কাজ পাবেন। সপ্তদশ পট গানের ক্যাসেট প্রকাশ করার কথাও ভাবা যেতে পারে।

পটশিল্পকে বর্তমান এই দুরবস্থা থেকে উদ্ধার করতে শুধু পরিকল্পনা নয়, নিবিড় আন্তরিকতাও প্রয়োজন। অসহায়ের প্রতি করুণা নয়, আন্তরিকতাপূর্ণ হিতসাধনের সদিচ্ছা এই শিল্প ও শিল্পীদের মধ্যে প্রেরণা সৃষ্টি করতে পারে।

◆ সূত্র ঃ সপ্তম অধ্যায় ◆

১. পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (১ম খণ্ড) (১৯৫৭), পৃঃ ৩১০

২. Kalighat Pats : annals and apraisal (1966) p 8

৩. বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব (১৯৮৯) পৃঃ ১২০

৪. পটুয়ারা এখন মৌলবাদী শাসানির শিকার, আনন্দবাজার পত্রিকা (২১.৮.৯০), দীপককুমার বড়পন্ডা

• অষ্টম অধ্যায় •

পটুয়া বা পট-চিত্রকরদের নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয়

ভারতবর্ষের পটুয়া সম্প্রদায় একটি সুপ্রাচীন, সম্প্রদায়বিশেষ। সংখ্যার দিক থেকে, একসময় পটুয়া লক্ষণীয় জনগোষ্ঠী ছিল এবং আজও গুণগত কারণে পটুয়ারা তুচ্ছ কিংবা অবহেলার পাত্র নয়। সেকারণে তাদের প্রাচীন নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং তাদের ধর্মচর্যা, ধর্মকর্ম ইত্যাদি প্রসঙ্গ অনুসন্ধানের বিষয় হওয়া স্বাভাবিক। প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র, ইতিহাস এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থাদি এব্যাপারে আমাদের সহায়ক হতে পারে। পটুয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তি, সমাজে তাদের অবস্থান , মর্যাদা সম্পর্কে প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রগুলির বক্তব্য সর্বাগ্রে লক্ষ্য করা যাক।

মনু, বোধায়ন প্রভৃতি শাস্ত্রকারদের গ্রন্থ দেখে মনে হয়---ধর্মসূত্র এবং স্মৃতিশাস্ত্রগ্রন্থের গ্রন্থকারগণই আদিযুগে সমাজে বর্ণাশ্রম প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটি প্রধান-অপ্রধান বর্ণগুলি নিয়ে ভারতবর্ষীয় সমাজের মোটামুটি দেহরূপ গঠন করেছিলেন। এদের বাইরেও যেসব বর্ণ, কোম্ ছিল, তাদের কথা ভাবা হয় নি। আমাদের বাংলার চিত্র অন্যরকম। বহুকাল আগে থেকেই বাংলায় আর্যপ্রভাব ছড়িয়ে পড়লেও, একাদশ শতক থেকেই স্মৃতি-শাস্ত্রকারগণ সচেতনভাবে—শাস্ত্রানুযায়ী এদেশের সমাজব্যবস্থাকে ভারতবর্ষীয় বর্ণবিন্যাসের কাঠামোর মধ্যে বাঁধবার চেষ্টা করেন। এই সূত্রে উল্লেখ করা যায় যে, বৃহদ্ধর্ম, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রভৃতি কিছু স্মৃতিগ্রন্থ একাদশ শতকে রচিত হয়। অবশ্য, কোনো প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থই বাংলায় রচিত হয় নি। তবে গ্রন্থাকারগণ যে, প্রাচীন বাংলা সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন এমন অনুমান অমূলক নয়। অনুমানের পক্ষে যুক্তি এই যে, স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ এদেশের বৈদ্য, কায়স্থ, কেবর্ত প্রভৃতি ব্রাহ্মণেতর সংকর সম্প্রদায়ের জন্মসূত্রে নানা বর্ণ-সংমিশ্রণ সংক্রান্ত আনেক কাহিনী লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

উপপুরাণ 'বৃহদ্ধর্ম' যা আনুমানিক ১১-১২শ শতকে বাংলার সেন-বংশীয়দের রাজত্বকালে রচিত হয় এবং যেখানে বাংলার একচল্লিশটি বর্ণ-উপবর্ণের উল্লেখ আছে, সেখানে পটুয়া সম্প্রদায়ের কথা অনুল্লিখিত থাকলেও, তার সমকালীন ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ-এর ব্রহ্মখণ্ডের ১০ম পরিচ্ছেদে ১৬-২১ এবং ৯০-১০৭ শ্লোকের মধ্যে ব্রাহ্মণেতর বর্ণগুলিকে শূদ্র বর্ণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেখানে শূদ্র বর্ণকেই 'সংকর' বর্ণ বলা হয়েছে। আবার, সংকর বর্ণীয়দের 'সৎ' এবং 'অসৎ' এই দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। চিত্রকরদের সংকর বর্ণের এবং 'অসৎ' শূদ্র পর্যয়িভুক্ত করা হয়েছে। এই গ্রন্থে ঘৃতাচীর উপাখ্যানে চিত্রকর গোষ্ঠীর উদ্ভব সম্পর্কে একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। সেটাই কিংবদন্তী।

চিত্রকর গোষ্ঠী পটুয়াদের আদিপুরুষ ছিলেন, পৃথিবীতে ছদ্মবেশে নেমে আসেন দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা। সমকালে স্বর্গের অপ্সরা ঘৃতাচী গোপকন্যারূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

এই বিশ্বকর্মা ও ঘৃতাচীর ন'টি সন্তান — মালাকার (মালাকর), কর্মকার, কুন্দিবক (তন্তুবায়), কুম্ভকার (কুমোর), কংসকার, সূত্রধর, চিত্রকর এবং স্বর্ণকার। এঁরা ব্রাহ্মণ বিশ্বকর্মার সন্তান ছিলেন বলে, এঁরা হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত এবং হিন্দুসমাজে সম্মানের পাত্র ছিলেন। বলাবাহুল্য, চিত্রকরের ভাগ্যে বৈপরীত্য ছিল না। কিন্তু ভাগ্যদোষে একসময় তার উত্তরাধিকারীরা সমাজচ্যুতির বিড়ম্বনায় বিড়ম্বিত হন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে অবশ্য তার কারণও উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এঁরা বুদ্ধিদোষবশতঃ কর্মদোষে ব্রাহ্মণকুল-নির্দেশিত চিত্ররচনা পদ্ধতি পরিত্যাগ করেছিলেন। কর্মদোষে তাঁরা অভিশপ্ত হলেন এবং তখন থেকে সমাজে 'পতিত' হলেন। বস্তুত ইতিহাসেও দেখা যায় যে, ৭ম-৮ম শতক থেকে অর্থাৎ যখন থেকে বাঙালী সমাজ ক্ষুদ্রশিল্প ও কৃষিনির্ভর হয়ে উঠেছিল, তখন থেকে সমাজের অর্থ-উৎপাদক শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর সামাজিক মর্যাদা হারানোর দুর্গতি শুরু হয়েছিল। আর হাতের কাজ ছিল যাদের জীবিকা, তাঁরাও সমাজের নিম্নতম স্তরে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। কম-বেশি এই পরিস্থিতি ছিল উত্তর-মধ্য ইত্যাদি সারা ভারতে।

ঐতিহাসিক সত্য এই যে, ব্রাহ্মণ্য ধর্মসংস্কার শাসিত-সমাজে ব্রাহ্মণদের ছিল প্রাধান্য। তাঁরা কারণে-অকারণে অ-ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীগুলিকে সমাজচ্যুত করতেন। রাষ্ট্রও এ ব্যাপারে পিছিয়ে থাকে নি। গুপ্ত-পাল বংশের রাজত্বকালে হয়তো এমন ঘটতো। সেন বংশের রাজত্বেও এমন ধারা অব্যাহত ছিল। বল্লালচরিত গ্রন্থ থেকে জানা যায়, বল্লাল সেন সোনা চুরির অপরাধে ক্রুদ্ধ হয়ে সুবর্ণবণিকদের 'পতিত' করে শূদ্রের পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছিলেন। অপর শাস্ত্রকার পরশুরাম-এর রচনায়ও নির্দিষ্ট চিত্ররচনা পদ্ধতির বৈপরীত্যে ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজের ক্রোধের উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়। সেখানে আছে—

ব্যতিক্রমেণ চিত্রানাং সদ্যশ্চিত্র করস্তথা।
পতিতো ব্রহ্মশাপেন ব্রাহ্মণাঞ্চ কোপতঃ।।

সেন বংশীয় রাজা বল্লালসেনের শিক্ষাগুরু গোপাল ভট্ট-এর বল্লালচরিত-এ সমাজের বিভিন্ন বর্ণের উৎপত্তির কাহিনী স্বল্পপরিসরে পাওয়া যায়। আনন্দভট্ট-এর গ্রন্থেও সমাজের বিভিন্ন বর্ণের উৎপত্তি সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা যায়। এসব গ্রন্থের সাক্ষ্যে পটুয়া সম্প্রদায়ের প্রাচীন অস্তিত্ব, সমাজের নিম্নস্তরেই লক্ষ্য করা যায়।

পটুয়াদের সমাজবিচ্যুতির কথা, সারা বাংলার পটুয়ারা আজও স্বীকার করেন। পূর্ববর্তী গবেষকগণের অনুসন্ধান থেকেও জানা যায় যে, অর্ধশতক পূর্বেও পটুয়ারা সমাজবিচ্যুতির ঘটনা স্বীকার করতেন। গবেষক গুরুসদয় দত্ত তাঁর গ্রন্থে' জানিয়েছেন যে, ছবিলাল চিত্রকর (গ্রাম-পানুড়িয়া, বীরভূম) বলেছেন, দেবাদিদেব মহাদেবের অভিশাপে পটুয়ারা সমাজচ্যুত হন। সমাজচ্যুতির কারণ ছিল অলৌকিক—মহাদেবের বিনানুমতিতে পটুয়াদের কোনো এক পূর্বপুরুষ কর্তৃক মহাদেবের চিত্রাঙ্কনকালে হঠাৎ মহাদেবের আবির্ভাব ঘটলে চিত্রকরটি ভয়ে তার তুলিটি মুখে পুরে এঁটো করে ফেলে। এই অপবাধে মহাদেব কর্তৃক অভিশপ্ত হয়ে সমাজচ্যুত হন। তবে শেষ রক্ষা হয়—পটুয়াদের অনুরোধে মহাদেব তাঁদের জীবিকা ও ধর্ম নির্দ্ধারণ করে দিলেন। তিনি বললেন—তোরা মুসলমানের রীতি করবি, হিন্দুব কর্ম করবি। সেই থেকে মুসলমানের মতো নামাজ পড়ে, হিন্দুর মতো দেবদেবীর ছবি আঁকে ও তাঁদের

নিয়ে গান করে পটুয়ারা। ভক্তি, হরেন্দ্র, পঞ্চানন ইত্যাদি নামকরণ করা হয় হিন্দুদের মতো। গুরুসদয় দত্ত, সমাজে পটুয়াদের 'পতিত' হবার কারণ এবং পটুয়াদের ধর্ম ও জীবিকার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পটুয়ার মুখ থেকে শোনা, শ্রুতিনির্ভর কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন এবং হয়তো বিশ্বাসও করেছেন। তিনি কাহিনী লিখেছেন মাত্র, কিন্তু সে-কাহিনীর সত্যাসত্য বিচার করেন নি কিংবা এর বাস্তব সামাজিক ভিত্তি সম্পর্কে কোন প্রকার মতামত ব্যক্ত করেন নি। মনে হয়, মহাদেবের অভিশাপে নয়, সমাজের মুখপাত্র ব্রাহ্মণগোষ্ঠী কিংবা শাসকগোষ্ঠীর অভিরুচিতেই তাদের সমাজ-বিচ্যুতি ঘটেছিল এবং সমাজবিচ্যুতির পরিণামে সামাজিক অবহেলা ও বঞ্চনার পরিণামে ধর্মান্তর ঘটেছিল। কিন্তু জীবিকা যেহেতু দ্রুত পরিবর্তনীয় নয়—দীর্ঘকালব্যাপী পুরুষানুক্রমিক ব্যাপার, সেহেতু তা অপরিবর্তিতই থেকে গেছে। পটুয়াদের উৎপত্তির জনশ্রুতি শুধু বাংলার পটুয়ারা নয়, সমগ্র ভারতের পটুয়ারাও বিশ্বাস করেন। বিশ্বকর্মার সন্তান-মর্যাদা, শিবের অভিশাপ প্রাপ্তি—এ দুটি ঘটনা অলৌকিক ও অবিশ্বাস্য হলেও জনশ্রুতির ব্যাপকতা তত্ত্বে ব্যাপক বিশ্বাস লক্ষ্য করা যায়। যদি প্রথমোক্ত জনশ্রুতি স্বীকার করা হয়, তাহলে বলতে হয় যে, তারা হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দ্বিতীয় জনশ্রুতি—শিব কর্তৃক অভিশাপ দান, পটুয়াদের ধর্মান্তর গ্রহণের দিকেই ইঙ্গিত করে।

অপর এক লোকসংস্কৃতিবিদ বিনয় ঘোষ, তাঁর গ্রন্থে[২] পটুয়াদের সমাজবিচ্যুতি, জীবনচর্যা, জীবিকা, ধর্মাধর্ম প্রসঙ্গে তাঁর ক্ষেত্রভিত্তিক পর্যবেক্ষণে গুরুসদয় দত্তের প্রায় অনুরূপ প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। বিনয় ঘোষ জানিয়েছেন, তিনি বীরভূমের ইটাগড়িয়া গ্রামের বৃদ্ধ সুদর্শন চিত্রকর-এর মুখে শুনেছেন যে, পটুয়াদের কোনো পূর্বপুরুষ ব্রাহ্মণের দ্বারা অভিশপ্ত হন। তবে অভিশাপের কারণ সুদর্শন জানান নি। সুদর্শন আরও বলেছেন যে, পটুয়ারা আগে নামাজ করতেন না, নিজেদেরকে হিন্দু ভাবতেন, কিন্তু হিন্দুরা ঘৃণা করতেন, সমাজে স্থান দিতেন না। পরবর্তীকালে পটুয়ারা অভিমানে ধর্মান্তরিত হন। তবে নামাজ ছাড়া তাঁদের বাকি সব আচার হিন্দুর মতো—হিন্দু দেবদেবীর পূজার্চনা, ছবি অঙ্কন ইত্যাদি। এমনকি পটুয়াদের মেয়েরা শাঁখা-সিঁদুরও ব্যবহার করেন। পটুয়ারা নিজেদেরকে বিশ্বকর্মার বংশধর ভাবেন, কিন্তু অনেকে বিশ্বকর্মার পূজা করেন না। তা থেকে আমাদের মনে হয় বিশ্বকর্মা-ঘৃতাচী সম্পর্কিত অলৌকিক জন্ম-বৃত্তান্তটি কাল্পনিক, তবে ব্রাহ্মণ কর্তৃক অভিশপ্ত হবার ব্যাপারটি কিছুটা বাস্তবসম্মত। বাংলার বর্মণ বংশীয়দের রাজত্বকালে ভবদেব ভট্ট ছিলেন সামাজিক আদর্শের ও বর্ণবিভাগের প্রতিনিধি। তিনি ব্রাহ্মণদের চিত্রচর্চা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছিলেন। তা করলে সমাজে পতিত হতে হতো। তাছাড়াও, তখন হাতের কাজ-জানা শিল্পীগোষ্ঠী সমাজে মর্যাদা লাভ করতো না। দীর্ঘকাল ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির সঙ্গে পটুয়াদের যোগ ছিল না বলে হয়তো অসৎ শূদ্র পর্যায়ে নামানো হয়ে থাকতে পারে। এমন ঘটনা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সেকালে রচিত কোনও কোনও গ্রন্থে। মনু তাঁর গ্রন্থে বলেছেন, 'কিরাত' গোষ্ঠী একসময় ক্ষত্রিয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত থাকলেও শুধু ব্রাহ্মণদের সঙ্গে দীর্ঘ সংশ্রবহীনতার কারণে তাদেরকে 'অসৎ শূদ্র' পর্যায়ে নামানো হয়েছিল। পটুয়াদের ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটে নি—একথা কে বলবে?

পটুয়াদের জীবনে সমাজবিচ্যুতির ঘটনা গুরুসদয় ও বিনয় ঘোষ উভয়েই উল্লেখ

করেছেন, তবে অভিশাপদাতা ভিন্ন ভিন্ন। নামাজ পাঠ, জীবিকার জন্য হিন্দু দেবদেবীর চিত্রাঙ্কন ও মাহাত্ম্য গান এবং জীবনচর্যা বিষয়ে উভয়েই প্রায় এক কথা বলেছেন। ইসলাম ধর্মরীতি পালনে সামাজিক অবজ্ঞার ব্যাপারটি জানা যায় শুধু বিনয় ঘোষের কলম থেকে। মনে হয়, সামাজিক অবজ্ঞাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কারণ। ধর্মান্তর গ্রহণ ঘটেছে মুসলমান শাসনের সময়। প্রদ্যোৎ ঘোষও তাঁর গ্রন্থে[৩] এমন ধারণা ব্যক্ত করেছেন।

আবার কোনো কোনো লোকসংস্কৃতিবিদ্ পটুয়াদের অনার্য সংশ্রব অনুভব করেছেন। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁদের অন্যতম। তিনি তাঁর গ্রন্থে[৪] বলেছেন, 'চিত্রাঙ্কন ব্যতীত পটুয়াগণ আরও দুই একটি বৃত্তি পালন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে, তাহা হইতে ইহাদের অনার্য সংশ্রব আরও সুস্পষ্ট অনুভব করা যাইবে।' তাঁর যুক্তি এই যে, কোনো কোনো অঞ্চলে পটুয়ারা সাপুড়ে ব্যবসাও করে। এবং সাপুড়ে ব্যবসায় কুলক্রমাগত— দীর্ঘ অনুশীলন সাপেক্ষ। অর্থাৎ সাপুড়ে বৃত্তি পটুয়াদের কৌলিক বৃত্তি।

বিদেশী লোকসংস্কৃতিবিদ্ ড. রিসলেও তাঁর গ্রন্থে[৫] পটুয়াদের অনার্য-সংস্রব স্বীকার করেছেন। তিনি ধারণা করেছেন বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলে আজও 'মাল' নামে পরিচিত সাপুড়েরা, যারা আর্যেতর জাতির বংশধর, তারা পটুয়া জাতিরই শাখা বিশেষ। তাঁর ধারণা যে, সর্পদেবী মনসার বৃত্তান্ত চিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শন করাই ছিল পটুয়াদের উদ্দেশ্য; ক্রমে ক্রমে তারা অন্যান্য বিষয় নিয়ে পট অঙ্কন ও প্রদর্শন করতে থাকে। বিনয় ঘোষও বলেছেন 'বাংলার পশ্চিম প্রান্তের পটিদাররা এই অঞ্চলের উপজাতীয় জনসমষ্টিরই যেমন সাঁওতাল বা ঐ ধরনের অন্যান্য উপজাতির বংশধর।'[৬] তাঁর এমনতর ধারণার ভিত্তি, সাঁওতালদের উৎপত্তি সম্পর্কিত পটচিত্র ও চক্ষুদানপট। তিনি অবশ্য অন্যান্যদের মতো বৃত্তি বিচার করে নয়, পট বিচার করেই জাতি বিচার করেছেন।

আমাদেরও মনে হয়, পটুয়াদের ছিল অনার্য সংস্রব; পটুয়ারা ছিলেন অনার্য আদিবাসী। তারপর কালক্রমে প্রাচীন হিন্দুদের আদিবাসী ধর্মান্তরকরণের পর্বে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় সমাজের নিম্নতম বর্ণের মধ্যে তাদের অন্তর্ভুক্তি ঘটে। হিন্দুরা তখনই তাদের চিত্রাঙ্কন জীবিকা নির্দিষ্ট করে দেয়। এই সূত্রে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ বর্ণিত ৪১টি জাতের মধ্যে অন্যতম জাত বলে তারা চিহ্নিত হয়। তারপর কালক্রমে সমাজবিচ্যুত হয়ে তাদের কেউ কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে; কেউ কেউ আদিবাসী জীবনের সাপুড়ে বৃত্তি গ্রহণ করে; কেউ কেউবা শিল্পী ও কারিগরী বাধায় প্রাক্-হিন্দু আদিবাসী জীবনধারাকে অনুসরণ করতে থাকে। এসব দিক বিচার করে ড. ভট্টাচার্যের অনুভবটি এবং অন্যান্যদের মতামত মেনে নিতে আমাদের বাধা নেই।

এইরকম পট-বিচার করে দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ও পটুয়াদের জাতিবিচার করেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে[৭] বীরভূমের যমপটুয়ারা আদিতে সূর্য উপাসক আর্য এবং পরবর্তীকালে 'হিন্দু সমাজ নিঃসৃত' বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত, মনে করেছেন। দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সিদ্ধান্তকে বিশ্বাসযোগ্য করবার জন্য জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থের[৮] সাহায্য নিয়েছেন। জিতেন্দ্রনাথ বলেছেন—সূর্য প্রাচীন আর্যদের দেবতা; তিনি বিশ্বকর্মা বিশ্বস্রষ্টা। এই সূর্য ও যম অভিন্ন বা যম সূর্যের অংশ, তিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের সমন্বয়। তিনি দেবতাদের পুরোহিত, মহাকাব্য

ও পুরাণের যুগেও তাঁর অস্তিত্ব ছিল। দেবাশিসের ধারণা প্রাচীনকালে যে সূর্য উপাসক সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল ভারতে, যমপটুয়ারা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সেই সৌর উপাসক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। দেবাশিস আরও জানিয়েছেন যে, পটুয়ারা তাঁদের যম পটে যমকে শ্রদ্ধার সঙ্গে সুনির্দিষ্ট স্থান দিয়ে কার্যত নিজেদেরকে সৌর উপাসক-সম্প্রদায়ের সঙ্গে অভিন্ন বলে প্রমাণ করতে চান। এবং বৃহৎ সংহিতার 'প্রতিমালক্ষণ' অধ্যায়ে সূর্যের পরিধানে কুর্তা ও পদ-আবরণী জুতা, পটুয়াদের যমমূর্তিতেও লক্ষ্য করা যায়। দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় পটুয়াদের প্রাচীন আর্যত্ব, প্রাক্ এবং বৌদ্ধ অস্তিত্ব প্রমাণ করতে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের আশ্রয় নিয়েছেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য-এর মহামন্ত্রী কৌটিল্য, সম্রাটের গুপ্তচর হিসাবে যমপট্রিকদের নিযুক্ত করেছিলেন এই ভেবে যে, তারা প্রাক্-মৌর্য যুগের এবং দেশবাসীর কাছে সুপরিচিত হওয়ায় তাদের দ্বারা গুপ্তচরবৃত্তি সহজতর হবে। দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় পটুয়াদের আর্যত্ব এবং প্রাক্-বৌদ্ধ-অস্তিত্ব প্রমাণে যেমন সচেষ্ট হয়েছেন তেমনি যমপট্রিকদের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বন ব্যাপারটিও স্বীকার করেছেন। বলেছেন যমপটের শেষভাগে থাকে যম ও যমপুরীর নিয়মনিষ্ঠ অবস্থান, কিন্তু যমপট শেষ হয় বুদ্ধদেবরুপী জগন্নাথ সেই সঙ্গে বলরাম ও সুভদ্রার মাধুর্যমণ্ডিত চিত্রের মধ্য দিয়ে। তাঁর ধারণা পটুয়াদের একাজটি বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা সৃষ্টির প্রয়াস। বিনয় ঘোষও মনে করেন চিত্রকর গোষ্ঠী বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তা ঘটেছিল ইসলাম ধর্মগ্রহণের বহু পূর্বে। এবং বীরভূমের সুদর্শন চিত্রকরের মুখ থেকে শোনা পটুয়াদের দ্বারা ধর্মরাজ অর্থাৎ যমের সাড়ম্বর পূজা আয়োজন চিত্রকর গোষ্ঠীর সঙ্গে যমের গভীর সম্পর্ক প্রমাণ করে।

পটের প্রকার বিচার করে জাতিবিচারে অগ্রসর হলে একদেশদর্শিতা দোষ ঘটবার প্রবল সম্ভাবনা, আমরা বৃত্তি অনুযায়ী পটুয়াদের অনার্য-সংশ্লিষ্ট আদিম সম্প্রদায় অনুভব করছি। তবে ধর্মে কর্মে পটুয়ারা যাই হোক্ সরকারি রিপোর্টে বলা হয়েছে They belong to Bediya Community এবং সাধারণ মানুষের কাছে এরা শিল্পীর জাত বলেই পরিচিত।

পটুয়ারা হিন্দু না মুসলমান? এ প্রশ্ন শোনা মাত্রই মেদিনীপুর জেলার ঠেকুয়াচকের অজিত চিত্রকর গেয়ে উঠলেন—

হাবিল পড়িল শাস্ত্র কাবিল কোরাণ
তাহা হতে সৃষ্টি হল হিন্দু মুসলমান।

তিনি ব্যাখ্যা করলেন এইভাবে—হাবিল, কাবিল দু'ভাই। হাবিল হিন্দু, কাবিল মুসলমান। আকালি এদের ছোট বোন। হাবিলের পরে গাছ বিবি তারপর কাবিল, তারপর আকালি মা। হাবিল আকালি মাকে বিয়ে করে। কাবিল বিয়ে করল গাছ বিবিকে। আকালি মা দেখতে সুন্দর। গাছ বিবি দেখতে খারাপ। শয়তান এসে কাবিলকে তিরস্কার করল। তুই বোকা, বিশ্রী মেয়েকে বিয়ে করলি কেন? তোর বড় ভাই সুন্দর মেয়েকে বিয়ে করল। সংঘর্ষ বাধল। ছোট ভাই মারা গেল। চিন্তায় পড়ল বড় ভাই। বড় ভাই কাঁদতে থাকে ভাবতে থাকে ছোট ভাইয়ের কিভাবে সৎকার করবে? এমন সময় দুটো কাক এল। হঠাৎ তারা মারামারি শুরু করল। মারামারি করতে গিয়ে একটা কাক মারা গেল। তখন জীবিত কাকটা ঠোঁটে করে গর্ত খুঁড়ল। সেই গর্তে মরা কাকটিকে শুইয়ে দিল। সেই থেকে সৃষ্টি হল কবর। বড়

ভাইয়ের তখন চেতনা হলো। সেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করে ছোট ভাইকে কবর দিল। এ হলো পটুয়াদের মুখে তাদের ধর্মীয় ব্যাখ্যা। পটুয়াদের মিশ্র জাতিতত্ত্ব হওয়ায় এদের সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার ও রীতিনীতি বৈচিত্র্যপূর্ণ। জাতিতত্ত্বে মিশ্রণ অর্থাৎ এরা ধর্মে মুসলমান, সংস্কারে হিন্দু হওয়ায়, ধর্মীয়-সামাজিক সংস্কার আচার-আচরণে আধা হিন্দু ও আধা মুসলমানী রীতি লক্ষ্য করা যায়।

পটুয়ারা ধর্মে ইসলাম হলেও হিন্দু দেবদেবীদের নিয়ে পটচিত্র তৈরিতে অভ্যস্ত। অবশ্য এটা শুধু জীবিকার তাগিদে নয়, স্বাভাবিক সামাজিক বিবর্তনের সমন্বয়। সম্প্রতি ভারতের অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল সার্ভে ভারতীয় ৪৬৩৫টি সম্প্রদায় বা লোকগোষ্ঠী সম্পর্কে সমীক্ষা করে দেখেছেন যে, ভারতে ৮৭টি সম্প্রদায় হিন্দু ও শিখ, ১১৬টি সম্প্রদায় হিন্দু ও খ্রিস্ট, ৩৫টি সম্প্রদায় হিন্দু ও ইসলাম, ২১টি সম্প্রদায় হিন্দু ও জৈন এবং ২৯টি সম্প্রদায় হিন্দু ও বৌদ্ধ—এঁরা দুটি করে ধর্ম একসঙ্গে পালন করেন। এই ক্ষেত্রে বাংলার পটুয়ারা কোনও একক বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায় নন।[৯] সামাজিক অবিচারের শিকার হয়ে পটুয়ারা হিন্দু ধর্ম থেকে বৌদ্ধ ধর্ম আবার পরবর্তীকালে উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবে এঁরা ঐতিহ্যকে বিসর্জন দেননি। ইন্দোনেশিয়ার লোকসমাজ যেমন ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়েও পুরনো দেশীয় ঐতিহ্যকে লালন করে চলেছেন।

পটুয়ারা নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন আঞ্চলিক সমাজবন্ধনী গড়ে তুলেছেন। এই সব বন্ধনীর মধ্যে সাধারণত বিবাহাদি সীমাবদ্ধ থাকে। অবশ্য সব সময়েই এই বিধান কঠোরভাবে অনুসৃত হয় না। হিন্দুদের মতো এত কঠোর না হলেও কদাচিৎ বিধানভঙ্গ করেন এঁরা। এই সমাজবন্ধনীকে সম্ভবত বহু পরিবারের সমন্বয়ে গঠিত—সমাজবৃত্তও বলা যায়। কতকগুলি পরিবারকে আত্মীয়তার বন্ধনে বেঁধে রাখে এই সমাজবৃত্ত এবং নিজেদের ঘরানা গুণাবলী রক্ষা করে। বিশেষ ঐতিহ্যগত ও আঞ্চলিক অঙ্কনধারা একইরকম হয়ে যায়। সম্পর্ক স্থাপনের বহু পুরাতন নিয়মের অস্তিত্ব নেই।

পটুয়াদের খুঁট ঃ মুর্শিদাবাদ জেলায় 'ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মুসলমান, বাগ্দী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মতোই বেদিয়া বা পটুয়াদেরও সম্প্রদায়গত ভাগ আছে। এই ভাগকে বলে খুঁট।[১০] প্রতিটি খুঁটের আচরণ পৃথক পৃথক। 'খুঁটে'র বাইরে বিবাহের চল নেই। বেদে, পটুয়া, চিত্রকর ও মাল এদের চার খুঁট। মুর্শিদাবাদের পটুয়াদের গোত্র খুঁজে পাওয়া কষ্টসাধ্য। অবশ্য মেদিনীপুরের নয়াগ্রামের আনন্দ চিত্রকর জানিয়েছেন তাঁদের সকলের গোত্র কাশ্যপ।

পটুয়ারা সামাজিক জীবনে কী কী আচার পালন করেন? পটুয়ারা তার উত্তর দিয়েছেন। জানা গেছে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোন কোন সংস্কার পালন করেন তাঁরা।

সৈঁটরা ঃ শিশু জন্মাবার ৬ দিন পর 'সৈঁটরা' পালিত হয়। চিঁড়া, বাতাসা, কলা, কলম, খাতা থালায় সাজান হয়। একটা পিঁড়া ধুয়ে 'যতন' করে তার উপর রাখা হয় মোমবাতি, ধূপ জ্বালিয়ে সন্ধ্যের সময় রেখে দেওয়া হয়। এর পর ছেলেকে 'আঁতুড় ঘরে' শুইয়ে দেওয়া হয়। (যে ঘরে শিশুর জন্ম হয় ২১ দিন পর্যন্ত তাকে আঁতুড় ঘর বলে)। সকালে চিঁড়া, বাতাসা, কলা প্রত্যেককে বিতরণ করে দেওয়া হয়। সিন্নি হিসেবে সবাই এটা খান। তবে

শিশুর বাবা-মা এই সিন্নি খান না। লোকবিশ্বাস যে, এই সিন্নি বাবা-মা খেলে শিশুর 'ভাগ্য খাওয়া' হয়। কারণ, বিধাতা ঐ থালায় 'কলম মেরে' দিয়েছেন।

২১ দিনের অনুষ্ঠান ঃ ২১ দিনের মধ্যে শিশুর মাথা ন্যাড়া করা হয়। এই দিন মা নখ দেবেন। এই দিন আঁতুড় ঘর থেকে মা ও সন্তান ছাড়া পায়। ঐদিন মুন্সী, ফকির আপ্যায়িত হন। যে বাড়িতে শিশু জন্ম গ্রহণ করে ২১ দিন পর্যন্ত সেই ঘরকে 'নাপাক ঘর' বলে। ২১ দিনের পর 'সাপাক ঘর' হয়। শিশুর মা ৪০ দিন পর্যন্ত নামাজ পড়তে পারবেন না।

ভোজনী বা অন্নপ্রাসন ঃ অধিকাংশ পটুয়াসমাজে শিশুদের ভোজনী বা অন্নপ্রাসন হয়।

সুন্নৎ ঃ ৫-৬ বছর বয়সে খলিফা এসে পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ কেটে দেন। একেই সুন্নৎ বলে। সুন্নৎকে এঁরা 'খাদনা করা' বলেন। এছাড়া সুন্নৎদান কিংবা সুন্নদানও বলা হয়। এই দিন পরিবারের আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী খাওয়ানোর ব্যবস্থা থাকে। উৎসব অনুষ্ঠান হয়। এরপর 'চার কলমা' শেখানো হয়। তার পর পট আঁকাও শেখে। সুন্নৎকে 'খাতনী দেওয়া' বা 'মুসলমানী করা'ও বলা হয়ে থাকে।

বিবাহ ঃ মেদিনীপুরের এই জায়গার পটুয়ারা মুসলমান রীতি অনুসরণ করলেও বিবাহবে এঁরা 'সাদি' বলেন না। রাত্রে কিংবা দিনে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। পাত্র বাড়ির বাইরে থাকে আর পাত্রী ভিতরে থাকে। মৌলবী পাত্রকে চারকলমা পড়ান। উকিল, মোক্তার দু'জন সাক্ষী তৈরি হয়। দেনমোহর বাঁধা হয়। এই টাকা মানুষের ক্ষমতাঅনুযায়ী স্থির হয়। উকিল, মোক্তার, দেনমোহর নিয়ে হাজির হন। তাঁরা মেয়েটিকে বলেন অমুকের ছেলে এত টাকা দেনমোহর নিয়ে বিয়ে করতে চায়। মেয়েটি রাজি হয়। উকিল, মোক্তার মৌলানার কাছে ফিরে আসেন। ছেলেকে মৌলানার হাত ধরে দোওয়া পড়ানো হয়। এর পর নফর নামাজ। বিয়ে হয়ে যাবার পর বাপের বাড়িতে খাওয়া যাবে না।

মেদিনীপুরের তমলুক অঞ্চলে পটুয়াদের মধ্যে স্বগোত্রে বিবাহের রীতি প্রচলিত। বিবাহ, এবং তালাক-সংক্রান্ত সব অনুষ্ঠান হয় কাজির উপস্থিতিতে। কিন্তু তাঁরা যাবতীয় কাজকর্মে হিন্দুদের মতোই পদে পদে পঞ্জিকা মেনে চলেন। পটুয়ারা অষ্টমঙ্গলা এবং বধূবরণের মতো হিন্দু লোকাচার মেনে বিয়ে করেন। বিবাহে মেয়েরা সিঁথিতে সিঁদুর পরে, শাঁখা ব্যবহার করে। পূর্বে বিবাহের পর বরকন্যা ঠাকুরের পায়ে প্রণাম জানিয়ে আসত।

গায়ে হলুদ ঃ বিবাহের দু-একদিন আগে ছেলের ঘরে গায়ে-হলুদ অনুষ্ঠিত হয়। ছেলের ঘর থেকে হলুদ গেলে মেয়ের পিতৃ-গৃহে গায়ে-হলুদ অনুষ্ঠিত হয়। 'অক্ত' অর্থাৎ সময় ধরে হয়। ফোজ অক্ত ছেলের ঘর হলে মেয়ের ঘরে জোহরের অক্ত হয়।

মারা গেলে ঃ মারা গেলে 'পরবাসী' করা হয়। অন্য জায়গায় মাটিতে খড় বিছিয়ে শোয়ান হয়। ওপরে একটা কাপড় দেওয়া হয়। 'দাফন' করানো হয়। 'দাফন' অর্থাৎ নতুন কাপড় পরানো। সাবান দিয়ে গা ধোওয়া হয়। 'নখ কাটা, পায়খানার দ্বার পরিষ্কার লজ্জাস্থানের লোম পরিষ্কার করা হয়। পুরনো কাপড় ছোঁয়া যাবে না। মেয়েদের ক্ষেত্রে 'সিনা বন্ধন' করা হয়। নতুন কাপড় বুকে ঢাকা দেওয়া হয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে কেশবন্ধন করা হয়। অর্থাৎ কাপড় দিয়ে চুল বাঁধা হয়। নাকে, কানে, কর্পুর দেওয়া হয়। চোখে দেওয়া হয় সুরমা। মৃতর দেহে একটি নতুন কাপড় জড়ানো হয়। এরপর দেওয়া হয় 'গোলাপ পানি'।

জানাৎ পড়া ঃ খাটিয়ার সামনে থাকেন মৌলানা, তার পেছনে আত্মীয়স্বজন। কমপক্ষে তিন 'কাতার' (সারি) লোক থাকবে। মৌলানা মৃতের শান্তির জন্য দোওয়া চাইবেন। যারা জানাৎ পড়বে তাদের ধোয়া কাপড়, শরীর 'সাপাক' থাকা (পবিত্র থাকা) দরকার। উত্তরে মাথা রেখে শোয়ানো হবে। পশ্চিম দিকে মুখ থাকবে (এটাকে কেবলামুখী বলে), তিনবার মুখটা খোলা হয়।

করব ঃ মাটিতে কমপক্ষে সাড়ে তিন হাত গর্ত খুঁড়তে হয়। চওড়া হয় দেড় হাত। লম্বা সাড়ে তিন হাত। উপরে কাঁচা বাঁশের ছাউনি বা পাটাতন দেওয়া হয়। এর পর খড় বা পাতা দিয়ে মাটি দেওয়া হয়।

চারকুল পড়া ঃ কবর দেওয়ার পর চার কোণায় চার জন দাঁড়িয়ে চারটে খেঁজুর ডাঁটা নিয়ে চারটে কুল পড়বে। পড়ার পর চারটে খেঁজুর ডাঁটা গেড়ে দেবে। চারটে কুল অর্থাৎ চারটে সুরা (মন্ত্র)। এরপর চিঁড়া ছোলা ভিজিয়ে খাওয়া হয়।

চার দিনের দিন 'কুল পড়া' ঃ আগে বলা হত ছোলা পড়ানো। চার দিনের দিন কুল পড়া হয়। এক হাজার বার কমপক্ষে মন্ত্র পড়তে হবে। সকলে কবরস্থানে যাবে। সেখানে 'কবর জিআরৎ' করবে। এর মাধ্যমে মৃতকে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

৪১ দিনের দিন চল্লিশা ঃ এদিনও কুল পড়া হয়। সম্ভব হলে প্রথম দিন থেকে এই দিন পর্যন্ত মৌলানাকে নিয়ে খতম পড়ানো হয়। যার ঘরে লোক মারা যায় তার ঘরে সেদিন উনুন জ্বলে না। কেউ কেউ মারা গেলে সঙ্গে সঙ্গে আজান পড়ে।

পটুয়াদের মধ্যে যাঁরা সময় পান তাঁরা প্রত্যেক দিন পাঁচ বার নামাজ পড়েন। একে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়া বলে। রোজা মাসে কোন কোন পটুয়া রোজা রাখেন। ইদলফেতরেও এঁরা নামাজ পড়েন। সামর্থ্য থাকলে 'জাকাৎ' দেওয়া হয়। খাওয়া পরা বাঁচিয়ে যদি কারোর হাজার টাকা বাঁচে তবে ১৫ টাকা 'জাকাৎ' দিতে হবে। ইদুজ্জোহায় নামাজ পড়া হয়। সামর্থ অনুযায়ী কুরবানী দেওয়া হয়। দুর্মায় উটের অভাবে মুসলমানরা গরু দিলেও পটুয়ারা ছাগল কুরবানী দেন। যেহেতু এঁরা গোমাংস খান না তাই ছাগল দেন। মেদিনীপুরের পটুয়ারা মুসলমানদের সবেবরাৎ পরব পালন করেন। এখানকার পটুয়াদের মধ্যে জামাইষষ্ঠী, ভাইফোঁটার প্রচলন নেই। তবে এই উৎসবগুলির আনন্দটা এঁরা উপভোগ করেন।

বাঁকুড়ার পটেরিরা (বাঁকুড়ায় পটুয়াদের এই নাম) নিম্নবর্ণের হিন্দু। কিন্তু এদের শিষ্য বা যজমান প্রধানত সাঁওতালেরা। পটেরিরা হিন্দুর মত পূজাপার্বণ পালন করেন। বাড়িতে লক্ষ্মীপূজা হয়। মেয়েরা একাদশী পূর্ণিমায় উপবাস করেন, ধর্ম পূজা করেন, বিপদতারিণীর বাব করেন। এই সব পুজো অর্চনায় হিন্দু ব্রাহ্মণের ডাক পড়ে। পয়সা দিলেই তাঁরা পুজো করতে আসেন। বিবাহের অনুষ্ঠানে এই ব্রাহ্মণরাই আসেন। মেয়েরা শাঁখা, চুড়ি, সিঁদুর ব্যবহার করেন। কেউ কেউ আলতাও পরেন। হাওড়া জেলার অন্তর্গত উলুবেড়িয়া থানার চণ্ডীপুর গ্রামে এই শতকের চারের দশক নাগাদ বেশ কিছু পটুয়া ছিলেন। চণ্ডীপুরের পটুয়াদের সামাজিক আচার আচরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার মতানৈক্য থাকলেও এখানকার বয়স্ক পটুয়াদের কথানুযায়ী বর্তমানে পটুয়াদের সমস্তরকম কাজকর্ম হিন্দু রীতি অনুসারেই হয়। বর্তমান বিবাহের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যে প্রেম সমাজের দিক থেকে মেনে নেওয়া

হয়।

মৃত ব্যক্তিকে সৎকারের যে পদ্ধতি তা হিন্দু সমাজের মতই। দেহকে চান করানো আতপ চালের ভোগ দেওয়া এবং পরিশেষে পোড়ানো হয়। মৃত লোক যদি কোন স্ত্রীলোক হন তাহলেও সৎকারের ভিন্ন কোন পদ্ধতি নেই। মৃত ব্যক্তি অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোক হলে এবং তাঁর গর্ভের সন্তান যদি পাঁচ মাসের বেশি হয় সেক্ষেত্রে মায়ের পেট কেটে বাচ্চা বের করে মাকে পোড়ানো হয় এবং বাচ্চাকে আলাদা জায়গায় মাটি চাপা দেওয়া হয়। মৃত্যুর পর মুর্শিদাবাদে সাধারণত চার দিন ধরে অশৌচ পালিত হয়। কোথাও কোথাও, এর কম বেশিও হয়। জাত্যাশৌচ ২১ দিন। গণকর গ্রামের পটুয়ারা মৃতদেহ দাহ করেন। হিন্দু পটুয়ারা চিত্রকর, মালাকার, সরকার, পাল উপাধি গ্রহণ করে। তাদের নিজস্ব পুরোহিত আছে। মুর্শিদাবাদে যে সব পটুয়া সাপ খেলান তাঁরা মা মনসার ভক্ত, মনসার, পুজো করেন। আবার ইন্দ্রদেবের পুজোও করেন। মুর্শিদাবাদের পটুয়ারা বিবাহ অনুষ্ঠানে গায়ে হলুদ, সিন্দুর দান, সাতপাক, হস্ত বন্ধন প্রভৃতি করেন। জামাই ষষ্ঠী, নবান্ন উৎসব হয় পটুয়া পল্লীতেও। তখন কিন্তু প্রায়ই গো-মাংসের ব্যবহার থাকে না। মুর্শিদাবাদে শিবচতুর্দশীর দিন অনেক পটুয়া পল্লীতে মহিলাগণ স্বামীর মঙ্গল কামনায় উপবাসও করেন। হিন্দুদের দেবীর প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রাখেন। সূর্য, ধর্মরাজ, যম প্রভৃতি দেবদেবীর প্রতি এদের অগাধ বিশ্বাস।

বীরভূমের বাঁকু পটুয়া বলছিলেন তাঁর বাবা শ্রীপতি পটুয়ার কবর হয়েছিল। তবে মসজিদে তিনি যেতেন না। বাড়িতেই নামাজ পড়তেন। আবার মন্দিরেও যেতেন। বাঁকুর স্ত্রী হিন্দু ধর্মের উৎসব বা পার্বণ নিয়মিত পালন করেন। শাঁখা সিঁদুরও পরেন। বাঁকুর বাবা ধর্মরাজের উপাসনা করতেন। দুর্গা পুজোয় অঞ্জলি দিতেন। উনি পরিবারশুদ্ধ সকলে যুগল মন্দিরে রামগোপাল উদাসীনের কাছে বৈষ্ণব ধর্ম দীক্ষা নিয়েছিলেন। বাঁকুর ইচ্ছে তাঁর মৃত্যুর পর বৈষ্ণব মতে সমাধি হোক। তা নাহলে যেন দাহ করে। এই কথাই বলে যাবেন। সাধারণতঃ মৃতদেহকে মুখাগ্নি করে কবর দেওয়া হয়।[১১] বীরভূমের পটুয়াদের ছেলেদের সুন্নৎ হয়। কিন্তু সধবারা সিঁদুর ও কোন কোন ক্ষেত্রে শাঁখাও পরেন। পুরষেরা রোজাও করেন, নামাজ পড়েন, কিন্তু দাড়ি রাখেন না সাধারণত। ঈদ, মহরম প্রভৃতি পরবে তাঁদের যোগদান যেমন আবশ্যক সেরকম আবার পঞ্চানন, শীতলা, মনসা প্রভৃতি হিন্দু লৌকিক দেবদেবীর উপাসনাতেও তাঁদের বাধা নেই। খাঁটি মুসলমানদের সঙ্গে এঁদের বিয়ে সাদি হয় না, হিন্দুদের সঙ্গে তো সে কথা ওঠেই না। অতএব নিজেদের ধর্মসংস্কার সমাজের মধ্যেই তাঁদের বৈবাহিক সম্পর্ক সীমিত।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার আখড়াপুঞ্জির পটুয়াদের আলোচনা প্রসঙ্গে অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন[১২] এখানকার পটুয়ারা চারটি উপাধি ব্যবহার করেন—পটিদার, চিত্রকর, গাজি ও গায়েন। বেশ কয়েক বছর আগে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ তিনটি পরিবারের শুদ্ধি করেছিলেন। তাঁরা একই পল্লীতেই বাস করেন। কিন্তু অন্য পরিবারগুলি থেকে ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে স্বতন্ত্র। চলতিভাবে তাঁরা হিন্দু অন্যেরা মুসলমান। কিন্তু এই তথাকথিত মুসলমান সম্প্রদায়ের আচারআচরণ অন্যান্য স্থানের মুসলমান পটুয়াদের মতই চমকপ্রদ। তাঁদের সুন্নৎ হয়, মৃতদেহ কবর দেওয়া হয়, রোজা পালন করতে হয, স্থানীয় মসজিদে গিয়ে

নামাজও পড়তে হয়। মহরম, ঈদ প্রভৃতি উৎসব সকলেই পালন করেন। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের ক্ষেত্রে মরণোত্তর অশৌচের কাল সাধারণত ৪১ দিন। বিয়ে হয় দিনের বেলায়। হিন্দুদের মতো রাত্রে নয়। নিকা, তালাক প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে এবং চার বিবি অবধি বিবাহ করা চলে। কবর দেওয়ার আগে মৃতদেহের মুখাগ্নি করা প্রচলিত। পুরুষেরা কেউ কেউ দাড়ি রাখেন না। এঁদের সধবা মহিলারা অধিকাংশই সিঁদুর ব্যবহার করেন, শাঁখাও ব্যবহার করেন অনেকে, কিন্তু নোয়া (লোহা) কেউ পরতেন না। গ্রামের একান্তে পঞ্চানন্দ, শীতলা, মনসা প্রভৃতি দেবদেবীর যে 'থান' আছে সেখানে আপদবিপদে মেয়ে পুরুষ সকলেই মানত করেন, মনস্কাম পূর্ণ হলে পূজা দেন। অন্যদিকে শুদ্ধিপ্রাপ্ত তিন ঘর পটুয়া এখন পুরোপুরি হিন্দু রীতিনীতি মেনে চলেন। তাঁদের ঘিরে দু'একটি কাহিনী শুনলাম যা রীতিমত কৌতূহলোদ্দীপক। শুদ্ধি হবার পরও এঁদের একজন মৃত্যুকালে নির্দেশ দিয়ে যান চিরাচরিত প্রথা অনুসারে তাঁকে যেন কবর দেওয়া হয়। হিন্দু হলেও সে নির্দেশ পালন করা হয় তাঁর ক্ষেত্রে। আর এক পরিবারের কর্তা ও বড় ছেলে মুসলমান থেকে যান, ছোট ভাই শুদ্ধি নিয়ে হন হিন্দু। কিছুদিন পর কর্তা মারা গেলে বড়ভাই বলেন তাঁকে কবর দিতে হবে, ছোট ভাই বলেন দাহ করতে হবে। বড় ভাই এর কথাই টেকে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে কবরই দেওয়া হয়।

কিন্তু অমিয় বাবুর বর্ণিত এই আখড়াপুঞ্জি এবং বর্তমানের আখড়াপুঞ্জির মধ্যে বিস্তর তফাৎ। বর্তমানে আখড়াপুঞ্জিতে ২০ ঘর পোটো। এর মধ্যে ১ ঘর কর্মকার, ১ ঘর গায়েন, ৯ ঘর পটিদার, ৯ ঘর চিত্রকর। মুচা, ইছা, ইসা, ঠাকুর গড়েন। অসুবিধা দেখলে নাম পরিবর্তন করতে হয়। মুসলমান আচার পালনের কোনো হিড়িক নেই।[১৩]

মেদিনীপুর জেলার কুমীরমারা গ্রামের পটিদাররা বলেন যে তাঁরা মুসলমান ধর্ম মানতেন, কিন্তু মসজিদে যেতেন না। বাড়িতে নামাজ পড়তেন। মুসলমানদের সঙ্গে তাঁদের বিবাহদিও হত না। নিজেদের চিত্রকর জাতির মধ্যেই বিবাহ হত। মৌলানা এসে অবশ্য কলমা পড়িয়ে যেতেন। পূর্বে 'সুন্নৎ' করারও রীতি ছিল, এখন নেই। কুমিরমারার সুধাংশু চিত্রকর (৫৭) বলছিলেন শ্রাদ্ধশান্তি, বিবাহ ব্রাহ্মণ দিয়েই হয়। এঁদের অশৌচকাল ১৫ দিন। কুমিরমারার মতিলাল চিত্রকর ধর্মান্তরিত হয়ে মসিবুর রহমান হয়েছেন। ধর্মান্তরণের সঙ্গে সঙ্গে কুমিরমারা থেকে খেজুরির কসতলায় চলে এসেছেন। কসতলার যশিমন বিবিকে বিয়ে করার জন্যই ধর্ম পরিবর্তন করতে হয়েছে। বর্তমানে ধর্মাচরণ পুরোপুরি মুসলমানদের মতই। পূর্বে প্রতিমা তৈরি করতেন কিন্তু বর্তমানে ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য প্রতিমা তৈরি করতে পারছেন না। কারণ মসিবুরকে মুসলমান সমাজ ঠাকুর গড়তে দেয় না। আবার এও হতে পারত হিন্দু সমাজ মুসলমানের গড়া ঠাকুর নিত না। তাই মসিবুর আর ঠাকুর গড়েন নি। এখন সময় পেলে কেবল পট আঁকেন আর দেখান। বাধ্য হয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণার দেউল্যা পোটপাড়ার শিল্পীরা ধর্মের ব্যাপারে দোভাঁজা (হিন্দু মুসলমান দু'ধর্মের কিছু রীতি মানেন) হয়ে আছেন। কেউ কেউ 'এক ঘা' (হিন্দু অথবা মুসলমান যে কোনও একদিকে) হওয়ার চেষ্টা করছেন। কার্তিক মালি, সুকুমার মালিরা নিজেদের মধ্যে তর্ক করেন হিন্দু হওয়াই ভাল। আশি বছর বয়ষ্ক জ্যোতিষ মালির অবশ্য কোনও আগ্রহ নেই। তাঁর কথা 'জীবনটাই কেটে গেল, এখন আর হিন্দু হয়ে লাভ কী?' এখানকার দুধ কুমার মালির (মুসলমান নাম দুদ আলি) মেয়ের

বিয়েতে বামুন আর ছেলের বিয়েতে মৌলবী এসেছিল। ভাল আছেন দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাগদা গ্রামের পোটোরা। হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্মের দেবতাকেই আপন করে নিয়েছেন। অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে আয়োজন হয় নবান্ন উৎসবের। এতে বিবিমায়ের হাজুত এবং পঞ্চ দেবতার (পঞ্চানন, শীতলা, মনসা, বসন্ত রায়, জরাসুর) পুজো হয়। বিবি মায়ের হাজুতে সত্যনারায়ণের সিরণি পড়া হয়। নবান্ন উৎসবের পিঠে মালপোয়া ছাড়াও বিভিন্ন রকম ফল বিবি মায়ের কাছে দেওয়া হয়। শেষে সকলে বিবি মাকে প্রণাম করেন। রাত্রে হয় বিবি মায়ের আহ্বানী গান। পরের দিন শনিবার অথবা মঙ্গলবার পঞ্চদেবতা পুজো অনুষ্ঠিত হয়। মেদিনীপুরের চেতুয়া বাসুদেবপুরেব সংলগ্ন নির্ভয়পুরের পটিদার পল্লীতে একটি ছোট ভাঙা মসজিদ আছে। বিশ্বকর্মার পুত্র চিত্রকররা কিন্তু এখনও বিশ্বকর্মার পুজো করেন ভাদ্র সংক্রান্তিতে এবং মেয়েরা ঘরে লক্ষ্মী পূজাও করেন।

পট আঁকা কিংবা গান গাওয়ার সঙ্গে পটুয়াদের কোনো সংস্কার নেই। যে কোনো দিন যে কোনো অবস্থাতেই পটুয়ারা পট দেখানোর কাজ করেন। পশ্চিমবঙ্গের পটুয়ারা কৃষ্ণ, রামচন্দ্র, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি দেবদেবী ও অবতারগণের মহিমা বিশ্বাস করেন গভীরভাবে। পটুয়ারা ধর্মে যাই হোন এ ব্যাপারে তাঁদের মনে উদারতা ও প্রসারতা লক্ষণীয়। শুধু পটচিত্র রচনার ক্ষেত্রে—চিত্রের বিষয় হিসাবে দেবদেবী অবতারগণকে গ্রহণ করেছেন তাঁরা তা নয়। ব্যক্তিগত জীবনেও কৃষ্ণ, রামচন্দ্র প্রভৃতি দেবদেবী অবতারকে গভীরভাবে তাঁরা ভক্তি করেন। এই সব দেব দেবীর আশ্রয়ে বাঙালীর যে জাতীয় সংস্কৃতি গঠিত হয়েছে, সেই জাতীয় সংস্কৃতির মূল স্রোতের সঙ্গে পটুয়াদের সংস্কৃতির যোগ সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। এই থেকে ধারণা করা যায় এরা বাঙালীর জাতীয় সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত সম্প্রদায় বিশেষ।

উচ্চ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাবভিত্তির এই সব দেবদেবীর প্রতি এঁদের বিশ্বাস যেমন গভীর তেমনি দুর্বল বা ক্ষীণ আধ্যাত্মিক ভাব ভক্তির এবং অনুন্নত সমাজে পূজিত দেবদেবী এবং অবতারগণের প্রতিও তাঁদের বিশ্বাস ও ভক্তি গভীর। এই সূত্রে বাঘের দেবতা 'বাঘাই' দেবতা ও সত্যপীরের প্রতিও এঁদের গভীর বিশ্বাস ও নিষ্ঠা লক্ষণীয়। দেখা যায় এঁদের চিত্র-বিষয় হয় বাঘাই, সত্যপীর প্রভৃতি দেবদেবী। এতো মনের প্রসারতাহেতু কোনরকম সাম্প্রদায়িক মনোভাব কিংবা সঙ্কীর্ণতা মনকে কলুষিত করতে পারে না। এঁরা চিরকলুষমুক্ত থেকেই পট অঙ্কন ও পটসঙ্গীত রচনা করেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রসারের ক্ষেত্রে এঁদের অবদান ও কৃতিত্ব অনস্বীকার্য ও মূল্যবান।

গুপ্ত ভাষা ঃ মনে প্রশ্ন জাগে পটুয়ারা ভারতবর্ষের কোন আদিম জনগোষ্ঠীর অংশ ছিল। সম্ভবত এরা দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীভুক্ত। কালে কালে তাদের মধ্যে দেখা দিল নানা সংস্কৃতির সমন্বয় ও বিভাজনের, তবুও এদেব মধ্যে সুপ্রাচীন ঐতিহ্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন এদের নিজেদের মধ্যে গুপ্তভাষা (কোড ল্যাংগুয়েজ) প্রচলিত আছে যা অন্যদের কাছে প্রকাশ্য নয়।

কয়েকটি গুপ্তভাষার নমুনা ঃ গুপ্ত ভাষা— ঠার শেখান, আমি ভাত খাচ্ছি—বোতম তাগাচ্ছি, জল খাচ্ছি—নিরেন খেদি, ভাত খাব—বোতম টাগি, আমাদের বড় ছেলের নাম দিলীপ—আমারি লেদা নামি দিলীপ, লোক আসছে—লাওয়াল চুলিছে, খারাপ লোক—কেরা লাওয়াল, খাটিয়ে পয়সা না দিলে—কুনকি দায়নি, ব্যবহার খারাপের তুলনা—ধুতুন

পাওয়াল, বাচ্চা (ছেলে)—নট পাওয়াল, বুড়ো মানুষ—ডুকা, বুড়ি—ডুকি, বড় মেয়ে মানুষ—বনী, ভাল মেয়ে—সাইদিবনী, কাউকে দেখা—পাঁয়েঠে, ভিক্ষা চাইতে যাওয়া—খিতানে যাওয়া, ভাত—কুনা, তরকারি—বরুণ, জিনিস—নামান।

এছাড়া যে পরিভাষাগুলির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় সেগুলি হল—পট আঁকার প্রথম কাজটিকে 'টিকলামো' বলা হয় অর্থাৎ পেনসিল ড্রইং। তারপর বর্ণ মাখানো—ছবিগুলিতে রঙ আরোপ। এরপর 'পদলামো' মানে অবয়বগুলির সাজসজ্জা এবং অন্যান্য অলঙ্করণ। পট আঁকার সঙ্গে সঙ্গে গানও আসে গুনগুনিয়ে। পটুয়ারা তখন একাধারে 'লিখক' ও 'গাহক'—চিত্রকর ও কবি।

প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েকজন পটুয়া এবং হারানো পটের গ্রাম

পটশিল্পের ঐতিহ্য খুবই প্রাচীন। প্রাচীনকালে পটুয়ারা পটের গান গেয়ে নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতেন। তখন বিনোদনের জন্য যাত্রা, টি.ভি., সিনেমা, থিয়েটারের প্রচলন ছিল না। পটুয়াদের পট দেখানো এবং গান শোনানোর বিনিময়ে গৃহস্থ এবং জমিদারেরা তাদের দক্ষিণাস্বরূপ চাল, ডাল কিছু টাকা পয়সা উপহার দিতেন। সুখে-দুঃখে দিন ওদের কেটেই যেত। কিন্তু দিনবদল ঘটল। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় একটা পরিবর্তন এলো। আধুনিকতার কালস্রোতে গ্রামীণ শিল্পকলা ভেসে যেতে লাগল। পটুয়ারা বাঁচার চেষ্টা করলেন। কেউ পারলেন, কেউ পারলেন না। এখনও যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁরা জানেন না কীভাবে এই পটশিল্প টিঁকে থাকবে। পটশিল্প নিয়েও যেমন তাঁদের হতাশা, তেমনি দৈনন্দিন জীবনেও দুর্দশা চরমে উঠেছে। এই হতাশা-দুর্দশার অনুভূতি পৃথক-পৃথকভাবে প্রায় প্রতি শিল্পীরই। এই অধ্যায়ে আমরা বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিস্থানীয় কিছু পটুয়ার ব্যক্তিপরিচয় এবং তাঁদের চিন্তাভাবনা-সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপিত করব।

পশ্চিমবঙ্গের যে-জেলাগুলিতে পটুয়ারা এখনও আছেন, অর্থাৎ এখনও কম-বেশি পট অঙ্কিত হয় সেগুলি হলো ঃ মেদিনীপুর, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া প্রভৃতি। নদীয়া জেলার শান্তিপুরে পটুয়ারা পটেশ্বরীর মূর্তি আঁকেন। এর বাইরে যে জেলাগুলিতে পটুয়ারা অর্থাৎ পটশিল্পীদের বংশধরেরা আছেন অথচ পট আঁকা হয় না সেগুলি হলো দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হুগলী, হাওড়া। ক্ষেত্রানুসন্ধানে গিয়ে দেখা গেছে এইসব জায়গার পটুয়ারা এবং তাঁদের বংশধরেরা পট আঁকার বদলে কেউ কেউ মাটির মূর্তি কিংবা অন্য কোন কাজ করেন। যাঁরা পট আঁকা ছেড়েছেন তাঁদের কথা আলোচনার পূর্বে যাঁরা এই শিল্পকে ভালবেসে তাঁদের শিল্পকে টিঁকিয়ে রাখার এবং পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করছেন তাঁদের কথা আলোচনা করা যেতে পারে।

(ক) বীরভূম জেলায় বেশ কিছু পটুয়া বংশানুক্রমে বাস করেন। এই জেলার ময়ূরেশ্বর থানার যাটপলসায় বাঁকু পটুয়ার (৬২) বাড়ি। বয়সের তুলনায় তাঁর বার্ধক্যটা চোখে বেশি পড়ে। তবে বার্ধক্যটা কোনও বাধা হয়নি — পটের দৌলতে লন্ডন, আমেরিকাও ঘুরে এসেছেন বাঁকু। বাঁকু পটুয়ার সঙ্গে অনেকবার সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছে। ওঁর একটা শিল্পী-

সুলভ চেহারা আছে। গলায় কণ্ঠী। বৈষ্ণবীয় ভাবধারার মানুষ। বাঁকুর সামাজিক আচারপদ্ধতি মিশ্র; ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কার বিচিত্র। বাঁকুর বাবা শ্রীপতিকে মুসলিম রীতি অনুযায়ী কবর দেওয়া হয়েছিল। মসজিদে না গেলেও তিনি বাড়িতে নামাজ, পড়তেন আবার মন্দিরেও যেতেন। বাঁকুর পরিবারের সকলে মিলে রামগোপাল উদাসীনের কাছে দীক্ষা নিয়েছেন। বাঁকুর ইচ্ছে—তাঁর মৃত্যুর পরে বৈষ্ণবমতে যেন সমাধি দেওয়া হয়। তা না হলে যেন দাহ করা হয়। হিন্দু ধর্মের প্রতি তাঁর তীব্র অনুরাগ। বাঁকু বলেছিলেন, 'আপনারা একটু চেষ্টা করুন না, পটুয়ারা যাতে হিন্দু হতে পারে।'

বাঁকুর পাঁচ ছেলে, তিন মেয়ে ও নাতি-নাতনি নিয়ে বেশ বড়সড় সংসার। বড় ছেলে শান্তনু, মাধ্যমিক পাশ করেছে। কোনও রোজগার নেই। মেজ ছেলে কাঞ্চন, রাজমিস্ত্রীর কাজ করে। পরিবারের একমাত্র ভরসা বাঁকুর পটদেখানোর উপার্জন। শ্রমের তুলনায় পয়সা মেলে না। দিনের শেষে খুব বেশি রোজগার হলে হয় তিরিশ টাকা। সংসার চলে না। অবসরের সময় তাই তবলার টিউশান দেন। কখনো বা নজরুলগীতি শেখান। দুর্গা পূজার সময় দু'তিনটে দুর্গা ঠাকুরের মূর্তি গড়েন। বাঁকু বিচিত্র সব পট এঁকেছেন। নিমাইসন্ন্যাস, বালীবধ, রাবণবধ, শ্রীকৃষ্ণ পট, সীতাহরণ, সিন্ধুবধ, নৌকোবিলাস প্রভৃতি নানারকম পট। নিজের আঁকার বাইরে বাবা জ্যাঠার কাছ থেকেও উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু পট পেয়েছেন। এর বাইরে পরিবার পরিকল্পনা আর ব্যাঙ্কে টাকা সঞ্চয় বিষয়েও অর্ডারি পট এঁকেছেন। বাঁকুর খুব দুঃখ! বাংলা ১৩৬৩ সালের বন্যায় তাঁর অনেক পুরনো পট ভেসে গেছে।

বাঙালী পোটোদের মধ্যে বাঁকু ভাগ্যবান। অন্ততঃ সাগরপাড়ি দিতে পেরেছেন। মুর্শিদাবাদ লোকায়ত শিল্পী-সংসদের সম্পাদক পুলকেন্দু সিংহের উদ্যোগে ১৯৮৭ সালে নতুন দিল্লিতে অল ইন্ডিয়া হ্যান্ডিক্র্যাফট বোর্ডের অদিতি উৎসবে বাঁকু তাঁর পট দেখাবার সুযোগ পান। পরবর্তীকালে সঙ্গীত নাটক আকাদেমি থেকে পট দেখাবার আমন্ত্রণ আসে। ১৯৮২ সালে সাগরপারের ডাক আসে—লন্ডনে ভারত-উৎসবে যোগ দেবার জন্য। সেবার বাঁকু প্রথম বিমানে উঠলেন। 'লন্ডনে প্রত্যেকেই এখানকার পটের প্রশংসা করেছে, ভারতের এরকম একটা শিল্পের কথা তাদের জানা ছিল না। টাকা-পয়সা ভালই রোজগার হয়েছে সেই সময়। থাকা-খাওয়া ছাড়া প্রতিদিন দশ ডলার। বাবার ধার শোধ করতে সব টাকা বেরিয়ে গেছে'। বাঁকুর অবস্থা এখন খুবই সঙ্গীন। '৯৯ সালের জানুয়ারি মাসে বাঁকু পটুয়া কলকাতার শিল্পমেলায় এসেছিলেন। বসে বসে একটা পট আঁকছেন। শীতবস্ত্রের অভাবে কনকনে ঠান্ডায় ঠকঠক করে কাঁপছেন। পটের শেষ টানটা দিয়েই ফোকলা দাঁতে হেসেছেন আর বুকে জড়িয়ে ধরেছেন পটটি।

(খ) এই জেলার আর এক বিখ্যাত শিল্পী কালীপদ সূত্রধর। দশ বছর বয়সে বাবা শিবরাম সূত্রধরের কাছে পট আঁকায় হাতেখড়ি হয়েছিল। পঁচাত্তর বছর ('৮৯ সালে) বয়সেও সমান দক্ষতায় পট এঁকে চলেছেন। কালী বাবু মূলত দুর্গা পট আঁকেন। মহালয়ার দিনসাতেক আগে থেকে ব্যস্ততা শুরু হয়। বাঁশের বাখারি তুলে চৌকো করে বাঁধন করা হয়। সেখানে নতুন কাপড় বাঁধা হয়। পলি মাটির গোলায় নতুন কাপড় চুবিয়ে নেওয়া হয়। মাটি গুঁড়ো করে

খুব মিহিভাবে চালাতে হয়। জলে ভেজানো হয় সেই মাটি। এবার কাপড়টাকে ওর মধ্যে চুবাতে হয়। সেই কাপড়েই পট আঁকা হয়। শুদ্ধাচারে নিরিবিলিতে আঁকা হয় পট। কালীপদ কিছু দুর্গার মূর্তিও তৈরি করেন। একটু সময় থাকতেই দুর্গা মূর্তি গড়া শুরু হয়। পট আঁকা কিংবা অন্যান্য কাজে বাবাকে সাহায্য করেন চার ছেলে। তবে মননে ও গভীরতায় বাবা অনেকটা এগিয়ে। অবর্ণনীয় অভাব এঁদের। পূর্বে কালীপদ চিত্রকরেরা কাঠের কাজ করতেন।

(গ) মেদিনীপুরের নয়া-র দুখুশ্যাম চিত্রকরের জীবনকথাও দুঃখময়। জলে ডোবা ধেনো জমি পেরোলে তবেই তাঁর বাড়ি পৌঁছনো যায়। ঝড়ে, বর্ষায়, প্রকৃতির রোষে বহুবারই তাঁর মাটির ঘর ভেঙেছে। আবার নতুন করে ঘর উঠেছে। "দু'বেলা তাঁর পেটে ভাত জোটে কি জোটে না, ঠিক নেই — তাঁর আঁকা পট কিন্তু 'সংস্কৃতির কারবারীদের' ঘরে বিদেশী মুদ্রা এনে দিয়েছে।" দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়গপুর লাইনে বালিচক স্টেশন। সেই স্টেশন থেকেই এক ঘন্টার পথ নয়াগ্রাম। এখানে বাইশ-তেইশ ঘর পটুয়া আছেন। এটা পটের গ্রাম। দাওয়ায় বসে আছেন দুখুশ্যাম। বিড়ি টানছেন। পাশে ব্যাগ ভর্তি জড়ানো পট। তাঁর স্ত্রী রহিমন, ছেলেমেয়ে উশিয়ারা, রহমান, আনুয়ারা, বব্বানি ও আজনী। দুখুর আদি বাড়ি হলদিয়ার কাছে আকুবপুরে। এটা তাঁর মামার দেশ। পট আঁকা শিখেছেন বড় মামা গুণধর চাপড়ির কাছে। কালীঘাটের বসনতরীরা তাঁর বাবার দিক। আর নয়ার সাতকুড়িরা মায়ের দিক। পটুয়াদের মধ্যে যে ছ'টি শ্রেণীবিভাগ আছে তার মধ্যে পট আঁকা ও পটের গান করা, মূর্তি গড়ার কাজ বসনতরীদের। অন্য শ্রেণীগুলি হচ্ছে সাতপড়া বা সাতকুড়ি, আটপড়া বা আটকুড়ি, চৌপলকাটা, কাটাকাটা ও বেজো। আটকুড়ি ও সাতকুড়িরা মূলত মাটির মূর্তি ও ছোট পুতুল তৈরি করেন। চৌপলকাটাদের পেশা লণ্ঠন তৈরি করা আর কাটাকাটাদের কাজ সাধারণত কামারের। অবশ্য এরকম সুনির্দিষ্ট কোনও বিভাজন বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব নয়। জীবিকার প্রয়োজনে পটুয়ারা পট আঁকা ও পটের গান গাওয়া থেকে শুরু করে মূর্তি ও পুতুল গড়া, বিভিন্ন মেরামতির কাজ, তুকতাক, গো-চিকিৎসা, ক্ষেত মজুর খাটা ইত্যাদি বিভিন্ন পেশাতেই যুক্ত থাকেন। নতুন বিষয় নিয়ে পটচিত্র এবং পটের গান উদ্ভাবনে দুখুশ্যামের কৃতিত্ব অনেক। পট বিষয়ক বিভিন্ন কর্মশালা কিংবা শিক্ষণ শিবিরেও উপস্থিত থেকেছেন। তাঁর বিশ্বাস 'এক ঠেঁয়ে লেগে থাকলে' বড় শিল্পী হওয়া যাবেই।

(ঘ) পূর্বে মেদিনীপুরের হবিচক গ্রামের পঞ্চাশটি পরিবার পট আঁকতেন। অভাবের তাড়নায় তাঁদের বেশিরভাগই এখন অন্য পেশায়। গ্রামে দশ বারোটি পরিবার পিতৃপুরুষের পেশা ছাড়তে পারেনি। নিরঞ্জন চিত্রকর এঁদেরই একজন। কলকাতার এক মেলাতে নিরঞ্জন এসেছিলেন। তখনই ফরাসী দূতাবাসের এক সাহেবের দৃষ্টিগোচরে আসেন তিনি। সাহেব খুশি হন। ফরাসী বিপ্লবের পট দেখতে আগ্রহী হন তিনি। দোভাষী নিরঞ্জনকে ফরাসী বিপ্লবের কাহিনী সহজ করে বুঝিয়ে দেন। নিরঞ্জনের আঁকা ফরাসী বিপ্লবের পট সকলের প্রশংসা পায়। শুধু পুরনো বিষয় নয় সাম্প্রতিক ঘটনাগুলিও তাঁর নজর কাড়ে। তাঁর পটে এসেছে এড্‌স, পণপ্রথা, নারী নির্যাতন, মহারাষ্ট্রের ভূমিকম্প প্রভৃতি নানারকম প্রসঙ্গ। রাজীব গান্ধীর

হত্যার কাহিনী নিয়েও তিনি পালা রচনা করেছেন। এই শতাব্দীর শুরু থেকে দেশের স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত মেদিনীপুরের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের ওপরেও নিরঞ্জন দশটি পালা রচনা ও পট অঙ্কন করেছেন। তাঁর এই কাজে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন মেদিনীপুরের ৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের অন্যতম নেতা প্রবাদপ্রতিম বিদ্যুৎ বাহিনীর প্রধান ও ছয়ের দশকের যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী সুশীল ধাড়া। অবশ্য সুশীল বাবু নিজেও কয়েকটি গান রচনা করে দিয়েছেন। নিরঞ্জন এখনও প্লাস্টিকের ঝুলিতে পট নিয়ে ঘুরে বেড়ান। কেউ দেখতে চাইলেই, পট বার করে দেখান আর গান করেন।

(ঙ) মেদিনীপুর জেলার কাখরদা গ্রামের বাবু চিত্রকরের বয়স এখন পঁয়ত্রিশ। আট বছর বয়স থেকে পট-চিত্র আঁকতে শুরু করেছেন। সংসারের অভাব অনটনের মধ্যেও অব্যাহত রেখেছেন তাঁর শিল্পচর্চা। যে হাতে তিনি চাষের কাজ করেন, সেই হাতেই ধরেন রং ও তুলি। পুরাণের কাহিনী ছাড়াও তাঁর পটের বিষয় হলো পণপ্রথা, বৃক্ষরোপণ, পরিবেশ দূষণ, কলকাতার তিনশো বছর এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ইত্যাদি আধুনিক ও সাম্প্রতিক বিষয়। তাঁর পরিবারের প্রায় সকলেই পট আঁকেন। পরিবারের মেয়েরাও পট আঁকছেন। স্বর্ণ, যমুনা, রানি এঁরা একহাতে সন্তান পালনও করছেন আবার পটচিত্রও আঁকছেন। প্রায় নিরক্ষর হলেও এঁরা আঁকছেন সাক্ষরতার পট, মুখে মুখে বাঁধছেন গান। বাবু চিত্রকর দিল্লির প্রগতি ময়দানেও তাঁর পটের প্রদর্শনী করে এসেছেন। এছাড়া কলকাতার শিশির মঞ্চেও তাঁর তৈরি ফরাসী বিপ্লবের ওপর পটগুলি খুবই জনপ্রিয় হয়েছে।

(চ) নয়াগ্রামের শ্যামসুন্দর চিত্রকরের নাম অনেকেই জানেন। এমনকি বালিচকের বাসযাত্রীদের মুখেও শ্যামসুন্দরের প্রসঙ্গে সমীহভাব দেখা যায়। এখানে তাঁর শ্বশুর বাড়ি। শ্যামসুন্দরের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। তবে সহজ সরল অন্তরঙ্গ ভাবের জন্য তাঁর বাড়িতেই লোকের যাওয়া আসা বেশি।

(ছ) নয়াগ্রামের পটুয়া আনন্দ চিত্রকর পেটের দায়ে রিক্সা চালান। কিন্তু কী আশ্চর্য ধৈর্য ও নিষ্ঠায় এঁকে চলেছেন একের পর এক পটচিত্র! আনন্দ চিত্রকরের পরিবার ও শিশু কল্যাণের পটগুলি ছাড়াও কলিকাল বিষয়ক পটচিত্রগুলি বিভিন্ন জায়গায় যথেষ্ট উচ্চ-প্রশংসিত। এই পটচিত্রের সঙ্গে তাঁর নিজের বাঁধা গানও শ্রোতাকে মোহিত করে রাখে। এই শিল্পী কুমোরদের মত মাটি দিয়েও গড়তে পারেন নানান মূর্তি। আনন্দ বিড়লা অ্যাকাডেমির কিউরেটর অর্চনা রায়ের অনুমতিতে মাটি দিয়ে নানা শিল্প গড়েছেন ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে। ওঁর স্ত্রী মণি চিত্রকরও আজ স্বামীর সঙ্গে এই পেশায় নিজেকে যুক্ত করে নিয়েছেন।

(জ) এখানকার পুলিন চিত্রকর ওরফে ইমামুদ্দিন সব থেকে অভিজ্ঞ, বয়স্ক ও পটু। রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছেন পট এঁকে। মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি। মাথার চুলও অর্ধেক সাদা। সুযোগ হয়নি তাঁর প্রাথমিক লেখাপড়ার। সামান্য অক্ষরজ্ঞান আছে। বাপ ঠাকুর্দার কাছ থেকে পাওয়া আঁকার শিক্ষা ও চারণকবিদের স্মৃতির ভান্ডার নিয়ে পট এঁকে চলেছেন পুলিন।

শুধুমাত্র পট আঁকা নয়, সঙ্গে সেইসব কাহিনীর জন্য গান বেঁধেছেন। সুরও দিয়েছেন তাতে। পুলিনের আগে বাড়ি ছিল তমলুকের কাছে ঠেকুয়াচকে। পুলিনের তিন ছেলে — ননীগোপাল, আনন্দ ও নিরানন্দ। এদেরও একটি করে মুসলমান নাম আছে অন্যদের মত। তাজ মহম্মদ, আকু এবং এবাদ। তিন মেয়ের নাম লক্ষ্মী বা জামেলা, সরলা বা সাহেরা এবং সরস্বতী বা এমালি। তিন ছেলে মেয়েরই বিয়ে হয়ে গেছে। ননীগোপালের বয়স প্রায় ৫০। পুলিন কিংবা তাঁর ছেলেদের কারোর সংসারের অবস্থাই ভাল নয়। পট দেখিয়ে এবং বিক্রি করে প্রত্যেকের মাসিক গড়পড়তা আয় হয় ৫০০-৬০০ টাকা। তবে সকলেই আলাদা।

ননীগোপালের চার ছেলে ও এক মেয়ে। আনন্দের দু'টো সন্তান। এবাদের দুই ছেলে এক মেয়ে। ননীসহ ভাইরা সকলেই চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে। তাদের ছেলে মেয়েরা স্কুলে যায়। ৪-৫ বছর বয়স থেকে ছেলেরা হাতে তুলি ধরে। মেয়েদের পট আঁকা নিষেধ। মেয়েরা আঁকলে বিয়ের সমস্যা হয়। চিত্রকরেরা মুসলমান হওয়ায় হিন্দু দেবদেবীর ছবি আঁকা বা তাঁদের মাহাত্ম্য গান করা সাধারণ মুসলমান সমাজ ব্রাত্য হিসাবে গণ্য করে। সমাজের মৌলভীরা বলেন — তোমরা ছবি আঁকা, গান গাওয়া ছাড়লে তবেই তোমাদের ঘরে মেয়ে দেব বা তোমাদের মেয়ে নেব। সেজন্য এদের বিবাহ নিজেদের চিত্রকর সমাজের মধ্যেই হয়ে থাকে। জমিজমা সামান্য আছে। তাতে শাক-সব্জি হয়। ননীগোপাল মাঝে মাঝে কলকাতা চলে আসেন। কিছু পট বিক্রির আশায়। কোন মেলায় গিয়ে বসেন । অথবা চেনা কারোর বাড়ির উঠোন। কিছু কিছু পট বিক্রিও হয়। কোন কোন সময় চেনাজানা কারোর বাড়িতে রাত্রিযাপন অথবা শিয়ালদা নতুবা বালিগঞ্জ স্টেশন। পেটের টানে এঁরা এখন প্রথাসিদ্ধ পট ছেড়ে বা প্রথাসিদ্ধ বিষয় ছেড়ে অন্য কিছু করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। টেরাকোটার পুতুল বা পণবিরোধী কাহিনী এখন এঁদের পটে আসছে। ননীগোপাল বহুদিন ভারতে থাকা এক মার্কিন মহিলার কাছে যীশুর গল্প শুনে যীশুর জীবনীর উপর পট তৈরি করেছেন। যীশুকে ও মেরীকে নিয়ে একটি টেরাকোটাও করেছেন। এক পুরুষের ঐতিহ্য ধরে পুলিন, ননীগোপালরা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও হিন্দু দেবদেবীর ছবি এঁকে চলেছেন। মৌলবাদীদের রমরমার সময় তাদের উপর চাপও কম নেই। পট আঁকা বন্ধ করতে হবে। সে নিয়ে তাঁরা মজলিসও বসিয়েছিলেন। সেই মজলিসে এঁরা এঁদের জবাব দিয়েছেন। সুর করে গেয়ে ওঠেন পুলিন ঃ

যিনি আঁকিলেন, যিনি গাহিলেন গান
সে আমার দয়ার নবি, দরুদ বাড় মুসলমান্
তুমি যে দয়ার নবি আঁধার ঘরে ছিল সবই
এসে শুনাইলে যে গুণগান আঁধার হলো আলো সবাই পেল সম্মান।

এই বলে আমরা বললাম সুন্দরকে দেখায় দোষ কী? সুন্দর সবাই দেখবে। নাচ, গানে যদি দোষ না থাকে, তবে ছবি আঁকায় কী দোষ? দর্শনে কী দোষ আছে? তাই আমরা বললাম—

সব যিনি হিন্দু মুসলমান
আমরা এক মায়ের সন্তান।।

এঁরা বলতে চান হিন্দু মুসলমান সব একই মায়ের সন্তান। ঝগড়া বিবাদ করে কোন লাভ নেই। এখানকার অজিত চিত্রকর বারবার বলছিলেন, 'এই ব্যাখ্যার পর মৌলভীরা আর সাহস করে না আমাদের কাজে বাধা দিতে। প্রথম প্রথম আমরা শাস্ত্র পড়তাম না। এখন এইসব শাস্ত্র পড়ে আমরা সব জেনে গেছি। তবে ওরা নামাজটা পড়ার কথা বলে। আমরাও সেটা মানার চেষ্টা করি।'

(ঝ) অজিত চিত্রকরের (৬২) মুসলমান নাম নেমাজী মিস্ত্রি। বাবা গদাধর মিস্ত্রির মুসলমান নাম গুলজার। মা মোহিনী চিত্রকরের মুসলমান নাম ময়ূরজান। দু'জনেরই কবর হয়েছে। রহড়া রামকৃষ্ণমিশনে ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছেন। পটের গুরু ভূষণ চাপড়ি। গানের গুরু গুণধর চাপড়ি। চাপড়িদের গ্রাম ঠেকুয়াচক। চাপড়িরাও পট আঁকতেন। অজিতের এখন বাড়ি ঠেকুয়াচকে হলেও আগে বাড়ি ছিল চৈতন্যপুর দেউলপোতায়। অজিতের বাবা ঠেকুয়াচকে ঘরজামাই থেকে যান। বাবা ঠাকুর গড়ার মিস্ত্রি ছিলেন। পটের গান গাইতে পারতেন। পট আঁকতে পারতেন না। অজিতের মামার বাড়িতে পট আঁকা ছিল। অজিতের দাদু রমানাথ চিত্রকর পট আঁকতেন, গান গাইতে পারতেন, ঠাকুরও গড়তেন। চৌদ্দ বছর বয়স থেকে পট আঁকা শিখেছেন। বছর দশেক আগে অজিত ঠাকুরও গড়তেন। পয়সাকড়ি ঠিকমত না পাওয়ার জন্য ঠাকুর গড়া ছাড়লেন। বিভিন্ন বিষয়ে অজিত পট এঁকে চলেছেন। ধর্মমূলক ছাড়াও জন্ম নিয়ন্ত্রণ, ছেলেমেয়ে সমান, শিশু পুষ্টিসাধন, পরিবেশ দূষণ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, যীশুর জন্মকথা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, পটুয়া দর্পণ এইডস প্রভৃতি বিষয়ে পট এঁকেছেন। অজিত চিত্রকরের পাঁচ ছেলে তিন মেয়ে। ২৮ বছরের মধু চিত্রকর দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে। মুসলমান নাম মহম্মদ। পট আঁকতে এবং গাইতে পারে। কিন্তু শুধু পটে চলে না। তাই রিক্সা টানে। মাটির পুতুলও গড়ে। ওর স্ত্রীও গান জানে, ছবি আঁকে। ও বিয়ে করেছে নানকারচকে। মমতাজ (১৭) ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে। আঁকতে পারে, গান জানে না। আর একটা নাম ফেলা চিত্রকর। রিক্সা টেনেই রোজগার। আলাদিনের (১৪) আর কোন নাম নেই কিছু কিছু আঁকতে পারে। এখন পড়ছে। সাকিলার (১১) আর একটা নাম স[illegible]লা। পটের ব্যাপারে ঝোঁক থাকলেও তেমন কিছু জানে না। আট বছরের ফুরকির আর একটা নাম সাহানা। এছাড়া রাজবান (৫) এবং সাজাহান (৩) নামের আরও দু'টো ছেলে আছে। অজিত চিত্রকরের এই ছেলেমেয়েরা 'সাইড ব্যবসা' হিসাবে পটের কাজ করে। অজিতের স্ত্রী আবিরণ [আভাময়ী চিত্রকর (৪২)] পট আঁকা গাওয়া জানেন। ঠাকুরও গড়েন। পটই একমাত্র সম্বল, অজিতের জায়গা-জমি নেই। জেলাভিত্তিক প্রথম, দ্বিতীয় আর রাজ্যভিত্তিক প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন। পটের জন্য আই আর ডি পি লোন পাঁচ হাজার টাকা পেয়েছেন। দু'বার দিল্লি এবং বরোদা গেছেন। হঠাৎ প্রসঙ্গ ছাড়াই সুরের কথায় চলে গেলেন। বলছিলেন পটের গানের সুরের পরিবর্তন হচ্ছে। তিনি নিজে পরিবর্তিত সুর অনুকরণ করতে চান না। তবে সুরের পরিবর্তনকে স্বাগতম জানান। জাতপাতের কথা উঠায় বললেন '১৩৬২ সালে হিন্দু মহাসভার হিড়িক হয়, হিন্দু অথবা মুসলমান যেকোন

এক দিকে যেতে হবে। তখন বামুনটামুনের অসুবিধার কথা ভেবে আমরা মুসলমান হয়ে গেলাম। তবে রাজ্যসরকার একসময় কাজের সুবিধার জন্য সকলের এক পদবী নেওয়ার কথা বলতে সবাই চিত্রকর হলাম।'

(ঞ) নাড়াজোলের কানন চিত্রকর (৪০) কলকাতায় দশ-বারো বার পুরস্কার পেয়েছেন। দিল্লিতে রূপোর মেডেল পেয়েছেন ভারত উৎসবে। হরিয়ানায় আন্তর্জাতিক মেলায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন। রাজস্থানেও পুরস্কার পেয়েছেন। স্ত্রী সবিতা (সবুরণ) রাজ্য পুরস্কার পেয়েছেন। সবিতার বাবা গোলাম চিত্রকর (সতীশ) এবং মা গোলাপি বিবি পট আঁকা জানতেন। কাননের বাবা মেহের চিত্রকর। মা গৌরী চিত্রকর। এঁদের বাড়ি ঘাটালের নির্ভয়পুরে। কানন নাড়াজোলে বিয়ে করে সেখানেই থাকেন। কাননের দু'মেয়ে এক ছেলে। ১৪ বছরের বাপি চিত্রকর (সোলেমান) ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে। এখন মুম্বাইতে সোনার দোকানে কাজ করে। বার বছরের জরিনা চিত্রকর ক্লাস ফাইভে পড়ে। সে বাবার কাছে কাজ শিখছে। দশ বছরের লক্ষ্মী যে ক্লাস টু-তে পড়ে সেও কাজ শিখছে। মাটির পুতুল গড়তে পারে। কানন-সবিতার শুধু পট এঁকে চলে না। তাই মাটির পুতুলও গড়েন। দু ডেসিমেল বাস্তু ছাড়া কোন জায়গাজমি নেই। পটের কাজের জন্য সরকারি কোন ঋণও পাননি।

(ট) হবিচক-নানকারচকের নিরঞ্জনের ছেলে তপন চিত্রকর (২৬)। মুসলমান নাম আবু বক্কর। তপন পুরোপুরি পটের উপর নির্ভরশীল। তপনের মামার বাড়ি পাথরপ্রতিমার দঃ লক্ষ্মীনারায়ণপুর গ্রামে। মামারা কেউ পট আঁকছেন না। এক সময় আঁকতেন। পুতুল গড়াও বাদ দিয়েছেন। এখন তাঁরা বস্তা, টিন ব্যবসা করছেন। তপন বিয়ে করেছেন কেশববাড়ে। শ্বশুর অছিয়া চিত্রকর কোনদিন পট আঁকেননি। রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। স্ত্রী ময়না চিত্রকর [মমতা] (১৯) পট আঁকা জানে না। শ্বশুরের কাছে পট আঁকা শিখেছে। একটা ছেলে, চার বছর বয়স তার।

(ঠ) নয়ার মন্টু চিত্রকর (২৫) দাদা গুরুপদ চিত্রকরের কাছে পট আঁকা শিখেছেন। মুসলমান নাম কোচাকোচি। চতুর্থ শ্রেণী অবধি পড়াশোনা। বাবা সেখ গোফুর (গোবর্দ্ধন) পট আঁকা জানতেন না। মা খাতুন চিত্রকর [লক্ষ্মী] (৬৫) পটের গান জানেন। আঁকতে জানতেন না। মন্টু ১৩ বছর বয়স থেকে পট আঁকা শিখেছেন। মন্টুর স্ত্রী জবা চিত্রকর (জহরুন) টিন কাটা পটুয়া পরিবারের। এই পরিবারে এসে পট আঁকা শিখেছেন। মন্টুর বাবা টিনকাটা পটুয়া, মা পটুয়া বাড়ির। মন্টু গানে যুব নেহরু পুরস্কার পেয়েছেন। পট ছাড়া লোকের জমিতে ভাগ চাষ করে সারা বছরের খাবার সংগ্রহ করেন। পট বেচে আট কাঠা জমি কিনেছেন। মন্টু নিজে গান লেখেন না। মামা, দাদার গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন। মন্টুর দুই সন্তান। মুসলিমা চিত্রকর [মৌসুমী] (৪), সঞ্জু [সঞ্জয়] (দেড়)।

(ড) তমলুক মহকুমার কাখরদার বাবলু চিত্রকরের (৩৭) বেশ শক্তসমর্থ চেহারা। বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারেন। এক কথায় যাকে বলে স্মার্ট। বাবলুর মুসলমান নাম বাহারউদ্দিন। ক্লাস ফোর অবধি পড়াশোনা করেছেন। বাবলু অজিত চিত্রকরের কাছে পট আঁকা শিখেছেন।

বাবার নাম অমর চিত্রকর [উমর] (৭২)। পট আঁকেন। গান লেখেন না। তবে পট দেখাতে যান গ্রামে। মা মীনু চিত্রকর (৪৫) পট আঁকতে জানেন। '৯৫ সালে রাজ্য পুরস্কারে প্রথম স্থান পেয়েছেন। বাবলুর তিন ছেলে এক মেয়ে। বড় ছেলের বয়স ১২, ছোটর বয়স ৩। কেউই পট শিখছে না। বাবলু বলছিলেন বংশগত পরিচয় দেওয়ার জন্য একটু শিখিয়ে দিতে হবে। তবে জীবিকানির্বাহ করার জন্য অন্য কিছু শিখতে হবে। এখন পি ডব্লিউ ডি-এর রাস্তায় থাকেন। তবে ৯ কাঠা জায়গা কিনেছেন। পট ছাড়া অন্য কোন রোজগার নেই। বলছিলেন 'আমার জীবনে পটটাই সম্বল।' পুতুল গড়ার জন্য আই আর ডি পি-র লোন পেয়েছিলেন পাঁচ হাজার টাকা। সেটা শোধ হয়ে গেছে। 'সবাইকে নিয়ে একটা কো-অপারেটিভ করতে চেয়েছিলাম। এখনও সেই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি।' চোখমুখে খুবই দৃঢ়তা। বাবলু পটকে আধুনিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করছেন। শালোয়ারকামিজ, টেবিল ক্লথ, টি শার্ট, শাল প্রভৃতিতে পটের কাজ করছেন। কাপড় কিনে দিলে তাতে পটের কাজ করেন। কাপড় অনুসারে দাম হয়। সুতির কাপড় ৪০০ টাকা। তসর হলে ৫০০-৬০০ টাকা। 'কাহিনীর উপরও রেট হয়।' বাবলু চিত্রকর শাড়িতে গ্রাম বাংলার পট এঁকে ৮০০ টাকা নিয়েছেন। পুজো প্যান্ডেলে পটের কাজ হচ্ছে। মাটির সরা, কুলোর ওপরও কাজ হচ্ছে। কালীঘাটের প্যান্ডেলে কাজ করার জন্যও বাবলুকে চিঠি দিয়েছিল। কলকাতার পিকনিকগার্ডেনে সুনীল নগরে দুর্গা পূজার প্যান্ডেলে মেদিনীপুরের কোন এক রাজবাড়ির দৃশ্য এঁকেছেন বাবলু চিত্রকর এবং তাঁর সঙ্গীরা। এতে ১১ হাজার টাকা পেয়েছেন। 'ছ' হাজার টাকার মেটেরিয়াল চলে গেছে।'

(ঢ) পটুয়াপাড়ার মেয়েরাও খুব একটা পিছিয়ে নেই। গৌরী চিত্রকরতো দিল্লি থেকে ১৯৮৫ সালে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার নিয়ে এসেছেন। একটা পট আঁকার স্কুলও খুলেছিলেন। তাঁর মেয়ে ময়না চিত্রকর (২৫)। সেভেন্ পর্যন্ত পড়েছেন। বিয়ে হয়েছে জয়দেবের সঙ্গে। জয়দেবের মুসলমান নাম জয়ুনুদ্দিন। এঁরা নির্ভয়পুরেই থাকেন। ১০ বছর বয়স থেকে মায়ের কাছেই ময়না পট আঁকা শিখেছেন। ময়না রাউলকেল্লা, ম্যাড্রাস, বাণীপুর, ভূপাল প্রভৃতি বহু জায়গা ঘুরে এসেছেন। দু'টো রাজ্য পুরস্কার পেয়েছেন। দুর্গা, মনসা, সীতাহরণ, সাবিত্রীসত্যবান, দাতাকর্ণ প্রভৃতি বহু বিষয়ে পট এঁকেছেন। ময়নার দু'ছেলে এক মেয়ে। বড় ছেলে মোহন্তের (মমতাজ আলি) বয়স নয়। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ছে। পটের ব্যাপারে ঝোঁক নেই। শ্রীমন্তর (ইনতাজ) বয়স ৫। সুষমার (সাবিনা) বয়স ৪। এঁরা পট ছাড়াও বাড়িতে ছোট ছোট পুতুল গড়েন। জায়গাজমি নেই। কোন রকমে সংসার চলে যায়।

(ণ) করুণা (৩৫) নিরক্ষর। মুসলমান নাম কহিনুর। বছর পাঁচেক পট আঁকা শিখছেন। মামা দুখুশ্যামের কাছেও শিখেছেন। স্বামী অজয় পট আঁকেন, দেখান। 'ওঁর একার রোজগারে হচ্ছে না বলে আমাকে বেরোতে হচ্ছে। যাহোক কিছু রোজগার হয়ে যাচ্ছে।' সাবিত্রীসত্যবান, কৃষ্ণলীলা, গঙ্গা-দুর্গার ঝগড়া, সীতাহরণ প্রভৃতি বিষয়ে পট এঁকেছেন। চারটে সন্তান, করিম চিত্রকর (১৭) চায়ের দোকানে কাজ করে। পুতুল চিত্রকর (১১) পটের গান করে, আঁকে কোনরকমে। রহিম চিত্রকর (৯) — একটা দু'টো গান

শিখেছে। মমিন চিত্রকর (৭) মার সঙ্গে গান করছে। সাক্ষরতায় 'কহেনুর' সই করতে পেরেছেন। করুণাটা লিখতে পারেন না। সরকারি ঘরে কহেনুর লেখা আছে। এখন সরকারি খাস জায়গায় আছেন। বলছিলেন 'শ্রীরামপুরে পোল হলে কোথায় যাব ঠিক নেই।' জীবিকা একমাত্র পট দেখানো।

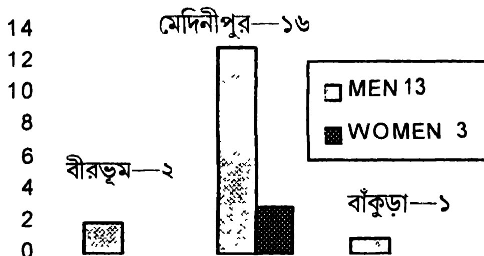
(ত) দশ বার বছর বয়স থেকে পট আঁকছেন যমুনা চিত্রকর (৪০)। মুসলমান নাম বাহারযান। বাবার সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ঘুরতেন। এমনিতে নিরক্ষর। তবে শুনে শুনে গানটা মুখস্থ হয়ে যায়। পট আঁকতে পারেন। মেয়ে বলে বাড়ি বাড়ি যান না পট দেখাতে। তবে 'মেলা ঘাটে' পট নিয়ে যান। তখন গান গেয়ে শোনান। সৎ মায়ের সন্তান, কৃষ্ণলীলা, নিমাই সন্ন্যাস, মনসা মঙ্গল, দুর্গা, সাবিত্রীসত্যবান, সীতা হরণ, সেতুবন্ধন প্রভৃতি বিষয়ে পট এঁকেছেন। বলছিলেন, 'পেটের জ্বালায় এসব করতে হচ্ছে। দু'টো একটা বিক্রি করে যদি খেতে পাই।' পট আঁকার সময় কোন সংস্কার নেই। স্বামী মন্টু চিত্রকর পট আঁকতে পারেন না। তবে পটের গান করেন। ছেলে বাহাদুর (২১), মণিমালা (২৫) মেয়ে ময়না (১৭), পট আঁকা শিখেছে। দু'টো মেয়েরই বিয়ে হয়েছে নয়ায়। ছোট জামাই মালেক চিত্রকরকে পট আঁকা শিখিয়েছেন শাশুড়ী।

(থ) বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের কাদাকুলি পার হয়ে শাঁখারি বাজারের কাছেই সুধীর ফৌজদারের বাড়ি। ভাদ্র মাস থেকে সুধীর বাবুর হাতের কাদা ধোয়ার সময় থাকে না। আগেভাগে মাটির প্রতিমা গড়ার কাজ সেরে নেন। মাটির প্রতিমা গড়ার কাজ যখন অনেকটা হাতের মধ্যে এসে যায় তখন শুরু করেন পট। সুধীর ফৌজদার বিষ্ণুপুরের শেষ পটুয়া শিল্পী। সুধীর বাবুরও কোনও উত্তরাধিকার গড়ে ওঠেনি। এর পাঁচপুত্র দশাবতার তাস ও নকশা তাসের বিষয়ে আগ্রহী। সুধীর বাবুর বিখ্যাত কাজ মল্ল রাজবাড়ির বড় ঠাকুরন, মেজ ঠাকুরন ও পটেশ্বরী। এখানেও পটের উপকরণ বাংলার অন্যান্য পটুয়াদের মতোই। তবে পটের ঠাকুরের চাহিদা বাড়েনি। বরং ভবিষ্যতে কমে যাবে।

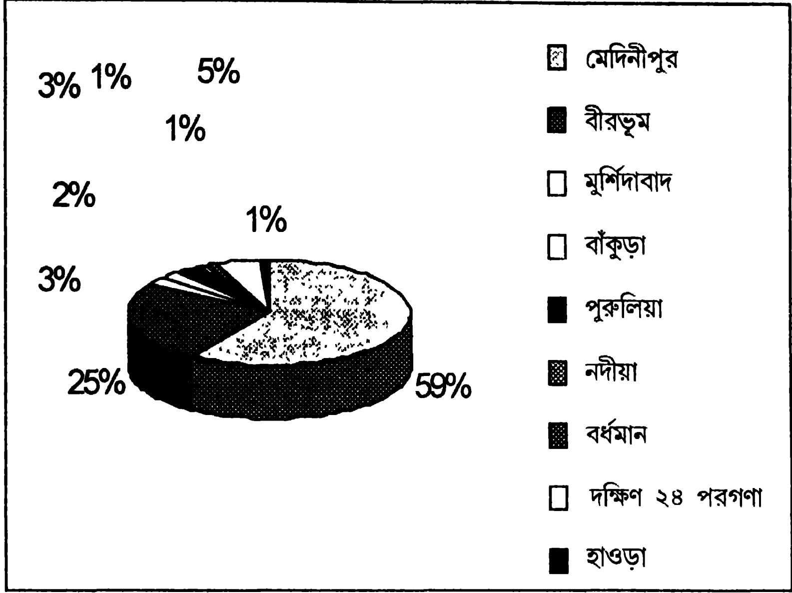
(দ) কোন কোন গ্রাম বিশেষ কোন কারণে পরিচিত হয়। হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া থানার চণ্ডীপুর বেশি পরিচিত পটুয়াপাড়ার জন্য। আগে ১০-১২ ঘর পটুয়া ছিলেন। এখন পাঁচ ঘরে ঠেকেছে। দিনকাল পাল্টালো। পট হারিয়ে গেল। পটুয়াপাড়ার ছেলেপিলে যে হাপু গান করত তাও হারাল। পটুয়া ছেলেরা পিঠে বেত মেরে হাপু খেলা দেখাত। হাপু গান করত। গৃহস্থের মনোরঞ্জন হলে ভিক্ষা মিলত চাল পয়সা প্রভৃতি। এখানকার প্রফুল্ল চিত্রকর-এর (৬২) একসময় খুব নামডাক ছিল। তিনি মুদিখানায় বসে বিড়ি ফুঁকছেন আর কথা বলছেন, 'গ্রামের লোকেরা শহুরে মেজাজ পেলেন। পট আঁকা কিংবা হাপু খেলা আর চলল না। ভিক্ষে মিলল না। তবে মানুষের দেবদেবীর প্রতি আকর্ষণ থাকল, আমরা পট আঁকা ছেড়ে ঠাকুর গড়া ধরলাম।' হাওড়া থেকে ৪০ কি.মি. দূরে মেচেদা লাইনে কুলগাছিয়া স্টেশন। স্টেশনের খুব কাছের গ্রাম চণ্ডীপুর। স্টেশন থেকে কটক রোড ধরে পূবে আধ মাইল হাঁটলেই পটুয়াপাড়া। পাকা সড়কের পাশেই। রিক্সা নিয়ে যাওয়া যায়। বাসও চলছে।

(ধ) দক্ষিণ ২৪ পরগণার সাগরদ্বীপের কয়লাপাড়া, পাথরপ্রতিমার চতুর্থখন্ডে দক্ষিণ লক্ষ্মী-নারায়ণপুর গ্রামে, ২৫ নং লাটে উত্তর মধ্য কুমড়াপাড়ার ঘোলা গ্রামে, ডায়মন্ডহারবার থানার বোড়ে বা বড়িয়া গ্রামে, ফতেপুর গ্রামে, বারুইপুরের গোবিন্দপুর গ্রামে, আখড়াপুঞ্জিতে এবং দেউল্যা পোটোপাড়ায় কোনো এক সময় পটুয়ারা ছিলেন এবং সেই গ্রামগুলিতে পট আঁকা হত। বর্তমানে এই গ্রামগুলিতে পটুয়ারা থাকলেও পট আর আঁকা হয় না। পটের বদলে তাঁরা মাটির পুতুল কিংবা মাটির মূর্তি তৈরি করেন। দঃ ২৪ পরগণার এই পটুয়াদের এখন একেবারে ল্যাজেগোবরে অবস্থা। টিঁকে থাকার জন্য নানারকম ফন্দিফিকির বার করতে হয়েছে। মায় পদবি, নাম, ধর্মও পাল্টাতে হয়েছে। আখড়াপুঞ্জিতে ২০ ঘর পোটো। এর মধ্যে ১ ঘর কর্মকার, ১ ঘর গায়েন, ৯ ঘর পটিদার, ৯ ঘর চিত্রকর। এঁরা কেউই এখন আর পট আঁকেন না। এবং পূর্বপুরুষেরাও যে পট আঁকতেন সে কথা অস্বীকার করার চেষ্টা করেন। পট আঁকা এবং পটুয়াদের ধর্মীয় গন্ডগোলটাকে (হিন্দু মুসলমান মিশ্রীরীতি) মন থেকে মানতে পারেন না। বোড়ে গ্রামে বাইরের অচেনা কাউকে দেখলেই মুসলমান সন্দেহ করা হয়। এই গবেষককেও তাঁরা দেখে বিব্রতবোধ করেছিলেন। কয়েকদিন আগে অন্য গ্রামের এক চিত্রকর এসে এঁদের মুসলমান হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সেই থেকেই এঁদের রাগ। বাগদার মূর্তি শিল্পীরা জানিয়েছেন, তাঁদের পূর্বপুরুষেরা পট আঁকতেন। এখানকার কেশব পাল বর্তমানে অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পন্ডিচেরী প্রভৃতি জায়গাতে মাটির মূর্তি তৈরি করতে যান। বারুইপুর গোবিন্দপুর পোটোপাড়ায় এখন মাটির পুতুল তৈরি হয়। আগে পট আঁকা হত। পোটো পাড়ার এক উত্তরাধিকারী পাঁচি চিত্রকর। নিজের বয়স হিসেব করেছেন। বলেছেন, 'মনে হচ্ছে পঞ্চাশ বয়েস হবে।' পুতুলের চোখ আঁকতে আঁকতে পাঁচি বলছিলেন, 'আমরা খেতে পাচ্ছি না। পরতে পাচ্ছি না, গরমেন্টের ঘরে লোন করেছি। ঐ যে যেটা শিল্পীদের দেয়।'

পশ্চিমবঙ্গে জেলাগুলির প্রতিনিধিত্ব



পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী পটুয়ার লেখচিত্র



◆ সূত্র ঃ অষ্টম অধ্যায় ◆

১. পটুয়া সঙ্গীত ঃ গুরুসদয় দত্ত (১৯৩৯, ক. বিশ্ববিদ্যালয় সং)
২. পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি [১৯৫৭] (১ম খন্ড, পৃঃ ৩১১)—বিনয় ঘোষ
৩. Kalighat Pats : annals and appraisal (1966) p.-6 Prodyot Ghosh
৪. বাংলার লোকসাহিত্য (১ম খণ্ড) [১৯৬২] পৃঃ ২৩৪—৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য
৫. Tribes and casts of Bengal : H. H. Rishley
৬. বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব/পটুয়া ও পটশিল্প (১৯৮৯) পৃঃ ১২৫ ঃ বিনয় ঘোষ
৭. বীরভূমের যম পট ও পটুয়া (১৯৭২) পৃঃ ১৫ ঃ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়
৮. পঞ্চোপাসনা (১৩শ অধ্যায়) ঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৯. তোমাদের মায়ার অন্ত নেই, আনন্দবাজার পত্রিকা (১৪/৪/৯৩) ঃ দিব্যজ্যোতি মজুমদার
১০. মুর্শিদাবাদের পটুয়া ঃ জীবনচর্চা ও শিল্পচর্চা, মুর্শিদাবাদ চর্চা (পৃঃ ১৭৭), পুলকেন্দু সিংহ
১১. দেখা হয় নাই (পৃঃ ৩৭) ঃ অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়
১২. দেখা হয় নাই (পৃঃ ৩৭) ঃ অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩. মৃৎ শিল্পীরা টিকে থাকতে ধর্ম পাল্টাচ্ছেন, যুগান্তর (৩/৫/৯৪) ঃ দীপককুমার বড় পন্ডা

● নবম অধ্যায় ●

পট-সঙ্গীতবিষয়ক আলোচনা ও সাহিত্য মূল্য

পটচিত্র প্রাচীন ভারতের অন্যতম চিত্রশিল্প। তৎসংশ্লিষ্ট পটুয়াদের গানও সুপ্রাচীন। সেই সময় থেকে পটের গান আজও প্রচলিত। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো শিল্প ও সঙ্গীত হিসাবে যথেষ্ট মূল্যবান ও মর্যাদার যোগ্য হলেও সেগুলি ছিল যেন বনকুসুমের মতো অবহেলিত ও বাংলার বিদ্বজ্জনসমাজ এবং লোকসাধারণের দৃষ্টির প্রায় অগোচরে। আমাদের সৌভাগ্য, সেকালের অমর সেসব লোকশিল্প সর্বসাধারণের দৃষ্টিপ্রদীপের সামনে আসে কারও কারও অনলস, শ্রমসাধ্য সাধনপ্রয়াসে, এই বিশ শতকেই । এই প্রসঙ্গে অবশ্য, ১৯ শতকের নব্য ভারত, বান্ধব প্রভৃতি সাময়িকপত্রে কিছু লেখালেখি হয়। কিন্তু সেগুলি সংক্ষিপ্ত — দীর্ঘ আলোচনা নয় এবং বিক্ষিপ্ত। প্রায় অন্ধকারেই ছিল পটচিত্র, বলা যেতে পারে। কালক্রমে এই বিষয়টি জনসমক্ষে আসে।

এই শতকের চতুর্থ দশকে লোকশিল্প-সাহিত্য ও লোকনৃত্য রসিক গুরুসদয় দত্ত সরকারি উচ্চস্তরের কর্মে ব্যাপৃত থেকেও ব্যক্তিগত প্রয়াসে সযত্নে সর্বপ্রথম ব্যাপক পটুয়া গান সংগ্রহ, সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নানা স্থানে সমিতি গঠন, প্রদর্শনীর সুব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে এগুলিকে আলোর সম্মুখে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, ডঃ সুনীতকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বিদগ্ধ মনীষীদের কাছ থেকেও এগুলির উচ্চস্তরের জাতীয় শিল্প-স্বীকৃতি সংগ্রহ করতে তিনি সমর্থ হন। এই ব্যাপারে তাঁর প্রয়াস ছিল খুবই আন্তরিক। নিঃসন্দেহে বলা যায়, অনলস অব্যাহতও বটে। ফলশ্রুতি হিসাবে সেই চতুর্থ দশকের শেষভাগে আমরা পাই, তাঁর সম্পূর্ণাঙ্গ, একটি গবেষণামূলক অতুলনীয় আলোচনাগ্রন্থ 'পটুয়াসঙ্গীত' (১৯৩৯)। তাঁর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা সঞ্চালিত করে অনেককে। পরবর্তীকালে লোকসংস্কৃতিবিদ্ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর 'বাংলার লোকসাহিত্য' (১ম এবং ৩য় খন্ড) ইত্যাদি গ্রন্থে পটুয়াদের গান নিয়ে কম-বেশি আলোচনা করেন। আরও পরবর্তীকালে অন্যান্য গবেষক-আলোচকগণ পট, পটুয়াদের গান সম্পর্কে আলোচনা করেন। কিন্তু পটুয়াদের গানের নামকরণ ব্যাপারে তাঁরা কেউ একমত হতে পারেন নি। অর্থাৎ নানা মুনির নানা মত।

গুরুসদয় দত্ত বহু শ্রমে এদের সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করে তাঁর 'পটুয়াসঙ্গীত' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে। গ্রন্থের নামকরণে পটুয়া সঙ্গীত, গ্রন্থমধ্যে পটগীতি, (পট) গীতিকা কথাগুলি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। 'পটুয়া সঙ্গীত' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন 'বাংলার অধ্যাত্ম জীবনের সর্বাপেক্ষা গভীর স্তরের ভাবধারা ও রসধারা এই পটগীতিতে রূপায়ণ লাভ করিয়াছে।' তিনি হয়তো উন্নত রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল সঙ্গীত বা নজরুল গীতির মর্যাদার কথা ভেবে কিংবা পট চিত্র-শিল্প, সঙ্গীতকে নাগরিক মনের কাছাকাছি নিয়ে আসবার উদ্দেশ্যে সঙ্গীত, গীতি এই কথাগুলি ব্যবহার করেছেন এবং পটুয়া সঙ্গীত ও পটগীতি সমার্থক ও যথার্থ পরিচায়ক মনে করেই ততটা সচেতনতা দেখান নি। আবার

ময়মনসিংহ গীতিকা, পূর্ববঙ্গ গীতিকা ইত্যাদি গীতিকার সঙ্গে পটুয়াদের গানের কাহিনীমূলকতা বা কাহিনীপ্রাধান্য, গায়নভঙ্গি প্রধানতার সাযুয্য লক্ষ্য করে (পট) গীতিকা কথাটি ব্যবহার করে থাকতে পারেন। বস্তুত নামকরণে তাঁর মনে দ্বিধা বা সচেতনতার অভাব লক্ষ্য করা যায়।

পরবর্তীকালে অপর লোকসংস্কৃতিবিদ্ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বিভিন্ন সময়ে রচিত তাঁর বিভিন্ন 'গ্রন্থে' পটের গানের ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করেন। তাঁর 'বাংলার লোকসাহিত্য' (১ম খন্ড) গ্রন্থে পটুয়ার গানকে 'পটুয়া গীতি' 'পটুয়া সঙ্গীত' অভিধায় চিহ্নিত করে, পরে ঐ গ্রন্থের তৃতীয় খন্ডে 'পটুয়ার গান' কথাটি ব্যবহার করেন। তিনি বলেন 'গাহিবার উদ্দেশ্যেই রচিত বলিয়া পটুয়া গীতির বহিরঙ্গ অত্যন্ত শিথিল'।[১] অন্যত্র বলেছেন, 'পটুয়া গীতির কোন কোন অংশ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে ....পটের মধ্যস্থলে স্বতন্ত্র বিষয়ের চিত্রও স্থান পায়।'[২] পটুয়া গীতি শব্দটি তিনি খুব সরলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, 'এই চিত্রগুলি পটুয়াগণ গীতি সহযোগে নিজেরাই ব্যাখ্যা করিয়া গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায়।'[৩] এ বিষয়ে তিনি আরও বলেছেন, 'পটুয়া সঙ্গীতের কোন স্থায়ী মূল্য নাই।'[৪] এবং 'সেইজন্য পটুয়া শিল্প ধ্বংস হইবার সঙ্গে সঙ্গে পটুয়া সঙ্গীতও লুপ্ত হইয়াছে।'[৫] পটুয়া গীতি ও পটুয়া সঙ্গীত অনেকটা কাছাকাছি বা সমার্থক হলেও পটুয়ার গান কথাটি অনেকটা দূরবর্তী। ডঃ ভট্টাচার্য হয়তো শেষোক্ত নামটি ব্যবহারের দ্বারা পটুয়াদের উপর গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন এবং লোকজীবনের কাছাকাছি আসতে চেয়েছেন। অনেক পরে ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহর্ষ মল্লিক ডঃ ভট্টাচার্যের পটুয়ার গান নামকরণটি 'অত্যন্ত সহজ সরল প্রায় লোকজীবনের কাছাকাছি' মনে করে স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি পোটো গান নামটি আরও সরল হবে বলে জানিয়েছেন।[৬] অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'দেখা হয় নাই' গ্রন্থে 'পাকুড়হাঁস' নিবন্ধে পটুয়াদের গানের স্থলে 'পটুয়া গীতি' ও 'পটুয়া সঙ্গীত' দু'টি নামই ব্যবহার করেছেন।[৭] অধ্যাপক জয়ন্ত চক্রবর্তী 'দেশ' পত্রিকায় ৩.[৮] বাংলার পট, পটুয়া ও পটগীতি নিবন্ধে পটগীতি নামটি ব্যবহার করেছেন। এইভাবেই দেখা যায় পটুয়াদের গানের নামকরণের ক্ষেত্রে অনেক মতদ্বৈধতা। যার ফলে গবেষক, আলোচকগণ বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়েন। সুতরাং পটুয়াদের গানের নামকরণ নিঃসন্দেহে একটি আলোচনার ও গভীবভাবে বিচারের বিষয় বটে। পট সঙ্গীত অন্যতম লোকসঙ্গীত। তাই, পটুয়াদের গানের নামকরণ প্রসঙ্গে সহজেই প্রথমে অন্যান্য লোকসঙ্গীতগুলির নাম---প্রসঙ্গ এসে পড়ে। এদেশে লোকগীতিগুলির নামকরণের ব্যাপারে তেমন কোনো বাঁধাধরা সুনির্দিষ্ট সূত্র বা নিয়ম অনুসৃত হয়েছে, এমন মনে হয় না। কোনো ক্ষেত্রে সম্প্রদায়বিশেষ, কোনো ক্ষেত্রে কর্ম, কোনো ক্ষেত্রে উৎসব বা প্রথা, কোনো ক্ষেত্রে বা সুর, এমন কি কোনো ক্ষেত্রে গায়নভঙ্গি (গায়কের উপবেশন ভঙ্গি) প্রাধান্য লাভ করেছে, যেমন — বাউল গান, ভাওয়াইয়া গান যথাক্রমে বৈষ্ণব ও উত্তরবঙ্গের বাউদিয়া সম্প্রদায়ের গান; ফকিরী গান, দরবেশী গান, ইসলাম সম্প্রদায়ের গান, নৌকা চালনার গান, ছাদ পেটানোর গান, হলকর্ষণ, তাঁত বোনা, ধান ভানা ইত্যাদি কর্ম উপলক্ষে 'নৌকা বাওয়া' 'ছাদ পেটা' 'লাঙ্গল চাষ' 'তাঁত বোনা' 'ধান ভানা' ইত্যাদি গান; নীল (গাজন) পূজা সংক্রান্ত 'নীল পূজার গান' মহরম উপলক্ষে 'জারি গান' মনসা পূজা

উপলক্ষে 'মনসার ভাসান', নৌকা বাওয়া উপলক্ষে ভাটিয়ালি সুরে ভাটিয়ালি গান; বিভিন্ন কর্ম উপলক্ষে গায়কেরা সারিবদ্ধভাবে উপবিষ্ট হয়ে গান করে বলে — নানা ধরনের সারি গান (ছাদ পেটা, ধান ভানা, নৌকা বাওয়া) উল্লেখ্য।

নামকরণের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোনো নিয়ম অনুসৃত না হলেও নামকরণের সার্থকতার দিকে অবশ্যই সতর্ক নজর রাখা হয়। এটাই স্বাভাবিক। নামকরণকারীকেই সতর্ক নজর রাখতে হয়। নামকরণের ব্যাপারে কাদের ভূমিকা থাকে? বস্তুত লোকসাধারণ কিংবা আলোচকদের ভূমিকা থাকতে পারে। আমাদের মতে পটুয়াদের গানের একটি সর্বজনমতগ্রাহ্য নাম থাকা বাঞ্ছনীয়। সচেতনভাবে পটুয়ারা তাদের গানের কোনো নামকরণ করেন নি। তবে তাঁদের পছন্দ কিংবা তাঁদের উল্লেখ সর্বাগ্রেই গুরুত্ব সহকারে বিচার করা দরকার এবং গ্রহণীয় মনে হলে গ্রহণ করা কর্তব্য। লোকশিল্প ও লোকসঙ্গীত আঞ্চলিক মানব প্রকৃতি, ভাষা, ভাবধারা, আবহাওয়া, স্থানীয় শাসকের রুচি ইত্যাদি অনুযায়ী সৃষ্টি হয়। সুতরাং পটের গানের নামকরণ ব্যাখ্যা সূত্রে আঞ্চলিক শব্দাভিধান - শব্দভান্ডারের প্রয়োজন হয়। তবে পট ও পটের গানের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক শব্দভাণ্ডার অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই। কারণ, পট শব্দটি প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ — পট্ট থেকে উৎপন্ন। বাংলায় এর তৎসম রূপ পট। এর উত্তর সম্বন্ধবাচক 'উয়া' প্রত্যয় যোগে পটুয়া শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। প্রাদেশিক রূপ পউট্টা। তা থেকে পটো, পোটো কথাগুলি প্রচলিত। এ ব্যাপারে আমাদের কোনো সমস্যা বা দুশ্চিন্তা নেই।

এখন পটো, পোটো বা পটুয়া কথার সঙ্গে গীতিকা, গীতি, সঙ্গীত বা গান-কথাগুলির সঙ্গে কোন কথাটি যুক্ত করলে একটি যথার্থ তাৎপর্যপূর্ণ নাম সৃষ্টি হয়, তাই দেখা যেতে পারে। আমরা বহু সংখ্যক পটুয়ার সঙ্গে আলোচনা বা যোগাযোগ করে দেখেছি তাদের অধিকাংশই পটুয়ার গান বা পটের গান কথাটি পছন্দ করেছেন কিংবা নিজমুখে উল্লেখ করেছেন। নামটি যথার্থ। এরূপ মন্তব্য করার পক্ষে যুক্তি আছে যথেষ্ট। পটের গান পটের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। যার ফলে পটচিত্র উন্মোচিত হলে তার পরিপূরক গানের আবৃত্তি অপরিহার্য হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, কথাটি পটুয়াদের মনের খুব কাছাকাছি। তৃতীয়ত, এটি সহজ, সরল, সর্বজনবোধ্য, সহজউচ্চার্য। চতুর্থত, কথাটির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক চিত্র যেন কথা বলে ওঠে মুহূর্তে। পঞ্চমত, পটুয়াদের গানের শব্দ ও শব্দার্থের দ্বারা যে ভাবদর্পণ সৃষ্টি হয় তার ওপর মূর্তি, চিত্র প্রভৃতির প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়। ষষ্ঠত, পটুয়ার গান কথাটির দ্বারা গানটি কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত তা যেন সহজে প্রকাশিত হয়। পটের গান — পট সংশ্লিষ্ট গান। অর্থাৎ পট বাদ দিলে যে গানের পৃথক কোন অস্তিত্ব নেই। বাক ও অর্থের সম্পর্কের মতই উভয়ের সম্পর্ক। অপরদিকে পটুয়ার গান বললে জোর দেওয়া হয় পটুয়াদের উপর, যে গান কেবলমাত্র পটুয়াদের দ্বারাই গীত হয়। ব্যাসবাক্যটি হল পটুয়াদের দ্বারা গীত যে গান। মধ্যপদলোপী কর্মধারয় অথবা করণ তৎপুরুষ।

পটুয়াগীতি কোন শ্রেণীর, শুরুতে তা বিচার করার দরকার। শুদ্ধ ধর্মকেন্দ্রিক গানের অভাব নেই এদেশে। আগমনী, বিজয়া, মনসার গান, নীল পূজার গান ইত্যাদি গান এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আবার এমন কিছু গানের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় — যেমন, ধান ভানার

গান, নৌকা বাওয়ার গান, লাঙ্গল দেওয়ার গান, চিঁড়া কোটার গান ইত্যাদি গান যেগুলি বিচিত্র কর্মসূত্রে সৃষ্ট। সে-সব গানকে কর্মসঙ্গীত অভিধায় চিহ্নিত করা হয়। তাহলেও এগুলির অধিকাংশেরই জনমানসে ধর্মীয়ভাব উদ্দীপনে প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় বৈকি! এবং সেগুলি এসেছে সম্মোহনের প্রথা ধরেই। হোলির গান, জন্মাষ্টমী ব্রত গান ইত্যাদি সম্মোহনের সংস্কারসূত্রে সৃষ্ট হলেও জনমানসে ধর্মীয়চেতনা সৃষ্টির প্রেরণা বা আকাঙ্খা সেগুলিতে থাকেই। ধর্মীয় চেতনা এবং সম্মোহনের সংস্কার ধরে উক্ত সঙ্গীতগুলির উদ্ভব যেমন, তেমনি ধর্ম ও সম্মোহননিরপেক্ষ কিছু কিছু লোকগীতির অস্তিত্বও দেখা যায়। ভাটিয়ালি, লেটো, বারমাসিয়া প্রভৃতি এই শ্রেণীতে পড়ে। কেউ কেউ অবশ্য এ গানকে পুরোপুরি সম্মোহন-সংস্কারজাত, মনে করেন। একটু ভাবলে বোঝা যায় পটুয়াদের গান সম্মোহন-সংস্কারজাত অর্থাৎ ধর্ম-ভাবহীন, মনে হলেও তা ঠিক নয়। এর ভিত্তি বাস্তব জগতের একটি বস্তু-চিত্র হলেও এর মাধ্যমে ধর্মীয় চেতনার জাগরণ ঘটানো এর অন্যতম উদ্দেশ্য। সুকুমার রায় লোকসঙ্গীতকে দু'টো ভাগে ভাগ করেছেন।[৮] (১) আদিম সঙ্গীত এবং (২) প্রচলিত লোকসঙ্গীত। এখন আমাদের দেখতে হবে পটের গান শ্রী রায়ের ভাগ অনুযায়ী কোন বিভাগে পড়ে। আদিম লোকসঙ্গীত পাওয়া যায় সভ্যতা থেকে দূরবর্তী নিতান্ত বিচ্ছিন্ন আদিবাসীদের মধ্যে। এক্ষেত্রে পটের গান নিশ্চয় প্রচলিত লোকসঙ্গীতের পর্যায়ে পড়ে।

এই সূত্রে পটুয়া গানের সঙ্গে অন্যান্য লোকসঙ্গীতের তুলনা করলে এর সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে। পটগীতি অন্যান্য লোকগীতি থেকে স্বতন্ত্র, আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। অপরাপর লোকগীতির সঙ্গে একটি তুলনামূলক আলোচনা করলে অন্য লোকগীতির সঙ্গে এর মিল ও অমিল — দুই-ই চোখে পড়ে। ভিক্ষোপোজীবী বৈষ্ণব বৈরাগীরা বাউল গান গেয়ে বাড়ি ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা সংগ্রহ করে এবং ফকিরী, দরবেশী গান গেয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ইসলাম ফকিরেরা মানুষের মনের রোগ দূর করতো বা মানসিক শান্তি বিধান করতো। বিনিময়ে কিঞ্চিৎ অর্থপ্রাপ্তি ঘটতো তাদের। পটুয়ারাও বাড়ি বাড়ি ঘুরে পট দেখিয়ে আনন্দ ও ধর্মভাব যোগাত দর্শক শ্রোতার মনে। বিনিময়ে কিছু অর্থপ্রাপ্তি ঘটতো তাদের। বাংলার গ্রামে গ্রামে আশ্বিনে কার্তিকে টহল গান গেয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে কিছু অর্থ উপায় করেন এক গোষ্ঠীর বৈষ্ণবরা। এঁরা সকলেই খানিকটা অর্থ পান, জনমানসে ধর্মভাব জাগানোর কৃতিত্বটি যেন তাঁদের উপরিপাওনা। এগানের অপর দু'টি বৈশিষ্ট্য — সম্পূর্ণতা ও পরনির্ভরতা। গানের যেসব অপরিহার্য অঙ্গ বা বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ তাল, লয়, সুর, ছন্দ, রস ও ভাবের সাযুজ্য ইত্যাদি তা লক্ষণীয়ভাবে এখানে স্পষ্ট। এবং পরনির্ভরতা কথার অর্থ অপর কোনো বস্তুর জন্যই এই গান গাওয়া হয়। পৃথকভাবে বা সম্পূর্ণ ভিন্ন ক্ষেত্রে বা পরিবেশে যেকোনো সময়ে যে কেউ এই গান গাইলে তা ব্যর্থ হয়। প্রায় সব শ্রেণীর লোকসঙ্গীত সম্পূর্ণ ও স্বয়ংনির্ভর। এই মত প্রায় সব গবেষক কিংবা লোকসংস্কৃতিবিদ পোষণ করেন। এই সূত্রে উল্লেখ করা যায় যে, লোকসাহিত্য-সংস্কৃতি আলোচকগণ পটুয়া গানের এই পরনির্ভরতা বৈশিষ্ট্যের কারণে এ সম্পর্কে ততটা আগ্রহ দেখান না। কেউ কেউ তাঁদের লোকগীতি সংগ্রহে এর উল্লেখও করেন নি। কিন্তু এ গানের অসম্পূর্ণতার

ত্রুটি লক্ষ্য করার মূলে, মনে হয়, এই গান সম্পর্কে তাঁদের উন্নাসিকতাবোধ ভ্রান্ত ধারণা। এখানে থাকে ছন্দ, তাল, সুর, রস ও ভাব। গীতিধর্মিতাও এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পরনির্ভরতা থাকলেও সম্পূর্ণ পরনির্ভরতা লক্ষ্য করা যায় না। ভাদু, টুসু ইত্যাদি যেগুলির ভিত্তি কোনো প্রথা বা উৎসব স্বয়ংনির্ভর তাঁদের মতে। পট গানের ভিত্তিতো পট প্রদর্শন। এমন পট গীতিও আছে যেগুলি যে কোনো ক্ষেত্রে যে কোনো সময়ে গাওয়া যেতে পারে। এ গানকে কেউ কেউ 'ঠিক পণ্য প্রচারের গান' না বললেও এর ব্যবসায়িক দিক অর্থাৎ এতে অর্থোপার্জনের তাগিদ দেখতে পেয়েছেন। কেউ বা বলেন রোজগারের পথ ধরতেই সাপুড়েদের মনসার পট দেখানো ও গান গাওয়া। কিন্তু পুরাণবিশ্বাসী, অধ্যাত্মবাদী বাঙালীকে সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম দর্শন ও আধ্যাত্মিক আনন্দ যোগান দিতে না পারলে এতকাল এর অস্তিত্ব রক্ষা করা কি সম্ভব হতো? মনে হয়, পটুয়াদের অর্থোপার্জনের তাগিদের পাশাপাশি ছিল দর্শক-শ্রোতাকে নৈতিক শিক্ষাদান, আধ্যাত্মিক আনন্দ ও পরমার্থ পুণ্য যোগানোর তাগিদ। এসব গায়কেরা অধিকাংশই কোনো কল্পিত কিংবা কোনো বিদেশী ঘটনা বা কাহিনীকে বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেনি, সেই সুদূর আদিম কাল থেকে।

গুরুসদয় দত্ত পটের গানকে 'গীতিকা' বলেছেন। তিনি লিখেছেন, 'বাংলার জাতীয় শিল্পী পটুয়াগণ তাঁহাদের গীতিকায়, চিত্রে ও মৃন্ময়ী প্রতিমা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয়বিধি বিধানের প্রতি সমাজের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করিয়াছিল।'[৯] গীতিকা ইংরেজী 'ব্যালাড'-এর তুল্য। গীতিকার সঙ্গে পটের গানের মিলও দেখা যায়। উভয় গানেই সুরের থেকেও কাহিনীর গুরুত্ব বেশি। দু'টি গানই ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, সকলের সামনে গাওয়া হয়। পার্থক্যও অবশ্য কয়েকটি আছে। প্রচলিত গীতিকায় চিত্র প্রদর্শনের ব্যাপার নেই। শুধু গানের দ্বারা তৈরি করা হয়। কিন্তু পটের গানে দু'ধরনের চিত্র আছে — গানের নির্মিত চিত্র এবং পটুয়ার অংকিত চিত্র। অমিলের চেয়ে মিল বেশি। তাই পটের গানকে বৃহত্তর অর্থে 'গীতিকা' বলাও যেতে পারে। গীতিকা মৌখিকভাবে রচিত; লিখিত রূপ এর অনুপস্থিত, পটের গানও মৌখিক ঐতিহ্যাশ্রিত। গীতিকা আসলে এক ধরনের লোকসঙ্গীত। পটের গানও এক শ্রেণীর লোকসঙ্গীত। গীতিকায় একটি কাহিনীকে সুরের ও কথার সহায়তায় উপস্থাপিত করা হয়, পটের গানেও একটি কাহিনীকে সুর ও কথাযোগে উপস্থাপিত করা হয়। গীতিকার নাটকীয়তা অন্যতম আকর্ষণ, অপ্রাসঙ্গিক বিষয় এতে বর্ণিত, চমৎকারিত্ব সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষণীয়; পটের গানেও সীমিত সময়ের মধ্যে মূলতঃ অঙ্কিত চিত্রগুলি নির্ভর করে সঙ্গীত পরিবেশিত হতে দেখা যায়। কিছু কিছু পার্থক্যও বিদ্যমান রয়েছে। যেমন গীতিকায় বন্দনা অংশ থাকেই, কিন্তু পটের গানে বন্দনা অংশ অনুপস্থিত, সরাসরি মূল কাহিনী উপস্থাপিত হয়। গীতিকায় মানবিক রসেরই প্রাধান্য কিন্তু পটের গানে প্রাধান্য মূলতঃ পৌরাণিক রসের। গীতিকা উপযুক্ত আসরে পরিবেশিত হওয়ার জন্য রচিত, কিন্তু পটের গান মূলতঃ গৃহস্থের গৃহে পরিবেশিত হয়ে থাকে। গীতিকায় কোনো নীতিবাক্য বা আধ্যাত্মিকতা প্রচারের উদ্দেশ্য অনুপস্থিত, কিন্তু পটের গান একান্তভাবেই উদ্দেশ্যমূলক রচনা, নীতি ও মূল্যবোধের প্রচার এর মূল লক্ষ্য। গীতিকায় ভাটিয়ালী সুর অনুসৃত হয় তাই এর সাঙ্গীতিক আবেদন অনেকখানি। সঙ্গে বাদ্য যন্ত্রও থাকে। পটের গানে মূলতঃ আবৃত্তির ঢং অনুসৃত, সুরবৈচিত্র্য

এতে অনুপস্থিত, কোনো বাদ্যযন্ত্রের সহায়তা নেওয়া হয়না তাই তুলনায় এর সাঙ্গীতিক মাধুর্য কম। তাছাড়া কোনো পট বা চিত্রের সাহায্য নেওয়া হয়না গীতিকায়, যেমনটি পটের গানে নেওয়া হয়ে থাকে।

পটের গান লোকশিক্ষার বাহন হিসেবে কাজ করে। লোকসংস্কৃতিবিদ ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী বলেছেন, 'আমাদের দেশে লোকশিক্ষার যতগুলি মাধ্যম ছিল — যেমন কথকতা, যাত্রা ইত্যাদি পটুয়া সঙ্গীতও এদেরই মত লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল।'[১০] প্রতিটি গানের শেষে পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্ব, পুণ্যের জয়, অধর্মের পরাজয় এবং পাপীর নরকবাস ও যম যন্ত্রণা প্রভৃতি প্রসঙ্গ থাকে। এই সব গানের মূল প্রতিপাদ্য মানুষকে অন্যায় ও পাপকার্য থেকে বিরত করা। পটুয়ারা নিজেরা নিরক্ষর। কিন্তু বংশ পরম্পরায় শেখা পটের গান গেয়ে তাঁরা জীবনের মহা সত্যগুলি জনসাধারণের হৃদয়ে মুদ্রিত করে দিতেন। এদেশের সম্পর্কে বহু অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হাভেল সাহেব বলেছেন, "ভারতবর্ষের পটুয়ারা পাশ্চাত্যমতে মূর্খ, কিন্তু জগতের চিত্রকরদের মধ্যে তাহাদের শিক্ষা সকলের উপরে।"[১১] ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অগাধ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ডঃ লিফ্রয় বলেছেন — "দরিদ্রতম এবং নিরতিশয় অশিক্ষিত হিন্দু কৃষকগণ অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দার্শনিক ও নীতিঘটিত আলোচনা করিতে পারে।"[১২] নিরক্ষর মানুষদের মধ্যে পটের গান তথা কথকতা নীতিশিক্ষার প্রচলন করেছিল। যা শুনে মর্ত্যধামে ভক্তি-স্বর্গের শতদল ফুটেছিল। কিন্তু প্রাবন্ধিক দীনেশচন্দ্র সেন আজ থেকে বহু আগে (শ্রাবণ ১৩৪৪) শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন — 'যে দেশের অক্ষরজ্ঞানের প্রচার খুব ব্যাপকভাবে না হইলেও উচ্চশিক্ষা কুটিরে কুটিরে ঢুকিয়াছিল, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, গীতা প্রভৃতির তত্ত্বকথা ও উপাখ্যান এককালে চাষাদের মধ্যেও প্রচলিত হইয়াছিল; সেই দেশের জনসাধারণ তাহাদের উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়া সিনেমার নরনারীদের চুম্বন আলিঙ্গনাদি দেখিয়া হীন লালসাপন্থী হইতেছে।'[১৩]

পটের গানের সঙ্গে কথকতার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কথকতা বহু প্রাচীন শিল্প যাকে ইংরেজিতে 'আর্ট' বলে, কথকতা শব্দটাতেই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে —এ কেবল কথার শিল্প। কথকতার সার্থকতা হচ্ছে একটা বিষয়বস্তুকে কেবলমাত্র কথার মাধ্যমে একটি আখ্যানে রূপান্তরিত করা। কথকতা লিখিত সাহিত্য নয়; অতএব এর যথেষ্ট প্রাচীনত্ব থাকলেও তাকে নিয়ে কোনো সাহিত্য রচিত হয়নি; সমস্ত শিল্পটিই মুখে মুখে পুরুষানুক্রমে চলে এসেছে। 'পটচিত্র নিয়েও এইরকম কথকতা আছে।'[১৪] কথকতার বৈশিষ্ট্য এই যে পুরাণকাহিনী ভিন্ন অন্য কোনো বিষয়বস্তুকে এর অন্তর্গত করা হয়নি। কথকতার মূল উদ্দেশ্য ছিল লোকশিক্ষা। তখনকার দিনে লোকশিক্ষা বলতে বোঝাত রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণের কাহিনী সম্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। এইসব শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারেই সমাজে চরিত্রগঠন ও জীবনধারার গতি নির্দ্ধারিত হত। এই কারণেই কথকতা পুরাণ কথার বাইরে অন্য বিষয়ে বিস্তৃত হতে পারেনি এবং সেরূপ ইচ্ছাও কথকগণ পোষণ করতেন না। অবশ্য ইদানিংকালে পটুয়ারা পুরাণ কাহিনীর বাইরেও পটের গান রচনা করছেন। পটের কাহিনীতে স্থান পাচ্ছে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বৃক্ষরোপণ, পণপ্রথা, কলকাতা ৩০০, গঙ্গা দূষণ প্রভৃতির মতন সাম্প্রতিক

বিষয়ও। তাহলেও সমীক্ষায় দেখা গেছে সামাজিক এই বিষয়গুলির থেকে পটের কাহিনীতে পৌরাণিক কাহিনীগুলি বেশি জনপ্রিয়।

এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য এটি কর্মসঙ্গীত। কেউ কেউ অবশ্য একে কর্মসঙ্গীত বলতে কুণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। কেন না পট দেখানোর শ্রমকে লাঘব করার জন্য এ গান বা তাকে বৈচিত্র্যমন্ডিত করার জন্যও নয়। এক্ষেত্রে কি বলা যায় না — গায়কেরা পটপ্রদর্শনকালে আনন্দ লাভ করেন, তাঁদের শ্রমের লাঘব ঘটে, তাঁদের কাজ বৈচিত্র্যমন্ডিত হয়। একথা জোর দিয়ে বলা যায়। সুতরাং একে কর্মসঙ্গীত অভিধায়ও চিহ্নিত করা যেতে পারে, এটি একক কর্মসঙ্গীত।

পটের গান শুদ্ধ আঞ্চলিক সঙ্গীত নয়। অবশ্য ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর লোকসাহিত্য (১ম) গ্রন্থে একে আঞ্চলিক সঙ্গীতের পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আঞ্চলিক সঙ্গীত বলতে সমগ্র বাংলাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি বাংলার প্রান্তীয় জেলাগুলিতে এগান প্রচলিত বলে একে আঞ্চলিক সঙ্গীত বলেছেন। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, এ গান কি শুধু এই কটি জেলায় সীমাবদ্ধ? পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সব জেলায় এমন কি ওপার বাংলায়ও এর অস্তিত্ব বহু পূর্ব থেকে লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া আমরা জানি যে কোনো লোকসাহিত্য, লোকশিল্প কোনো অঞ্চলের আবহাওয়া, রুচি ইত্যাদি অনুযায়ী সৃষ্টি হয়। এটিও সেইভাবে আবির্ভূত সঙ্গীত। সুতরাং একে সম্পূর্ণ আঞ্চলিক সঙ্গীত বলা যায় না।

একথা অস্বীকার করা যায় না যে, পটুয়ার গানের ক্ষেত্রে ছন্দ-যতি মিল ততটা নেই, তাহলেও এর সাঙ্গীতিক মাধুর্য কম নয়। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যও এসব দিক থেকে শৈথিল্য লক্ষ্য করেছেন। তিনি উদ্ধৃতিসহ ছন্দের দুর্বলতার দিক নির্দেশ করেছেন। তিনি এও বলেছেন যে, ঐ দুর্বলতাটি গায়কেরা সুরের সাহায্যে দূর করার চেষ্টা করেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় না যে এই প্রত্যাশিত দুর্বলতা তার সাঙ্গীতিক আকর্ষণ বা সম্মোহনকে নষ্ট করে দেয়। ছন্দোশৈথিল্য লোকগীতির ক্ষেত্রে স্বাভাবিক। কারণ লোককবিগণ কেউ ছন্দবিশেষজ্ঞ নন। ডঃ ভট্টাচার্য্য এও বলেছেন যে ছন্দের দুর্বলতাকে গায়কেরা বিচিত্র সুরসৃষ্টি করে কোনো পংক্তি দৈর্ঘের অসাম্যতাজনিত শৈথিল্য দূর করে দেয়। এই দিক থেকে বলা যায় ছন্দ-দুর্বল গান হলেও সঙ্গীত হিসাবে পটের গান যথেষ্ট মূল্যবান।

গানের পরিবেশন-ভঙ্গী অবশ্য তেমন আকর্ষণীয় নয়। এটি একক সঙ্গীত। একজনই মূল গায়ক এবং একমাত্র গায়ক। আধুনিক বা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মতো এখানেও গায়ককে সর্বদা সচেতন থাকতে হয় সমবেত দর্শক-শ্রোতার মনোরঞ্জনের দিকে। তাঁর সুর তাল প্রভৃতি ক্ষেত্রে বোধহীনতা, তাঁর ক্ষতির কারণ হয়। ছাদ পেটানো গান, ভাটিয়ালি, ধান ভানার গান ইত্যাদি সমবেত সঙ্গীত। দর্শক শ্রোতার মনোরঞ্জনের প্রশ্ন সেখানে নেই। তাঁরাই গায়ক, তাঁরাই শ্রোতা। কিন্তু পটুয়া গানে গায়কের বিচিত্র সুরজাল সৃষ্টি করার দিকে প্রয়াস থাকে। এরা গান করে, অন্যেরা শোনে। এ গানের অপর বৈশিষ্ট্য এর সুরযন্ত্র ও বাদ্যযন্ত্রহীনতা। বহু লোকসঙ্গীতে খমক মৃদঙ্গ, একতারা, দোতারা, তম্বুরা, আনন্দলহরী ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। কোনো কোনো গানে লঘুছন্দে নৃত্যও পরিবেশিত হয়। আবার অনেক গানে ধ্বনি, বাহ্যিক তাল-এর দ্বারা সঙ্গীতে প্রাণ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু সে সবেরই অভাব এই

গানে। এই গানে গায়েনের আন্তরিকতাই প্রাণ। মধুর, করুণ, বীর, শান্ত --- সাধারণত লোকসঙ্গীতে এই চারটি রসের কোনো একটির অস্তিত্বেরই প্রাধান্য থাকে। এই গানেও গায়েনকে কোনো একটি ভাবে আবেগাপ্লুত হয়ে গান পরিবেশন করতে হয়। নতুবা দর্শক শ্রোতারা আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। তাতে গায়েনের আর্থিক ক্ষতি হয়।

এ গানের ইতিহাসও প্রাচীন। বহু লোকগীতির স্বাধীন চরিত্র হারিয়ে যাচ্ছে নানা পরিবর্তনে ও প্রভাবের ফলে। কিন্তু এ গানের সঙ্গে প্রধানত গ্রামের নিবিড় কালের যোগ আছে বলেই আজও গ্রামজীবনের সুর ও রসের সন্ধান পাওয়া যায় এতে। এ গানে গায়েন পুরুষই। মেয়েরা অনুপস্থিত। বহু লোকসঙ্গীতে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য ইদানিংকালে কিছু কিছু মেয়ে পটের গান করছেন। সঙ্গত কারণেই তাঁরা কেউই গ্রামে গ্রামে পটের গান গেয়ে পট দেখাতে বেড়ান না। সে কাজটা পুরুষদের একচেটিয়াই। পটুয়াগণ তাঁদের রচিত গানের শেষে ভনিতা যোগ করা পছন্দ করেন। রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য ইত্যাদি প্রাচীন সাহিত্যে এই রীতি অনুসৃত হতে দেখা যায়। রামায়ণ, মহাভারতে কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস তাঁদের নামও ব্যবহার করতেন ভনিতায়। পটগান রচয়িতারা সাধারণত ভনিতায় নিজের নাম যোগ না করে কাশীরাম দাসের নাম ব্যবহার পছন্দ করতেন। অবশ্য অধুনা তাঁরা তাঁদের স্বনাম ও ঠিকানা ব্যবহার করছেন।

পটুয়াদের গানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য—যা অন্য কোনো লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় না — তা হলো পটচিত্রের সঙ্গে এর নিবিড় সম্পর্ক। খগেন্দ্রনাথ মিত্র বলেছেন, 'সঙ্গীত ও চিত্রকলার এরূপ অপূর্ব সমাবেশ আমরা অন্যত্র পাই না।'[১৫] চিত্রকে যদি শরীর কল্পনা করা হয়, তবে পটের গানকে বলতে হয় সে-শরীরের প্রাণ। দেহ এবং দেহস্থ প্রাণ এক নয় আবার তারা বিচ্ছিন্নও নয়। একের সার্থকতা অন্যকে আশ্রয় করে। একটি অন্যটিকে লালনপালন বা সম্পূর্ণতা দান করে। উভয়ের সমন্বয়ে দেহ নামক সৃষ্টিটি রচিত হয়। দেহের অভ্যন্তরে প্রাণ থাকে, দেহ দৃশ্য বলেই আমরা দেহ বললে প্রাণের অস্তিত্বের কথাও বুঝি। তবে এখানে গান ও চিত্র—দুটি দৃশ্যমান আপাতবিচ্ছিন্ন সৃষ্টি। পটচিত্রগুলি পটের গানের অবিকল চিত্ররূপ নয় — যেমন দেহের আকারপ্রকার অনুযায়ীই প্রাণ গঠিত হওয়ার কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। পটুয়াদের গানের সাঙ্গীতিক আবেদনের কথা বলতে গিয়ে বলতে হয়, সে আবেদন যতটা মানুষের হৃদয়ের কাছে, ততটা তার বুদ্ধির কাছে নয়। কারণ সেগুলি পটুয়াদের আধ্যাত্মিক হৃদয়ের উৎসমূল থেকে উচ্চারিত।

বাঙালীর পরিচয় জানতে হলে পটুয়া গানের চাবি কাঠিটি অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। এদিক থেকে পটুয়া গানের সঙ্গে কবি কৃত্তিবাসের কিংবা কাশীরাম দাসের মিল লক্ষ্য করা যায়। তাঁরাও রামায়ণ কিংবা মহাভারতের চরিত্র, স্থান, আদর্শ রীতি নীতি খাদ্যাখাদ্য ইত্যাদিকে সম্পূর্ণ বাঙালী করে তুলেছেন। তাঁরা দেব-দেবী চরিত্রগুলিকেও বাঙালীর আদলে চিত্রিত করেছেন। পটুয়াগণও দেবদেবীর বিভিন্ন লীলা রামলীলা, কৃষ্ণলীলা — বর্ণনা করতে বসে বাংলাদেশকে, বাঙালীর গার্হস্থ্য লীলাকে বিস্মৃত হতে পারেন নি। গুরুসদয় দত্ত যথার্থই বলেছেন — 'পটুয়া শিল্পীর বৃন্দাবন বাংলাদেশে, অযোধ্যা-বাংলাদেশে, শিবের কৈলাস বাংলাদেশে তাহার-কৃষ্ণ রাধা, গোপীগণ সম্পূর্ণ বাঙালী।'[১৬] এই সব বিশ্লেষণ ও মন্তব্য যে

যথার্থ ও অভ্রান্ত তা বোঝা যায় পটুয়াদের গানে পারিবারিক ও দাম্পত্যজীবনের লিপিচিত্রগুলি পাঠ করলে। শিব পার্বতী নামগুলি পৌরাণিক, তাঁদের গৃহস্থালী হিমালয়ে কিন্তু পারিবারিক খুঁটিনাটি বর্ণনা বঙ্গীয়। সে সব দেবদেবী বাংলার সাধারণ গৃহস্থ ঘরের গৃহস্বামী ও গৃহিনীরূপে চিত্রিত।

কাহিনী এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যই পটের গানের প্রয়োজন হয়। ডকুমেন্টারী চিত্রে ন্যারেশানের যে ভূমিকা পটের গানেরও সেই ভূমিকা। এই প্রসঙ্গে কারো কারো অভিমত আধুনিককালের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পটের গানকে বিচার করলে তাকে চলচ্চিত্রের নেপথ্য-ধারাভাষ্যের সঙ্গে তুলনা করতে পারা যায় — যা ডকুমেন্টারী বা দলিল চিত্রের একটি প্রধান শর্ত। 'Film as an art' গ্রন্থে মেরী সিটন দু'টি বিশ্ববিখ্যাত দলিল চিত্রের কথা উল্লেখ করেছেন— ১৯৩৪-৩৫ সালে নির্মিত 'সঙ অব সিলোন' এবং ১৯৩৬ সালে নির্মিত 'নাইট মেল'। এই দু'টি ছবিতেই চিত্র এবং ভাষ্য তার সঙ্গে সুষমভাবে গদ্য ও পদ্যের ব্যবহার এক বিশেষ তাৎপর্যে মন্ডিত করেছে। প্রয়াত শিল্পসমালোচক সুধাংশু কুমার রায়ের অভিমতানুযায়ী বঙ্গদেশে মুসলমানাধিকারের অব্যবহিত পরেই পীর বা গাজীরা ইসলাম ধর্ম প্রচারের 'অডিও ভিস্যুয়াল' মাধ্যমরূপে অঙ্কিত পট চিত্র ব্যবহার করতেন বেশি করে, ডঃ ত্রিপুরা বসু বলেছেন, 'গানগুলি পটুয়া শিল্পীর কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয় আর সেই সঙ্গে শিল্পীর নিপুণ অঙ্গুলি জড়ানো পটের সংশ্লিষ্ট চিত্রটির ওপর খেলে যায় যেন কথা ও ছবি একত্রে — আধুনিক সবাক চলচ্চিত্রের মতো দর্শককে তৃপ্তি দেয়।'[১৭]

পটুয়ারা মনসামঙ্গলের কাহিনী অবলম্বন করে গান রচনা করেছেন। কিন্তু দেখা যায় মূল মনসামঙ্গল কাহিনীর সঙ্গে পটের গানের মনসামঙ্গলের মিল নেই। মনসামঙ্গলের একটি পট গান এই রকম—

জয় মা মনসা দেবী জয় বিষহরি।
অষ্টনাগের মাতা পরম সুন্দরী।।
নাগের হল খাট পালঙ্ক নাগের সিংহাসন।
মঙ্গলা বড়ার পৃষ্ঠে দেবীরি আসন।।
দেবী বলে শুন বেনে মোর বাক্য ধর।
বাম হস্তে ফুলে জলে মনসা পূজা কর।।
যদি না পুজিবি বেনে মনসার ঘটবারি।
ছয় পুত্র খাবো রে ছয় বধূ করবো রাঁড়ি।।

এই মনসা পটগানটিতে ১৩৬টি চরণ আছে, কিন্তু তারই মধ্যে মূল মনসামঙ্গল কাব্যের সুবিশালত্ব ইঙ্গিতকে ধরে দেওয়া হয়েছে। মূল মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদ সদাগরের চরিত্রে এতটা দৃঢ়তা বা আদিমতা নেই। পন্ডিতেরা মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদ সদাগরকে 'আদিম বর্ব্বর পুরুষ' রূপে অভিহিত করেছেন। চাঁদের ক্রোধ, জিদ, পুত্রমৃত্যুর পর মাছ পান্তাভাত খাওয়া, মৃত্যুর সম্মুখে এসেও পদ্মফুলকে ঘৃণা প্রভৃতি তাঁকে অন্ধ বর্বর শক্তির প্রতীক করে তুলেছে। কিন্তু শেষাংশে তাঁর চরিত্রের কমনীয় দিকটিও ফুটে উঠেছে। পটগানে শেষাংশের কমনীয়তার বর্ণনা একেবারে নেই। পট গানে শৃঙ্গার রসের অবকাশ নেই, কিন্তু ব্যঙ্গকৌতুকের অভিপ্রকাশ

আছে। দেবী মনসা সরাসরি পূজা পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে শাসিয়ে দিয়েছেন। তা শুনে চাঁদ চরিত্রের চমৎকারিত্ব ফুটে উঠেছে। গায়েনের কণ্ঠে শোনা যায় —

আড়চক্ষে চেয়ে বেনে মোচড়ায়ে দাড়ি।
কন্ধেতে তুলিয়া নাচে হেতালের বাড়ি।।
বলে চ্যাংমুড়ি কানির নাগাল যদি পাই।
মারিব হেতালে বেটির কমর চুরাই।।

ক্রুদ্ধা মনসা চাঁদের ছয় পুত্রের মৃত্যু ঘটিয়েছে। এবার শেষ পুত্র লখিন্দরের বিবাহের আয়োজন হচ্ছে। মঙ্গলকাব্যের কনে পরীক্ষার বিচিত্র কাহিনী পটের গানে দেওয়া হয়নি। তবে মাত্র দু'টি চরণে বিবাহ সম্বন্ধে লোকমানসটি অদ্ভুতভাবে ফুটে উঠেছে।

'একদিন এসেছিল জনার্দন বুড়া
সম্বন্ধ গুছায়ে গেল সেই আঁটকুড়া।'

এখানে 'আঁটকুড়া' এই লৌকিক শব্দটির প্রয়োগ লক্ষণীয়।

লোককবি নাগিনীকে জীবন্ত মানুষে পরিণত করেছেন। সাপ বলছে, 'এমন সুন্দর নখা কোনখানে খাবো'। কেতকাদাসের মনসামঙ্গলে এই একই উক্তি পাওয়া যায়—

'এহেন সুন্দর গায় কোনখানে খাব
দেবী জিজ্ঞাসিলে তারে কি বোল বলিব'।

এখানে কবিত্বের চরম সীমায় পৌঁচেছেন লোককবি। কিন্তু বাসর বর্ণনার, দেহবাদী আকাঙ্খার, মৃত্যু পরবর্তী কান্নার কোন মানবিক সম্ভাব্য কাহিনী বর্ণনার সুযোগ পটগায়ক নেননি। কিন্তু এ সুযোগ নেওয়ার অবকাশ তাঁর ছিল। কারণ লোকমানসে বাসরবৃত্তান্ত অত্যন্ত উপাদেয়। নারায়ণ দেবের বাসর বর্ণনা জীবনবাদী ও শৃঙ্গাররস নির্ভর। ভ্রাম্যমান গায়ক চিত্রকরদের কাব্যানুরাগের কথা সবাই স্বীকার করেছেন। অবলুপ্তির প্রান্ত সীমায় এসেও এই কবিত্ব শক্তি বিনষ্ট হয়নি। কবি মনের নানা কল্পনা ও অনুভূতি চিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কোন ঘটনা চিত্র ও গানের মাধ্যমে তুলে ধরলে দর্শক শ্রোতার মনেও সেই ভাব তখন জেগে উঠত। উদাহরণস্বরূপ, যে ছবিতে রাম ও লক্ষ্মণকে সীতার শূন্য কুটিরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়, তাতে দর্শকরাও ঐ দু'টি বীরপুরুষের হৃদয়ের শূন্যতা বেশ অনুভব করতে পারেন। বাকিটুকু পূর্ণ করে দেয় পটুয়ার গান।[১৮]

পটুয়ারা হিন্দু পাড়ায় যেমন বাংলা ভাষায় গান করেন, তেমনি সাঁওতাল পাড়ায় গিয়ে একই পট দেখিয়ে সাঁওতালি গান গাইতে পারেন। হিন্দু পাড়ার জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরাম সাঁওতালী লোককথায় পরিণত হন যথাক্রমে সিংবোঙা, জাহেরএরা, মারাংবুরু প্রভৃতি প্রধান তিন সাঁওতাল দেবতায়। শিল্পী পট দেখিয়ে যে গান ও ব্যাখ্যা করেন তার ভাষা সাঁওতালী। অবশ্য শিল্পী যে সব ক্ষেত্রে সাঁওতাল ভাষা বোঝেন তা অবশ্যই নয়। এই গানের বিষয় সাঁওতাল জাতির উৎপত্তি বিষয়ে পৌরাণিক কাহিনী। মানব জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে ইডেনগার্ডেন, আদম ইভ বিষয়ক কাহিনী পাশ্চাত্ত্য পুরাণে প্রচলিত আছে, সাঁওতাল জাতির উৎপত্তি কাহিনীও অনেকটা সেইরকম। 'তবে পার্থক্য যেটুকু সেটুকু নিপুণ সৌন্দর্যবোধের ও চিরন্তন সত্যধর্মী ইঙ্গিতের'। ধর্মভক্তির আবেদন আনুগত্যের সুর অথবা পাপ স্মরণ ও

স্খালনের মানসিকতা এই পট বর্ণনায় একেবারেই নেই। কাহিনী বর্ণনার সঙ্গে, গেয় গানের সঙ্গে পট চিত্রখন্ডগুলির মিল চমৎকার। অন্যান্য গানের মতো এই পটের সঙ্গে গানের অমিল বড় হয়ে চোখে পড়ে না।

সাঁওতালী ভাষায় কাহিনীটি আরম্ভ হয়েছে এইভাবে —

"হানকো জয় জয় সিংবোঙা মারাংবুরু তালারে জাহের এরা পিতল সিকডিকো মালাল ঃ বোঙাদ্যাওড়াকো দিপিল কেনা। সিংবোঙারে নাইনি গাই, বাইনি গাই, মহাসুন্দর কপিল গাই ডান কাঁড়গোলীনাবারেয়া ফেঁড ভাষায় লেনা এয়না ফেঁড় সিরণ্ কেনা ডাঁচিরে ঢংলেন। অনা সেঁড্রে বারিয়া দিজু কিংজনম লেনা। ইনকিং দিজখন্ বারিয়া হাঁস হাঁসিল চেড়ে কিং জনম লেনা, ইনকিং চেঁড়ে কিং বিলিলয়না বিলিরে বারিয়া মানাটি দিগরে কি জনম লেনা মিৎটংকোড়া মিৎটংকুড়ি। এঁতুম কে কিনা পিলচুহাড়াম পিলচুবুড়ী কিং জনম লেনা। নডে কাটকামরাজ ইচাহাকু ষোলেইচা হররাজ নেরেরাজতে বসুমত। সিদজনকেদা হারাবুরুকো হারায়েনা তেরাবুরুকো হারায়েনা হাড়ামদ খনতা বুড়হিত সেদায় টুংকি দিপিলকাতে লঘুগুরু বীরকিং চালাও লেনা........

একটু থেমে তারপর প্রায় নাকি সুরে পরিচিত সাঁওতালী ঢঙে গান আরম্ভ হয় —

জান তেলে লিয়ে দো
কাপি তেলে হেলে যা
তিকিং তারা সিং তালা ঠেকাগো
তিকিং তারা সিং তালা ঠেকা

সুর করে এই অংশ গাইবার পর আবার গদ্যবৃত্তান্ত।

মেদিনীপুর জেলার ঠেকুয়াচক গ্রামের অজিত চিত্রকর সাঁওতালদের জন্ম-কাহিনী সংক্রান্ত একটি পটের গান করেছিলেন সেই গানের কিছু অংশ —

'যুগরে সিং বঙ্গা মারাংক্রু তালাবে — দৌড়াকিং দিপলা করে পিল সিকড়ি মারকিং হোরয়া কাদায় সে দায় আইনী গাই বাইনী গাই কাপিল গাই তাহালে নাই তড়ো সিতাম রিত কাতে মচাড়ে উলি দাকিং বাসাং লেনা সে দা কাঠ কম রাজ হেকরাজ ইর রাজ কেচুয়ারা বাত রাজিকিং ছড় যাওয়াং কাতে অনা বিচারতে কেচুয়া রাজ পাতাল ফোড় চালাও কাতে আড়াইতি বসমন্ত সিজন লেনাই।'

গানটিতে বলা হয়েছে সিংহাসনে সিংবোঙা ঠাকুর বসে আছেন, ভক্তরা তার পুজো করছে। প্রথমাবস্থায় পৃথিবী জলমগ্ন ছিল। সেক্ষেত্রে বসবাসের জন্য মাটি চাই। সাপ পাতালে গিয়ে মাটি আনতে রাজী হল। প্রথমে দেবতাদের গায়ের ময়লা থেকে দু'টি পাখী তৈরি হল। পাখির ডিম ফুটে নর নারী — দু'টি মানুষ হল। তাদের একজন পিলচু হাড়াম (বুড়ো) অন্যজন পিলচু বুড়ী। তাদের হল সাতটি ছেলে। পরে আবার সাতটি মেয়েও হল। এরা একে অপরকে বিবাহ করল। শেষ দৃশ্যটি দুঃখের — নেশা করে হাড়িয়া খেয়ে বাবা পড়ে মারা গেছে।

পটের গানের সঙ্গে ছবি বাড়ে বা কমে। ছবি বাড়া কমাটা পুরোপুরি অর্থনীতিনির্ভর। যে যেমন পয়সা খরচ করেন তিনি তত ছবি পান। ছবিতো বাড়ল বা কমল কিন্তু গানতো

আর পটুয়া গায়ক কমাতে বাড়াতে পারেন না। খুব অল্প পটিদারই পটের গান নিজে রচনা করতে পারেন। বংশপরম্পরায় একই গান মুখস্থ করে এসেছেন। তাই ছবির গান কমে এলেই তাঁরা তাঁদের মুখস্থ করা গান গেয়ে সেই কমতিটা পূরণ করে দেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার লোকসাহিত্য' (৩য়) গ্রন্থে সংকলিত সিন্ধুমুনির গানটি বীরভূম থেকে সংগ্রহ করেছেন। এ গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯৬৫ সাল। এই একই গান সংগ্রহ করেছেন অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৭৩ সালে তাঁর 'দেখা হয় নাই' গ্রন্থে এটি সংকলিত হয়েছে। এই আট বৎসরের মধ্যে গানের দৈর্ঘ্য বেশ কমে গেছে। এর কারণ আগেই বলেছি। অর্থ উপার্জন কম হওয়ার জন্য পটুয়ারা ছবি এবং গানের সংখ্যা কমিয়ে ফেলছেন। শুধু গানের পংক্তির সংখ্যার হ্রাস নয়, গানের পংক্তির পরিবর্তন হয়। লোক মুখেমুখে প্রচারিত হওয়ার কারণেই স্বাভাবিকভাবেই এর পাঠান্তর লক্ষ্য করা যায়। রূপাই সামন্ত ৩১.৭.৭৪ তারিখে বাঁকুড়ার জামবেদে মৌজা থেকে গোকুল চিত্রকরের মুখ থেকে একটি মনসা পটের গান শুনেছিলেন—

জয় মা মনসাদেবী গো জয় বিষহরি।
অষ্টগো নাগের মাথায় পরম সুন্দরী।।
সাতালি পর্বতে যে এই নোআর বাসঘর।
তায় শুয়ে গো নিদ্দা করে বেহুলা নখিন্দর।।
পথেপথে যায় নাগগো করে ঝলমল।
সম্মুখেতে দেখে কালি 'ডুয়ারী' জঙ্গল।।

কিন্তু গোকুল চিত্রকরের জামাই ২৯.৩.৭৫ তারিখে গেয়েছিলেন —

জয় মা মনসাদেবী জয় বিষহরি।
অষ্টনাগের মাতা পরম সুন্দরী।।
নাগের হল খাট পালঙ্ক নাগের সিংহাসন।
মঙ্গলাবড়ার পৃষ্ঠে দেবীরি আসন।।
দেবী বলে শুন বেনে মোর বাক্য ধর।
বাম হস্তে ফুলে জলে মনসা পূজা কর।।
যদি না পুজিবি বেনে মনসার ঘটবারি।
ছয় পুত্র খাবোরে ছয় বধূ করবো রাঁড়ি।।

প্রথম পংক্তিটি হুবহু ঠিক আছে। দ্বিতীয় পংক্তিটিও মোটামুটিভাবে এক। কিন্তু পরের পংক্তিগুলি একেবারেই পরিবর্তিত।

পটের গানের বিষয়বস্তু পৌরাণিক হলেও গানসহ বর্ণনার সময় দেবদেবীর লৌকিক রূপেরই প্রাধান্য এতে। এটি অনার্যমানসিকতার উত্তরাধিকারের প্রতিফলন। যেমন একটি গানে দেখা যাচ্ছে জটায়ু পাখির গলায় রাজা দশরথ নিজের গলার মালা পরিয়ে দিচ্ছেন।

নিজের গলার মালা খুলে রাজা জটার গলায় দিল
জটার সাথে জনম জনম রাজা মিত্রতা পাতাইল।

পটের গানকে আমরা শুধু গান কেন নাটকও বলতে পারি। নাটক অর্থাৎ লোকনাটকই বলব। এই প্রসঙ্গে প্রথমে লোকনাট্যের সংজ্ঞার উল্লেখ করতে হয়। লোকসংস্কৃতিবিদ ডঃ

নির্মলেন্দু ভৌমিক প্রদত্ত সংজ্ঞাটি হল 'Myth ও Rituals' মিলিত হয়ে কোনো সংহত লোকগোষ্ঠীর মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তারই নাট্যরূপ।[১৯] ডঃ ভৌমিকের সংজ্ঞানুযায়ী বোঝা যাচ্ছে লোকনাট্য Myth ও Rituals' কে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে। লোকসংস্কৃতিবিদ ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী লোকনাট্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন, 'লোকনাট্য লোকজীবনের কাহিনীর ওপরই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্ভরশীল, কারণ তবেই তা সংহত সমাজের কাছে আদৃত হয় বহুল পরিমাণে, ...কিন্তু তাই বলে পৌরাণিক কিংবা ঐতিহাসিক বিষয়কে লোকনাট্য আত্মসাৎ করতে পারবে না, এমন বক্তব্য যথার্থ নয়।'[২০]

পটচিত্রে আমরা দেখি সম্মিলিত একটি কাহিনী বা তত্ত্বকথা জড়িয়ে রাখা হয়। জড়িয়ে রাখা পট থেকে একটি একটি করে ছবি দেখানো এবং প্রসঙ্গে গীতিআশ্রয়ী বর্ণনা—এই হচ্ছে পটের গান। তাই পটের গানে দেখা ও শোনা দু'টি বিষয়ই থাকছে। এই কারণেই একে নাটকের পর্যায়ে ফেলা যায়। ডঃ ধ্রুব দাস বলেছেন, 'স্পষ্টতই পটের গান দৃশ্য ও শ্রব্যগুণান্বিত একটি শিল্পমাধ্যম; অর্থাৎ নাট্যেরই অন্তর্ভুক্ত। তাই শুধুমাত্র গান হিসেবে চিহ্নিত করে একে নাট্যক্ষেত্রের বাইরে সরিয়ে রাখাটা কোনোভাবেই সমীচিন নয়।'[২১] অন্য আর এক জায়গায় ডঃ দাস 'পটুয়া যাত্রা' কথাটির উল্লেখ করেছেন।[২২]

আমরা দেখছি লোকনাট্যের মত পটের গান লোকাশ্রিত কাহিনীকে আশ্রয় করে রচিত হয়, চরিত্রগুলিও কাহিনী আশ্রিত হয়। কিন্তু উক্তি প্রত্যুক্তি অর্থাৎ যাকে নাটকের ডায়লগ বা সংলাপ বলা হয় পটের গানে তা অনুপস্থিত। এছাড়া লোকনাট্যের মত থাকে না নৃত্য কিংবা লৌকিক বাদ্যযন্ত্র। পটুয়া পট দেখান আর গানের মাধ্যমে তার ব্যখ্যা করেন। এক্ষেত্রে নাচ কিংবা বাদ্যযন্ত্রের সুযোগ থাকছে না। তবে পটের গানেরও লোকনাট্যের মতন কোন লিখিত রূপ থাকে না — মুখে মুখেই তা রচিত হয়। যদিও আধুনিক কালে লোকনাট্য কিংবা পটের গান উভয়ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে এই লোকশিল্পীরা তাঁদের সৃষ্টিকে খাতায় কলমে আশ্রয় দিয়েছেন। অর্থাৎ এগুলিকে লিখিত আকারে পাওয়া যাচ্ছে। যদিও তুলনায় এর সংখ্যা নগণ্য। কারণ লোকশিল্পীদের মধ্যে সাক্ষরতার হারও খুব কম। 'আমাদের রসোপলব্ধির সুবিধার্থে যাকে আমরা লোকনাট্য বলে পরিগ্রহণ করেছি, যার উদাহরণ প্রাচীন পালাগান, গ্রাম্য যাত্রা, গম্ভীরা, বোলান, পোটো, আলকাপ বা খ্যান ইত্যাদি, পট গান কখনই তার সমধর্মী নয়।[২৩] তবে নাটকীয়তা গতিময়তা এবং অন্যান্য কিছু নাট্যগুণের অভাব এই গানে নেই।

পটের গানকে লোকসঙ্গীতের অবিভাজ্য ধারা হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। বাংলার লোকসঙ্গীত আকর্ষণীয়, সমৃদ্ধ ও স্বতস্ফূর্তকারী সুর, গায়ন-পদ্ধতি, সহযোগী বাদ্যযন্ত্র, কবিত্ব ও নির্ভেজাল সাহিত্যরস প্রভৃতি পটের গানে পাওয়া যায় না। পটের গানের কাজ হচ্ছে হাতে ধরে থাকা পটের বর্ণনা। সুতরাং পটের গান ঠিকমতো উপলব্ধি করতে হলে তাকে পট থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। লোকনাট্যে কী দেখা যায় — লোকায়ত মানুষের সাধারণ রুচির উপযোগী প্রধানত ধর্মমূলক এবং কখনো বা রঙ্গরসমূলক সামাজিক বিষয়বস্তু বা কাহিনী নিয়ে সঙ্গীত ও নৃত্যের মিশ্রণে গড়ে উঠেছে এক একটি নাটক, যেখানে সংলাপ, আবহ সঙ্গীত, সাজসজ্জা কখনোবা মুখোশের ব্যবহার নিজস্ব নিয়মেই দেখা যায়। অথচ

জড়ানো পটে গানের ব্যবহার হয় কাহিনীর ভাষ্যরূপে, কাহিনীর অংশ হিসাবে নয়। তবে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের পটভূমিতে পটের গানের মূল্য অবশ্যই অপরিসীম।

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পট-গান রচিত হয়েছে, কিন্তু দু'টি গুরুত্বপূর্ণ আখ্যান-বৃত্ত অনুপস্থিত পটুয়াদের গানে। দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গে শীতলাদেবীর খুব প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। প্রায় প্রতি গ্রামেই শীতলার থান আছে। সেখানে তিনি 'গ্রাম বুড়ী' হিসাবে পূজিতা। কলেরা, বসন্ত, মহামারী — সব কিছুরই রক্ষাকর্ত্রী মা শীতলা। সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে রচিত মঙ্গলকাব্যের যে পাণ্ডুলিপি দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের বদ্বীপ অঞ্চলে পাওয়া যায় তা শীতলা দেবীকে নিয়ে। এগুলি খুবই জনপ্রিয়। শীতলার সঙ্গে আর একজন দেবীর কথা খুব করে মনে পড়ে। তিনি হলেন দেবী অন্নদা। শীতলার যেমন দুর্যোগ এবং মহামারীর সঙ্গে খুব যোগ, অন্নদারও সেরকম 'খাদ্যদাত্রী' হিসেবে পরিচিতি। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে 'খাদ্যদাত্রী' দেবী হিসেবে অন্নদাকে নিয়ে আখ্যান 'অন্নদামঙ্গল' রচিত হয়। দেবী শীতলা এবং অন্নদার প্রসঙ্গের অবতারণা করা হল এই কারণে যে মনসা এবং চণ্ডীকে নিয়ে প্রচুর জড়ানো পট এবং গান রচিত হয়েছে, ইদানিংকালেও হচ্ছে কিন্তু শীতলা এবং অন্নদা সেক্ষেত্রে অদ্ভুতভাবে অনুপস্থিত। অথচ দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গদেশে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই এই দেবীদ্বয়ের জনপ্রিয়তা। হয়তো বা পটুয়ারা অন্নদাকে দুর্গা কিংবা গৌরী থেকে পৃথক করে দেখেননি। আবার এও হতে পারে যে জমিদার শ্রেণীর বাইরে দেবী অন্নদার তেমন পরিচিতি ছিল না। অন্যদিকে প্রত্যেক গ্রামেই বসন্তকালে শীতলামঙ্গল পালার প্রচলন ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। সেক্ষেত্রে পটুয়ারা শীতলার আখ্যান বর্ণনার জন্য আলাদা কোন সাংস্কৃতিক মাধ্যম গ্রহণের ভরসা পাননি।

এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় একাধিক পুরাণের কাহিনী নিয়ে গান করলেও পটুয়ারা মহাভারতের কাহিনীকেন্দ্রিক গান কম করেন। মহাভারতের নরক বর্ণনার সঙ্গে পটুয়ার নরক বর্ণনার মিল আছে। নরকের অধিশ্বর যমরাজ 'ধর্মরাজ' নামে পরিচিত। যমের দরজা দক্ষিণ দিকে। ভারতের অনার্য কবলিত দেশ দক্ষিণ দিকে। কর্মফলের উপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে আছে মহাভারত। এখানেও মহাভারতের সঙ্গে পটুয়ার ধ্যানধারণার মিল আছে˙ পটুয়ারা যমের পায়ে জুতো এঁকে তাঁদের সঙ্গে সূর্য উপাসকদের যোগাযোগের কথা মনে করিয়ে দেন। যমের সঙ্গে সূর্যের সম্পর্ক পিতাপুত্রের। 'পটুয়ারা মহাভারত সম্পর্কে উদাসীন কেন? বৃহত্তর মিলন প্রয়াসের সঙ্গে যে নাগেরা নিজেদের যুক্ত করতে পারেনি. তারা দ্রুত জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কৌম-সমাজের ভিতর আত্মগোপন করেছেন?'[২৪] অবশ্য কোন কোন পটুয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, মহাভারতে চরিত্র সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ায় একটি গানের মাধ্যমে তা প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। অধিক চরিত্র শ্রোতার মনে রাখাও সম্ভব নয়। তাই পটুয়ারা মহাভারতের কাহিনী নিয়ে কম গান করেন।

আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার প্রসার এবং অন্যান্য নানা কারণে পটের গান বিলুপ্তপ্রায়। পটুয়ারা বর্তমান সামাজিক সমস্যা নিয়ে বেশ কিছু পট আঁকছেন এবং গান তৈরি করছেন। এ ব্যাপারে সরকারি তরফ থেকেও উৎসাহ দেওয়া হয় পটুয়াদের। তবে ক্ষেত্রানুসন্ধানে দেখা গেছে সামাজিক পটের চেয়ে পৌরাণিক পটই বিক্রি হয় বেশি। পৌরাণিক পটকেন্দ্রিক

গানেই শ্রোতাদের আগ্রহ — এর কারণ সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন মেদিনীপুরের নয়াগ্রামের এক পটুয়া আনন্দ চিত্রকর। তাঁর ব্যাখ্যা — পৌরাণিক পটে মানুষ, দেবতা, গাছপালা সব কিছুই পাওয়া যায়। অথচ সামাজিক পটে শুধুই মানুষ। তাই পৌরাণিক পটেই মানুষের আগ্রহ বেশি। এ ব্যাপারে একটি কথা বলে রাখা দরকার যখন পটুয়ারা পণপ্রথা, নিরক্ষরতার অভিশাপ কিংবা পরিবেশ দূষণের মত বিষয় নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পট ও পটের গান রচনা করেন তখন নিঃসন্দেহে তা অকৃত্রিম লোকসংস্কৃতির উপাদানের মর্যাদা লাভের অধিকারী কিন্তু যখন নিছক সরকারি অনুদান লাভের আশায় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় স্রষ্টার স্বতঃস্ফূর্ততা ব্যতিরেকে এসবের সৃষ্টি হয় তখন সেগুলিকে আমরা Fakelore বা বিকৃত লোকসংস্কৃতির উপাদান রূপেই চিহ্নিত করতে পারি।

সংগৃহীত পটের গান এবং তার আলোচনা

ওয়ারলেস

শোনেন, শোনেন সর্বজন শুনুন দিয়া মন
নতুন এক কাহিনী আমি করিব বর্ণন
অবিশ্বাস্য নয়, অলৌকিক নয় ক্ষুদ্র বিজ্ঞানী হয়
ওয়ারলেস নামে তাহা দেশে পরিচয়।
কানে কানে বলছে কথা সবাই দেখতে পাই
বিজ্ঞান এমন নতুন জিনিস বের করেছে ভাই!
জঙ্গলেতে এত বাঘ কেউ না যেতে পারে
বরেস্টার[১] বাবু বলছে কথা ওয়ারলেস ধরে
ওয়ারলেসে কইছে কথা মন্ত্রী বাবুগণ
বেতারেতে করে প্রচার শুনে জনসাধারণ
আকাশেতে উড়ছে প্লেন দেখা নাহি যায়
নিচে মানুষের সাথে বলছে কথা এমন মজা হায়
আকাশ থেকে বলছে কথা সব্বারে জানাই
কোখন আসবে কোখন ছাড়বে বেতারেতে পাই
আর এক আচার্য[২] জিনিস মনে হল ভাই
গ্লোপগ্রিনে[৩] টিভি সেন্টার সবারে জানাই
কলিকাতায় দেখায় ছবি লোকের মুখে শুনি
ঘরে বসে দেখি ছবি এমন জিনিস করল জ্ঞানীগুণী
বিদেশে খেলে বল বেতারেতে পাই
যাদের ঘরে আছে টিভি তারা খেলা দেখে গো সবাই
ওয়ারলেসের কথা শুনে বানাইলাম কবিতা
তবু কেন পাইনা খেতে বলগো বিধাতা।
ওয়ারলেসের আর কিছু করি বরন্ন[৪]

ট্রাফিক সুপারের হাতে দেখি রাখে সর্বক্ষণ
পুলিশের কাছে দেখি ওয়ারলেস ধরে ফোনে
চুপি চুপি বলছে মন্ত্রীর বাবুর শনে[৫]
সীমান্তবাহিনীর কাছে যেতে প্রাণে লাগে ভয়
ওয়ারলেস দিয়ে কানে মন্ত্রীবাবু মুখে কথা কয়
তাই বলি ও বাবুরা বলছি আমি হেথা
গ্রাম অঞ্চলে হচ্ছে ওয়ারলেস আনন্দের কথা
এইভাবে হয় যদি দেশ দেশান্তরে
আর মোদের হবে না কষ্ট খবরাখবরে।
তাই আমি প্রণাম জানাই বিজ্ঞান দাদারে
আর তোমরা আগিয়ে[৬] চলো এ বিশ্ব জুড়ে
এবারেতে বলি আমি সবাইয়ের কাছে
ওয়ারলেসে আছে কিন্তু মারচ্যেন[৭] বাবুদের কাছে
তাই বলি ও বাবুরা শোন আমার কথা
বিজ্ঞানের কষ্টের ফল করোনাকো বৃথা
ওয়ারলেসে কোরো তোমরা সৎ ব্যবহার
তবেইতো বিজ্ঞান দাদার হবে নাকো হার
ঝড়-বৃষ্টি ভূমি-কম্পন খবর জানিয়ে দিয় আগে
এটাই হবে সৎ কাজ শিল্পীর মনে জাগে
কারেবা তুমি মারবে বলে ওয়ারলেসে খবর দেবে
এটা কিন্তু অসৎ কাজ মনেতে ভাবিবে
এইভাবে কেউ যদি করো অপব্যবহার
বিশ্বমাঝে বিজ্ঞান দাদার হয়ে যাবে হার।
বিশেষ কি আর লিখব আমি অল্পস্বল্প পড়া জানি
কারো কাছে গল্প শুনে বানাই গানখানি
এইখানেতে শেষ করিলাম ওয়ারলেসের বন্দনা।

নাম বাবলু চিত্রকর গ্রাম কাখরদা পোঃ ডিমারী
এই হয় ঠিকানা।

•• গায়ক ঃ বাবলু চিত্রকর (৩৭)
গ্রাম ঃ কাখরদা, পোঃ ডিমারীহাট, জেলা মেদিনীপুর

গানের বিশ্লেষণ ঃ ওয়ারলেস

১ - বরেস্টার - ব্যারিস্টার
২ - আচার্য - আশ্চর্য
৩ - গ্লোপগ্রিনে - গল্ফগ্রীন ---- কলকাতায় দূরদর্শন কেন্দ্র।
৪ - বরন্ন - বর্ণনা। ৫ - শনে - সঙ্গে। ৬ - আগিয়ে - এগিয়ে।

৭ - মারচ্যেন - মারচেন্ট (ব্যবসায়ী)

মানুষ নিজেদের সমকালীন জগতের কথা শুনতে ও বলতে ভালোবাসে। যুগসন্ধির কবি-সাংবাদিক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সমকালীন বহু বিষয় নিয়ে লিখেছেন। একালের পটসঙ্গীত-রচয়িতা লিখেছেন একালের বিজ্ঞানের আশ্চর্য আবিষ্কার—ওয়ারলেসের কথা। ভালো না মন্দ এসব প্রশ্ন হাস্যকর। এই গান শুনে মনশ্চক্ষুর সামনে, দেখা গেল দূরত্ব সংযোগকারী তারহীন বেতারবার্তা, টেলিগ্রাম, টেলিফোন, আরও কত কি! পটদর্শন করতে করতে দর্শকের এই বোধ যেমন জাগে, তেমনি তিনি অনুভব করেন যে, পটুয়ার যুগ-সচেতনতা নিতান্ত কম নয়।

ওয়ারলেস-এর তথ্যগত বর্ণনা হয়তো ততটা কাব্যগুণে সমৃদ্ধ নয়—মধ্যযুগের গানেও এমন বাস্তবতার প্রাচুর্য চোখে পড়ে, সেখানে কবিত্ব কম—কিন্তু তবুও দর্শক -শ্রোতার মনে আবেদন জাগাতে সক্ষম হয়, এর চিত্রময়তা ও সারল্যের কারণে। আটপৌরে শব্দাবলী যথেষ্ট, তবু কষ্টকর সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াস চোখে পড়ে না বলে গানটি তুচ্ছ নয়। অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত পটুয়ার কাছে ছন্দ-সৌন্দর্য অপ্রত্যাশিত, তাহলেও গানের মুহূর্তে সুরমাধুর্য সর্বত্র ব্যাহত হয় এমন বোধ হয় বলা যায় না। ভাবতে অবাক লাগে, অশিক্ষিত গ্রাম্য পটুয়াকে বিজ্ঞানের অভিশাপ—অপব্যবহার কী প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে। তিনি গেয়ে উঠেছেন—

'কারে বা তুমি মারবে বলে ওয়ারলেসে খবর দেবে
এটা কিন্তু অসৎ কাজ মনেতে ভাবিবে।'

মননে সমৃদ্ধ গানটি, উন্নত রুচিবোধ ও উন্নত মানসিকতায় আশ্চর্যজনক। তা-ই তাঁর গানের ব্যাকরণের পুঙ্খানুপুঙ্খতার দিকে ততটা নজর দাবি করে না। শুধু অনুভব করা যায়, তাঁর কণ্ঠধ্বনির আশ্চর্য কারুকার্যহীন কোমলতা ও সারল্য শ্রোতাদের মনকে এক আশ্চর্য জগতে উপস্থিত করায়। গানের পক্ষে তাইবা কম কী! পংক্তিতে অক্ষরমাত্রায় ঘাটতি দেখা দিলে—তালে বিঘ্ন ঘটলে গায়ক বিলম্বিত সুর দিয়ে তা ভরাট করে দেন, যা হলো পট গানের সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

শিল্পীর নিজের কথায়, তাঁর শিক্ষা স্বল্প, সমস্ত ওয়ারলেসের কার্যাবলীর বিস্তৃত পরিচয় তাঁর অজানা—অন্য কোনো বিজ্ঞান-অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারস্থ হয়েছেন। রচনার রীতিতেও যেন পূর্ববর্তী কোনো কোনো কবির অপ্রত্যক্ষ প্রভাব এসে পড়েছে। তাহলেও সেখানে অন্ধ অনুকরণের অস্তিত্ব অনুভব করা বোধ হয় চলে না। তাঁর পটের গান—

'শোনেন শোনেন সর্বজন শুনুন দিয়া মন।
নতুন এক কাহিনী আমি করিব বর্ণন।'

এইরকম ধ্রুব-পদের ঝঙ্কার রামায়ণ, মহাভারতে লক্ষ্য করা যায়। এইরকম দৃষ্টি ও মন-আকর্ষণী সম্বোধনের রীতি প্রায়ই এসব প্রাচীন গ্রন্থে দেখা যায়। যেমন—

"মহাভারতের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান"—কাশীরাম দাস
অথবা, "শুন শুন মাধব রসিক সুজান।
অনুগত বাচিনা হোয়বি আজ।।" — বিদ্যাপতি

ফুলবাগানের ঘটনা

আছে জানা ফুলগাবান থানা
জেলা চব্বিশ পরগণা
বাস করেছি পশ্চিমবাংলাতে
নারী ধর্ষণ হচ্ছে প্রতি জেলাতে
সোনার বাংলার নাই তুলনা
ঘটনা ফুলবাগান থানা
সবাই বলি নারী মাতার সমান
প্রশাসন রাজনীতি তারা দিচ্ছে প্রমাণ
সোনার বাংলার নাই তুলনা
ঘটনা ফুলবাগান থানা
থানাতে যত কনস্টেবল ছিল
রাত্রে এক যুবতীকে চুরি করিল
ঐ যুবতীর রূপ নাই তুলনা
ঘটনা ফুলবাগান থানা
বাড়ি থেকে থানাতে নিয়ে এলো
সবাই কনস্টেবল ধর্ষণ করিলো
কেহ নারীকে সম্মান দিল না
ঘটনা ফুলবাগান থানা
রাত্রে নারীকে সবাই করল হরণ
সকালে তারা দিচ্ছে বিবরণ
প্রশাসনতো কিছুই জানে না হায়
ঘটনা ফুলবাগান থানা
জোর করে তাকে উলঙ্গ করিল
কনস্টেবল আসক্তিতে মেতে গেল
মায়ের সম্মান কেউ তারে দিল না, হায়—
ঘটনা ফুলবাগান থানা
নারী কনস্টেবলের পায়ে ধরিল
জোর করে তারে বিহার করিল
অনুরোধ তার কেউ রাখিল না
ঘটনা ফুলবাগান থানা
যেমন বাঘে পালে মেষ পড়েছে
তেমন কনস্টেবল কাছে মেয়ে পড়েছে
সবাই তারে ধর্ষণ করল নারীর সম্মান দিল না

ঘটনা ফুলবাগান থানা
রাত্রি যখন প্রভাত হলো
থানা থেকে নারীকে বের করে দিল
কী করিবে কোথায় যাবে নাই তার ঠিকানা
ঘটনা ফুলবাগান থানা
ফুটপাতে বসে ভাবতে ছিল
'টেক্সির' আগে ঝাঁপ দিল
দেখে ড্রাইভার চাপা দিল না হায়—
ঘটনা ফুলবাগান থানা
গাড়ি থেকে মমতা নেমে এলো
মেয়েটি তারে সব বলিল
এই ঘটনা মমতাদি আমি বাঁচব না-গো
ঘটনা ফুলবাগান থানা
মমতা যখন ঘটনা তুলে ধরিল
এস পি সি আই তদন্তে গেল
মেয়েদের কিসের ভাবনা গো
ঘটনা ফুলবাগান থানা
এস পি যতক্ষণ জিজ্ঞাস করিল
কনস্টেবল সব ভয়ে মেনে গেল
তারা আবার গ্রেফতার হল
চাকরি তাদের রইল না
ঘটনা ফুলবাগান থানা
মুখে তাদের অভয় বলি
রাজনীতিতে চিল্লাচিল্লি
নারী নির্যাতন কোরনা গো
ঘটনা ফুলবাগান থানা
নিহারীবানুর ধর্ষণ হলো
পরিবহন মন্ত্রী ৫০০০ টাকা দিল
শ্যামল বাবুর ভাই নাই তুলনা
ঘটনা ফুলবাগান থানা
মায়ের ইজ্জৎ গেল
ছেলে তার পুরস্কার দিল
এইরূপ মাতৃভক্তি নাই তুলনা
ঘটনা ফুলবাগান থানা।

জেলা আমাদের মেদিনীপুরে
পিংলা থানা কিছু দূরে
৫ নং অঞ্চলে গ্রাঃ নয়া দিলাম ঠিকানা
ঘটনা ফুলবাগান থানা
নামটি আমার আনন্দ চিত্রকর
এইরকম গান লিখি বলি পরপর
গান লিখিবার জন্যে কেউ করিতে মানা
ঘটনা ফুলবাগান থানা
জেলা ২৪ পরগণা।

●● গায়ক ঃ আনন্দ চিত্রকর (৩৭) গ্রাম, পোঃ অঃ—নয়া, থানা—পিংলা, জেলা ঃ মেদিনীপুর। শিল্পীর বাড়ি থেকে সংগৃহীত।

গানের বিশ্লেষণ ঃ ফুলবাগানের ঘটনা

এই পটসঙ্গীতের বিষয়বস্তু—কাহিনী নিতান্ত আধুনিক কালের। সম্প্রতি কলকাতার ফুলবাগান থানার কনস্টেবল নীলকমল কর্তৃক ফুটপাতবাসী রমণী নিহারবানু ধর্ষণের রোমাঞ্চকর ঘটনা এবং তৎপরবর্তী ঘটনা এর উপজীব্য। গানটিতে বস্তুচিন্তার প্রাচুর্য আছে, সে তুলনায় কবিত্ব কম। তাহলেও দর্শক শ্রোতার মনে বেদনা ও ক্ষোভ সঞ্চারিত হয়ে যায় গায়কের বেদনাময় ও ক্ষোভে-ভরা গলার সুরে। সমগ্র শান্তি-রক্ষকদের সমাজচিত্র না হলেও, গানটিতে একাংশের ব্যাভিচারের কথা বলা হয়েছে বলে গানটির সামাজিক মূল্য কম নয়। রুচির শুচিতা, সংযত, রুচিসম্মত-বর্ণনা স্বল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত পট-গীতিকারের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত হলেও, তাঁর নারীজাতির প্রতি মমত্ব, শ্রদ্ধাবোধ অস্পষ্ট থাকেনি। পয়ার ছন্দে রচিত গানটিতে সর্বত্র ছন্দের গণিতের সূত্র অনুসৃত না হলেও, কথার ঘাটতির ক্ষেত্রগুলি গায়ক সুর দিয়ে পূরণ করে নেন। তখন গায়ক গানের স্বরসমূহ এমনভাবে বিন্যাস করে নেন যে, তাদের সমবায়ে চমৎকার সুর সৃষ্টি হয়। গানের রাগ, যা মনকে আনন্দিত করে, ভাবে পরিপূর্ণ করে, ভাবতে অবাক লাগে, অশিক্ষিত পটুয়ারা কীভাবে তা সৃষ্টি করতে পারেন! আগেকার দিনে চারণকবিগণ কিংবা বৈতালিকেরা কোনো গল্প বা কাহিনীকে গানের সুরে, অনেকটা আবৃত্তির ঢঙে জনসমক্ষে তুলে ধরতেন, অনেকটা সেইরকম ঢঙে ফুলবাগান থানার কাহিনী—কোথাও অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা ছাড়াই—শুনিয়েছেন। কিছুটা বিদ্রূপের তিক্ততা থাকলেও তাতে বিদ্বেষ নেই, এবং সর্বসাধারণের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষকদের চরিত্র সংশোধনের তাগিদ লক্ষণীয়, যা শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গরসিকের উদ্দেশ্য। সবশেষে বলা যেতে পারে গান হিসাবে হয়তো উৎকৃষ্ট নয়, কিন্তু পটুয়ার মরমী গলার শব্দতরঙ্গ দর্শক শ্রোতার মধ্যে প্রবাহিত হয়ে যায়, এমন ধারণা হয়তো অমূলক নয়।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

আমরা মানবজাতি এক মায়ের সন্তান
কেউ আবার হিন্দু হলাম কেউ আবার মুসলমান
মা হব গর্ভ হলো, হাবিল কাবিল জন্ম নিল
তাদের দুইটি ভাই দুই ধর্ম নিল, শাস্ত্রেতে আছে প্রমাণ
মারা[১] বুরুঙ্গ বলে সাঁওতাল, খ্রিষ্টান তারা গড বলে

মুসলমানরা আল্লা বলে হিন্দু বলে ভগবান এক মা
ধর্ম নিয়ে চলছে রাজনীতি ওসব ছেড়ে দিয়ে করতাম প্রীতি
যেই ঈশ্বর সেই প্রকৃতি প্রমাণতো দিচ্ছে বিজ্ঞান
হিন্দু আর মুসলমান সবাই ভাই ভাই মানুষ হল আসল ধর্ম
ভাই ভাই কি করব লড়াই নয়তো তো মোরা হব খান খান
এসো সকল শপথ নেব, আমরা ভাই ভাই মিল রাখিব
ঝগড়াঝাটি না করিব দেবা মরা শ্লোগান এক মায়ের সন্তান
দু'দিনের জন্য এসেছি ভবে যখন যার ডাক দেবে ভাই চলে যেতে হবে
দাঙ্গা করে লাভ কি হবে আমরা সকলে তো সমান
তমলুক থানা কাখারদা ঘর জেলা আমার মেদিনীপুর
সবাই মিলে ক্ষমা কর বাবলু হয় আমার নাম।

●● **গায়ক ঃ বাবলু চিত্রকর, বাবলুর গ্রাম থেকে সংগৃহীত এটি।**

গানের বিশ্লেষণ ঃ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

১ মারা বুরুঙ্গ—সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ঈশ্বর। আসলে মারাঙবুরু।

বর্তমান ভারতের একটি তীব্র সমস্যা সাম্প্রদায়িকতা, যা দেশের জাতীয় অনৈক্যের অন্যতম কারণ। গ্রামের কবির সচেতনতা বিস্ময়কর! অর্থহীন সাম্প্রদায়িকতার বিপক্ষে যে-সব জোরালো যুক্তি খাড়া করেছেন, সেগুলিও আশ্চর্যজনক। মনের উদার প্রসন্নতায় গান গেয়ে উঠেছেন—বাকচাতুর্য নেই—অপ্রত্যাশিতও বটে; মিলের চমক এই পয়ার ছন্দে লেখা গানটিতে চোখে পড়ে না কিন্তু কবির হিন্দু-মুসলমান, সাঁওতাল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের আদিম মানব-মানবী দেব-দেবী জন্মরহস্য ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞানের প্রসারতা চোখে পড়ে। গান হিসাবে বিচার করতে বসলে, গানটিকে উচ্চাঙ্গের রসসমৃদ্ধ সৃষ্টি বলে মনে হয় না, তবুও এটি যে উদার কবি মনের আলোড়নের ফল, বা সৃষ্টি সে কথা স্বীকার করতে কুণ্ঠা থাকার কথা নয়। এগানের কোনো কোনো পংক্তি-রচনায় যদি পূর্ববর্তী অসাম্প্রদায়িক-কবি নজরুল ইসলামের কোনো কোনো কাব্য পংক্তির উদ্ভাসন ঘটে থাকে তবে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

মোরা মানব জাতি এক মায়ের সন্তান
কেউ আবার হিন্দু হলাম, কেউ আবার মুসলমান

কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা—

"মোরা একই বৃন্তে দু'টি কুসুম হিন্দু-মুসলমান
মুসলিম তার নয়ন-মণি হিন্দু তাহার প্রাণ।।"

এক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে যে এ শুধু উভয় কবির মনের মিল। আজকাল ধর্ম নিয়ে যে রাজনীতি চলছে—এ ব্যাপারেও গায়ক সচেতন। একে যদি গায়কের রাজনীতি-সচেতনতা বলা হয় তবে 'যেই ঈশ্বর, সেই প্রকৃতি' কথায় তাঁর বিজ্ঞানমনস্কতার কথাও স্বীকার করতে হয়। "মানুষ (মনুষ্যত্ব) হলো আসল ধর্ম" এক্ষেত্রে কবিকে কত উচ্চশ্রেণীর দর্শন-চিন্তা স্পর্শ

করেছে তা বুঝতে পাবি। দু'দিনের জন্য আসা, চলে যাওয়া — যা বাউল সঙ্গীতের ভাব, তা যেন প্রতিধ্বনিত হয়েছে এখানে।

নবসাক্ষরতা ও জনস্বাস্থ্য

শোনেন শোনেন বাবুগণ হও সবে সচেতন
নিরক্ষরে অক্ষরদান জনস্বাস্থ্য আন্দোলন
আলোচ্য জেলাসভাধিপতি মহান মহিম
মেদিনীপুর জেলাশাসক প্রকল্প অধীন
বীরসিংহের সিংহ শিশু বিদ্যাসাগর নাম
জ্ঞানের আলো শিক্ষা দিল তাহারে প্রণাম
বিদ্রোহের আগুন জ্বালি গলার ফাঁসি পরে
বীর ক্ষুদিরাম শহীদের নাম প্রতি ঘরে ঘরে
জগৎমাতা মাতঙ্গিনী আশি বৎসরের নারী
তমলুক কোর্টে প্রাণ ত্যাগিল বীরের মত লড়ি
কোথায় গেল চিত্ত বীরেন[১] দুরজয় বীরের দল
ভারত স্বাধীন করল তারা অচল অটল
এদের আলোয় আলো মেদিনীপুর উজ্জ্বল
ধ্রুবতারা
বঙ্গ গৌরব ভারতভূমি প্রণাম করি মরা
এগিয়ে এসো স্বেচ্ছাসেবী গণসংগঠন
লেগে পড় ছাত্র পন্ডিত নিরক্ষর তা দূরীকরণ
চোখ থাকতে অন্ধ, শিক্ষা সবার চাই
মনের খোরাক বিশ্ব খবর অধিকারে লাগাই
অ এ'তে অন্ধকার যাবে দূরে সরে
আ এ'তে আলোর শক্তি প্রতি ঘরে ঘরে
ক এ কথামালা অর্থ জ্ঞান আরো হল
খ এ খল ছাড় কর সবে শিক্ষার সাধন
শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড সবারে বানাই
স্বাস্থ্য-সম্পদ কথা রেখ ভাই
তপোবনে নানা শিক্ষা পুরাণেতে ভাই
তবে কেন লিখাপড়াই, আর হেলা ভাই
কারখানা অফিসমহল স্বাস্থ্যকর্মীগণ
সবে মিলে দাও সাড়া আর নারী সংগঠন
সাক্ষরতা যুক্তিবন্দী সবার স্বাস্থ্য প্রয়োজন
স্বাধীন দেশে সভ্য মোরা অমল রতন
হাতে ঘড়ি চোকে চশমা অভাব যাচ্ছে চলে
পড়ার নামে লবডঙ্কা কাগজ দিলে
কোর্টকাচারী যেথা সেথা নাম সাক্ষরতার স্থান
টিপ লাগাতে কালি করতে নানান হয়রান
শিক্ষার শেষ নাই অলহাদিসের কথা
দোলনায় দোলে হতে জ্ঞান করব তক যথা
দেশবিদেশে ঘুরতে গেলে চাই শিক্ষার সাধন
গাড়ি বাসে চড়তে বোকা হয়না কখন
ঠকবাজি আর পাওনাদার জালিয়াতের দল
পারে না আর লুঠতে মজা সাক্ষরতার ফল
রাজার চেয়ে শিক্ষা বড় ধনীর চেয়ে মান
সব শাস্ত্রের কথা এ মিথ্যা নয় প্রমাণ
বুঝতে হবে জানতে হবে শিক্ষার ব্যবহার
দলিলপত্রে সব জায়গাতে ছাড়বে না সরকার
মূলমন্ত্র করতন্ত্র সার লেখা পড়
সুযগেতে তুলি ধর নিরক্ষরতার বেড়া
শিক্ষা পেলে সবাই মিলে জ্ঞানস্বাস্থ্যের গঠন
মা ও শিশুর যতন নেওয়া মূলত লক্ষণ
যেথা থাক আর মা অঙ্গসেবা[২] কর্মচারী
যথারীতি লক্ষ দাও মা ও শিশুর উপরি
জন্মর পর মা শিশুদের দিয় টিকা হজিসন[৩]
স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগা রোগে রোগ প্রতিষেধন
ডিপথিরিয়া হুপিং কাশি হামযক্ষা টিটেনাশ
শিশুদের রোগ বিনষ্ট হবে ছাড়বে সবে হাহুতাশ
আন্দোলন কর্মকান্ডে হও জাগরণ
সবাই মিলে জান স্বাস্থ্য নিরক্ষর দূরীকরণ
অভিযান তুলে ধর কাজে হও বৃত্তি[৪]
অসাধ্য কিছুই নাই মানুষ প্রকৃতি
চেয়ে দেখ চিন জাপান ফ্রান্স জারমান
গুণেমানে জানি মহান শক্তিবান
বুদ্ধিবলে নাহি মোরা কমতি ভারতে
শিক্ষায় পিছিয়ে থাকা কে চায় সহিতে
তাই বলি নব বলে হও বলীয়ান

স্বাধীন ভারত যেন বিশেষ পায় স্থান
বিশেষ কি আর লিখব আমি শোনেন বাবুগণ
ভুল হইলে ক্ষুদ্র শিল্পীরে ক্ষমা কর সর্বজন
মেদিনীপুর জেলা আমার তমলুক থানায় ঘর
গ্রাম কাখরদা পোষ্ট ডিমারী
নাম বাবলু চিত্রকর।

● ● গায়ক ঃ বাবলু চিত্রকর, বাবলুর গ্রাম কাখরদা থেকে সংগৃহীত।

গানের বিশ্লেষণ ঃ নবসাক্ষরতা ও জনস্বাস্থ্য

১ চিত্ত, বীরেন—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল
২ অঙ্গসেবা কর্মচারী—অঙ্গনওয়াড়ি কর্মচারী
৩ হজিসন - ইন্‌জেকশান
৪ বৃত্তি - প্রবৃত্তি

গানের শেষে রামায়ণ, মহাভারত, পদাবলী ইত্যাদি গ্রন্থের প্রাচীন রীতি—ভনিতা। সে অনুযায়ী রচয়িতা তাঁর পরিচয় দিয়েছেন। পটসঙ্গীত রচয়িতাদের রচনার এটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সাক্ষরতা ও জনস্বাস্থ্য আন্দোলন আধুনিককালের দু'টি বড় সামাজিক আন্দোলন। পটগীতিকার এ দু'টি আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছেন এবং এদু'টি বিষয় সম্পর্কে জনমানসে চেতনা সৃষ্টিতে সচেষ্ট হয়েছেন গানের ও চিত্রের মাধ্যমে। উক্ত গানের শ্রোতা গ্রামের জনসাধারণ হলেও মেদিনীপুর জেলার জেলাসভাধিপতি ও জেলাশাসকদের গুণ বর্ণনার দিকে, সভাকবিদের মতোই গীতিকার কিছুটা যেন সচেতন ছিলেন। সাক্ষরতা প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, এবং এই আন্দোলনকে আরও ফলপ্রসূ ও উদ্দীপ্ত করতে জেলার অন্যান্য বীর, স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা—ক্ষুদিরাম, মাতঙ্গিনী, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল প্রভৃতি মানুষের কথা এসে পড়েছে প্রসঙ্গক্রমে। অ, আ, ক, খ—বর্ণগুলি যথাক্রমে অন্ধকার, আলো, কথামালা এবং খল, এই শব্দগুলি অগ্রবর্তী ধ্বনি। বর্ণগুলি সুকৌশলে—গানের ছন্দে, নিরক্ষরদের মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। বর্ণগুলি ছন্দের বাঁধনে বাঁধা পড়ে প্রাণপূর্ণ ঔজ্জ্বল্যে দীপ্যমান হয়ে উঠেছে। সাক্ষরতার উপযোগিতার বর্ণনা প্রসঙ্গে নিরক্ষরতার কুফল বর্ণনা করা হয়েছে। অপর বর্ণনার বিষয় জনস্বাস্থ্য, জাতির ভবিষ্যৎ—শিশুর সেখানে প্রাধান্য। ভারতীয় ঐতিহ্যসচেতনতা, বহির্বিশ্ব-জ্ঞান, সেই সঙ্গে সর্বপ্রকার মানুষকে আহ্বান জানাবার উদারতা ও কর্তব্যবোধ অশিক্ষিত পটরচয়িতার পক্ষে অবিশ্বাস্য হলেও সত্য প্রমাণিত হয়। গানখানি আগাগোড়া পড়লেই আমরা বুঝতে পারি কোনো কোনো পংক্তি তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘ হলেও, গায়ক সেখানে বিলম্বিত ধ্বনি-সমষ্টির সাহায্যে পূর্বাপর সুরের সমতা রক্ষায় সচেতন থাকেন।

নারীর হাতে ড্রাইভার খুন

শুনুন শুনুন বন্ধুগণ শুনুন দিয়া মন
নারী হাতে ড্রাইভার খুন আশ্চর্য কারণ
কাহিনী মিথ্যা নয় সত্যি হয় রাখিবেন স্মরণ
জেলা মেদিনীপুর নেইকো দূর আছে ঝাড়গ্রাম
সেইখানেতে বাস করে অনিল মিত্র নাম
তার এক পুত্র ছিল নামটি বিমল

আ-এ[১] পাশ করে চাকুরি, থাকেন কলকাতায়
অনিল মিত্র ছেলের জন্য মেয়ে পছন্দ করে
জেলা মেদিনীপুরে
মেদিনীপুর শহরে আবার ভোলা মিত্র আছে
তার এক মেয়ে আছে বলি সবার কাছে
নাম তার মীনাবালা রূপের ডালা
দেবী তুল্য গায় গাহক[২] আনন্দ বলে সাবধানে
থাকিবে সবাই
কিছুদিন গেল বিয়ে হল শুভ পরিণয়
ভাড়া দিয়ে বিমল বাবু কলকাতায় থাকেন
দু'টি বছর গেল ছেলে হল তার
আদরেতে নাম রাখিল স্বপনকুমার
মীনা বলে চল একবার নিজের বাসায়
বাবু ছুটি নিল রওনা হল টাকাকড়ি নিয়ে
ছুটে গিয়ে গাড়ি ধরে বেলা ছোটাতে[৩] গিয়ে
রাত্রি আটটা যখন পৌঁছে তখন ঝাড়গ্রাম
গেল
ভাল দেখে ট্যাক্সি একটি ভাড়া করে নিল
মীনার গায়ে ছিল অলঙ্কার, ড্রাইভার গুন্ডা
ছিল
না চিনিল বিমল বাবু হায়
ভোঁ ভোঁ করে ট্যাক্সি দেখি ছুটে চলে যায়
পথে নির্জনাতি[৪] নেই বসতি দুই ধারেতে মাঠ
এমন সময় বাবুর ঘটিল বিভ্রাট
সিগারেট খাবে বলে পকেটে হাত দিলে
একটিও সিগারেট নাই তার কিনতে হবে
বলে
কিছু দূরে গেল দেখিবারে, পাইল পানের
দোকান
ড্রাইভারকে দেখে বলে গাড়ি একটু থামান
গাড়ি থামাইল বাবু গেল সিগারেট কিনিবারে
ড্রাইভারবেটা কুবুদ্ধি করে ট্যাক্সি দিল ছেড়ে
বিমলবাবু হয়ে কাবু দাঁড়াও দাঁড়াও বলে
পেছনে দৌড়ায়
ট্যাক্সি নিয়ে গিয়ে ড্রাইভার জঙ্গলের ধারে
থামাইল
ছোরা দেখিয়ে মিনাকে জঙ্গলে টেনে নিল
মিনা নিরুপায় করে হায় কি করি উপায়
ড্রাইভারকে বলে আমাকে বাঁচালে চিরসঙ্গি
নী হব তোমার
তোমাকে বাঁচাব নিশ্চয় ছেলেকে কাটিব
মিনা বলে ছেলেকে কাটিবে তুমি
জামার মধ্যে রক্ত লাগি যদি তোমার
পথের মধ্যে সন্দেহ করে ধরে যদি তোমায়
বৌটি আমার সঙ্গে যাবে ভাল বুদ্ধি দিয়েছে
আমায়
ভাল বুদ্ধি দিয়েছে আমায় জামা খুলতে হবে
ছোরা নিচে রেখে মনের সুখে ড্রাইভার জামা
খুলতে যায়
সেই সুযোগে মীনাবালা সুযোগ দেখতে পায়
ছোরা তুলে ড্রাইভারের পেটে ঘায়েল দিল
ঘায়েল খেয়ে ড্রাইভার বেটা করে বাপরে
বাপ
জীবনটা যে যায়, ধরা পড়িবার ভয়ে বেটা
বনেতে লুকোয়
মীনা ছেলের হাত ধরিয়া রাস্তার দিকে যায়
বিমল বাবুর সঙ্গে দেখা পেল, দেখা পেয়ে
থানায়ও যে যায়
সঙ্গে চার্জসিট লিখে কেস করিয়া দেয়
চতুর্দিকে গেল ওয়ারেন্ট সাত দিন পরে সে
ডাকাত ধরাও যে পায়
ধরা পেয়ে ডাকাতেরে জেল হাসপাতালে
দিল
বিচারপতির শীঘ্র গতি, বিচার করে হায়
মীনাবালা দশ হাজার টাকা পুরস্কার পায়
পুরস্কার পাইয়া মীনা আনন্দিত হইল
ডাকাতের আজীবনকাল কারাদন্ড হইল।

●● **গায়ক—আনন্দ চিত্রকর**

গানের বিশ্লেষণ ঃ নারীর হাতে ড্রাইভার খুন

১. আ. এ — আই. এ — ইন্টারমিডিয়েট আর্টস
২. গাহক — গায়ক
৩. বেলা ছোটাতে — বিকেল বেলায়
৪. নির্জনাতি—নির্জনতা

একালেরই এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা গানটির বিষয়বস্তু। গানটি হয়তো রচনা-কৌলিন্যে উচ্চস্তরের সঙ্গীতের গৌরব দাবি করতে পারবে না, তবে মনে হয়, গায়ক তার মরমী গলার সুরমাধুর্যে, মর্মস্পর্শী ভাষার সাহায্যে সামাজিকদের মধ্যে যথেষ্ট আলোড়ন তুলতে পারেন। গানটি বীররসের। তাছাড়া, নারী দুর্বলা, ভীরু, বিপদে কিংকর্তব্যবিমূঢ়া ইত্যাদি বিশেষণ যে-দেশের নারীদের সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়, সে-দেশের নারীর উপস্থিত বুদ্ধি, সাহসিকতা ইত্যাদি স্বাভাবিক গুণের প্রকাশ দেখলে বিস্মিত হই বৈকি! সেইরকম জনৈকা মীনা মিত্রের বীরত্ব আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। বিলম্বিত লয়ে গানটি গীত হয়। দর্শক-শ্রোতার মনের মধ্যে নারীদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করাই লেখকের উদ্দেশ্য।

পটুয়াদের গান

জন্মদুঃখী গরিব-শিল্পী আমরা কজনা
দুঃখে দুঃখে জিমন[১] গেল দুখ বিনে সুখ এল না
গ্রামে খেদান[২], শহরে তাড়ানো পটচিত্র কেউ দেখল না,
জন্ম.........
গ্রামে যখন সিনেমা এল,
পট দেখার চাহিদা কমে গেল,
পেটের অন্ন জুটল না,
জন্ম.........
সরকার বের করিল রেডিও, টিভি ঘরে এল
পটুয়াদেরকে দুয়ারে তুলল না,
জন্ম.........
মনে কষ্ট এল,
পট ছেড়ে বিভিন্ন কর্মে লেগে গেল,
পটুয়া পটের সনমান রাখতে পারল না,
জন্ম.........
পট যে আমরা আঁকি
পক্তিক[৩] সম্পত্তি ধরেই থাকি;
ভাবি আমরা পট আমাদের,
মরবেনা গো, মরে না,
জন্ম.........
সরকার যদি দয়া করে,
সব পটুয়া কর্ম ছেড়ে আসবে ঘুরে,
মনে তাদের আনন্দ ধরবে না গো,
জন্ম......
পটুয়াদের নাইকো ঘর,
পটের জন্য তারাই অমর,
সংগ্রাম করব মোরা, পিছু হটে
চলব না গো, চলব না
জন্ম..........
পিংলা থানায় ঘর,
সবাই আমরা চিত্রকর।
গান লিখতে আমরা ছাড়ি নাগো;
পটুয়ারা মেদিনীপুরে থাকি,
গান লিখতে দিই না ফাঁকি,
গান লিখিবার তরে কেউ করিবে না মানা,
জন্ম..........

শুনুন ওগো মানী, গুণী, মা ভগিনী
লেখা পড়ায়তে আমি কিছুই জানিনি
ভুল ত্রুটি আমার করবে ক্ষমা তার জন্য।

●● ১০ ডিসেম্বর ১৯৯৬, পিংলার (মেদিনীপুর) আনন্দ চিত্রকর, দঃ ২৪ পরগণার সামালীর বিবেক নিকেতনে এই গান শুনিয়েছিলেন।

গানের বিশ্লেষণ ঃ পটুয়াদের গান

১. জিমন—জীবন ২. খেদান—তাড়ানো ৩. পক্তিক—পৈতৃক।

পটুয়াদের দুঃখময় জীবনের কথা গানের মরমী ও গভীর ভাষায় নিজেদের জবানীতে ব্যক্ত করেছে পটুয়ারা। দুঃখের 'বারমাস্যা'র মতো এ যেন দুঃখের জীবনেতিহাস। রেডিও, টিভি-র আবির্ভাবে পটুয়ার স্বজীবিকাচ্যুতি—গ্রাম-শহর থেকে বিতাড়ন—তা সত্ত্বেও কিছু পটুয়ার পৈতৃক পেশায় নিষ্ঠা—সরকারি প্রয়াসে তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা না ঘটা—পটশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ঘোষণা, এই নিয়েই গানটির শরীর-গঠন। গানটিতে যথারীতি ধুয়া অংশও সংযোজিত, কল্পনা করতে অসুবিধা হয় না যে দোহাররা যে-অংশটি বারংবার উচ্চারণ করে উঠছেন সেই অংশে যেমন কাব্য তেমনি গানটির সর্বাঙ্গে করুণ রস প্রবাহিত। অন্ধকার দুঃখের কথা জানানো হলেও, কোথাও রুচিহীন ভাষার মালিন্য চোখে পড়ে না। অপ্রাসঙ্গিক কোনো বর্ণনা নেই, নেই শুধু কথার—শব্দাবলীর অনর্থক ব্যবহার। গানটির সামাজিক মূল্যও কম নয়—পট যা পরম্পরা ধারায় প্রবাহিত, সবাক ও সচিত্র সর্বত্র প্রসারিত গণমাধ্যম, সমাজ ও সরকার তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে এবং পটুয়ারা দারুণ দুঃখে কষ্টে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, এ খবরটি গানটির মাধ্যমে আমরা পেয়ে যাই।

মানুষের কথা

শুন শুন সর্বজন করি নিবেদন।
ধূমহীন চুল্লির কথা কিছু করিব বর্ণন।।
ধূমহীন চুল্লি তৈরি করলে উপকার হবে।
ক্ষয়কাশ হাপানী কাশি থেকে রেহাই পাবে।।
ক্ষয়কাশ হাপানী থেকে মুক্তি পেতে হলে।
ঘরে ঘরে ধূমহীন চুল্লী করুন সকলে।।
গর্ভবতী মায়েদের কথা একটু সতর্ক করে যাই।
গর্ভবতী মায়েদের তিনবার ইনজেকসান নিতে হবে তাই।।
মায়েরা যখন গর্ভবতী হবে সবারে জানাই।
পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়াতে হবে জানুন গো সবাই।।
মায়েরা ইনজেকসান না লইলে ভাই।
শিশুদের হুপিং কাশি টিটেনাশ থেকে পাইবে না রেহাই।।
নেশা খেলে হবে ক্ষতি শুনুন বন্ধুগণ।
নেশা বন্ধ করার জন্য অনেক মানুষ করছে আন্দোলন।।
নেশা করলে হারায় মানুষ নিজের মানসম্মান।
সবারে জানাই আমি কমাও এবং ছাড়ো ধূমপান।।
নেশা করলে আছেরে ভাই মানুষের মরণ।
আবার এমন নেশা আছে মানুষ করে জীবনধারণ।
সেবার নেশা, ভালোবাসার নেশায় তাদের মন।
নেশায় তাদের ভরে উঠে মধুময় জীবন।।
মদের নেশা, আফিং নেশা, বিড়ি নেশা যারা নেশা করে।

কোথায় পাবে পয়সা তারা ভাবে অন্তরে।।
শিক্ষা নিয়ে যারা করে প্রতিবাদ।
জোট বেঁধে সকল মানুষ করবে আদানপ্রদান।।
সবার খুদা মিটবে ভাই করলে চাষের কাজ।
সব শিক্ষা হবে অবসান রাখলে দেশের মানসম্মান।।
লিখা পড়া করলে শুধু হবে নাকো ভাই।
চাষ আবাদের কথা ভাবতে হবে জনগণকে জানাই।।
একটা কাজ সবাই করলে দেশ চলবে নাকো ভাই।
ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে আমরা বেঁচে থাকতে চাই।।
গুপ্তধন বলতে অনেকে বুঝে একদিক থেকে।
মাটির বুকে যেটা ফলাই সেটা জানো সকলে।।
মাটির বুকে গুপ্তধন লুকিয়ে আছেরে ভাই।
ফলিয়ে নিতে পারলে ফসল, বাঁচবেরে সবাই।।
সব কিছু জানলে পরে সংসারে হবে ঠাঁই।
মাটির মধ্যে গুপ্তধন আছে সকলের জানা চাই।।
শিক্ষা নিয়ে চলব মোরা জোট বেঁধে ভাই।
সবার খুদা মিটিয়ে দেব শিক্ষা হবে ভাই।।
ওদের রথের চাকার গরীব হয় সারথী।
একই সঙ্গে মিশব মোরা আমরা ভারতবাসী।।
বড়ো ছোট আমাদের কাছে নাইকো কোন মান।
একদল আছে ভারতে বসে, ভারতকে করবে খান খান।।
শমনের কালে দমনের গান লিখি খাতা ভরে।
শান্তি মোরা রাখব কাছে, দুঃখ রাখব দূরে।।
মহাসুখে আছে বন্ধু আনন্দ শহরে গিয়ে।
টিভি দেখে ফ্যান চালায় এয়ারক্যান্ডিশন দেওয়া ঘরে শুয়ে।।
তারা কি ভাবে না দেশের কথা শুনুন বন্ধুগণ।
তারা কি হবে সমাজসেবী দেশকে করবে সচেতন।।
গ্রামের পথে জানি মোরা কলঙ্কময় জীবন।
প্রতিরোধ আছে, ক্ষোভ আছে, তবু করছি জীবনধারণ।
লোভের বশে মিথ্যা করে মানুষ করে ভুল।
সত্যমিথ্যা যাচাই করে ধান্দাবাজরা হবে নির্মূল।।
অনেক লোভে পোড়োনাকো ধান্দাবাজের হাতে।
নতুন সমাজ গড়ব মোরা দেখব জগৎটাকে।।

গায়ক ঃ নিরঞ্জন চিত্রকর,
চণ্ডীপুর, মেদিনীপুর

গানের বিশ্লেষণ ঃ মানুষের কথা

গান শুরু করলেন শ্রোতাদের সম্বোধন করে, যেমন দেখা যেত রামায়ণ -মহাভারত- শিবায়ন ইত্যাদি প্রাচীন কাব্যসাহিত্যে। গানটির বর্ণনীয় বিষয়—ধূমহীন চুল্লী, গর্ভবতী রমণী, নেশা, চাষ-আবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ, মানুষের লোভ, ইত্যাদি। সামাজিক কর্তব্যবোধে গানের মাধ্যমে রচয়িতা ধূমযুক্ত চুল্লী ব্যবহারের কুফল বর্ণনা করে ধূমহীন চুল্লীর প্রয়োজন সম্পর্কে জনমানসে সচেতনতা জাগ্রত করতে চেয়েছেন। ভাবী-সন্তানের ও প্রসূতির ভবিষ্যৎ-মঙ্গলের কথা ভেবেই গর্ভবতী রমণীর চিকিৎসা সম্পর্কে চেতনা জাগ্রত করবার চেষ্টা করেছেন; নানাবিধ নেশা বা মাদকদ্রব্যে আসক্তির কুফল বর্ণনাচ্ছলে মানুষের শুভবুদ্ধির জাগরণে তৎপর হয়েছেন; চাষ-আবাদের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে গীতিকার চাষ-আবাদ করার সুপরামর্শ দিয়েছেন ইত্যাদি। এই সব দিক থেকে গানটির সামাজিক মূল্যও কম নয়। সরল, আটপৌরে

নিতান্ত নিরলঙ্কৃত ভাষায়—শব্দচয়নে পালিশ করার প্রবণতা নেই, না থাকলেও কোথাও অযত্ন চোখে পড়ে না, যদিও 'সার্থক নয়' অর্থে অবসান, 'বিচার না করে' অর্থে যাচাই ইত্যাদি ভুল শব্দের ব্যবহার চোখে পড়ে, ক্ষুধা অর্থে আঞ্চলিক উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী খুদা এবং লেখা অর্থে আঞ্চলিক উচ্চারণের রীতি অনুযায়ী লিখা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তাহলেও মাটিজাত শস্য বলতে গিয়ে "মাটির বুকে গুপ্তধন," গরিব মানুষ বড়লোকের অন্নের বা উন্নতির মূল এই কথাটি বোঝাতে গিয়ে "ওদের রথের চাকা গরীব হয় সারথী" কথাগুলির মধ্যে যথেষ্ট তাৎপর্যমন্ডিত সাহিত্য-গুণ লক্ষ্য করা যায়। গ্রামের অশিক্ষিত গীত-রচয়িতার কলমের আঁচড়ে এমন সোনার ফসল অপ্রত্যাশিত হলেও জন্মলাভ করেছে। কম কী! পয়ার ছন্দে আগাগোড়া লেখা না হলেও গায়ক যখন শ্রোতাদের সামনে কণ্ঠে সুর তোলেন তখন কোথাও ধীর তালে কোথাও দ্রুত তালে কথাগুলি উচ্চারণ করে যান। সাধারণত কথা ও মাত্রায় কমতি পর্বগুলি সুর দিয়ে ভরাট করে দেন। অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা চোখে পড়ে না। বরং শান্ত রসের স্বাদ মিলে যায়।

বিদ্যাসাগর

শুনেন শুনেন ভাই সব বলি সর্বজনে,
বীরসিংহের সিংহ শিশু কাহিনী এক মনে।
পিতা তার ঠাকুরদাস মাতা ভগবতী,
দয়ারও আধার মাতা, অতি গুণবতী।
ছেলেবেলায় পড়াশুনা গ্রামে করি শেষ,
শহরে চলিলেন বিদ্যাসাগর অতি দীনবেশ।
পেটে তার অন্ন নাই, জুটে নাই আলো,
শহরের ছেলে-মেয়ে সবাই বাসে ভাল।
চাদর গায়ে, চটি পায়ে চাকুরী করিল,
মায়েরে ভালবেসে ঈশ্বর চাকুরী ছাড়িল।
সেই সাহেব পুনরায় চাকুরি দিল ডেকে;
বিধবার দুঃখ দেখে মনে বড় ক্লেশ,
সেই বিধবার বিয়ের আইন ঘুরাই সারা দেশ।
আমি অতি মূঢ়মতি দীন পটিদার,
আমি কি বন্দিতে পারি সাগর অপার।
সাগরের কাহিনী যেইজন শুনে,
মূর্খ পন্ডিত হয় ধ্যান গুণীজনে।
বাসুদেবপুর বিদ্যাসাগর বিদ্যালয় তাঁরই হাতে গড়া,
সেই বিদ্যাপীঠে প'ড়ে খুশি হই আমরা।

গায়ক ঃ মন্টু চিত্রকর,
দাসপুর, মেদিনীপুর।

গানের বিশ্লেষণ ঃ বিদ্যাসাগর

গানটির বিষয়গৌরব অনস্বীকার্য। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষিগণের মতো পট গীতিটির রচয়িতা, বিদ্যাসাগর প্রশস্তি রচনা করেছেন। সংক্ষিপ্ত পরিসরে সংহত ভঙ্গিতে বিদ্যাসাগরের গুণাবলী, অতিশয় শ্রদ্ধাসহকারে উল্লেখ ও বর্ণনা করে গেছেন। বর্ণনা গুণেই অনুমান করা যায় দর্শক শ্রোতার মন বিদ্যাসাগরের প্রতি গভীর ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে যায়। গানটির পয়ারের ধীর লয়ে প্রবাহে ও সুমধুর স্বর (ধ্বনি) বিস্তারের দ্বারা সবাই মুগ্ধ হয়—তা সে গ্রামের সাধারণ স্তরের দর্শক হোন কিংবা শহরের বুদ্ধিমান দর্শকই হোন। গানটি এমন প্রাণময় শব্দাবলীতে রচিত হয়েছে যে এর মধ্যে চিত্রকলার প্রতিবিম্বও প্রতিফলিত হয়। তখন বিদ্যাসাগরের নির্জীব চিত্র সজীব হয়ে ওঠে—

অবশ্য গায়কের মরমী কণ্ঠস্বরও এক্ষেত্রে কাজে লাগে। গীতিকার আবার বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। সুতরাং মনে হতে পারে গানের প্রক্রিয়া অবলম্বন করে তিনি ব্যক্তিগত কৃত্যই পালন করে গেছেন। তা নয়। অনুভূতির তাগিদেই সব কিছু ঘটেছে। অনুভূতির রঙ লেগেছে বলেই বিদ্যাসাগরের জীবন ও গুণাবলী—যা অনেকের কাছেই পরিচিত—রসোদ্রেকে সক্ষম হয়।

গঙ্গা দূষণ

শোনেন শোনেন সর্বজন শোনেন দিয়া মন
জল আলো[১] পরিবেশের কথা কিছু করিব বর্ণন
সম্পদ সৃষ্টি তরে সৃষ্টি আবর্জনা
সব কিছু ফেলি জলে না করি ভাবনা
মরে হেজে[২] জলচর হইল বিরল
আবর্জনাই গঙ্গার হইল সম্বল
মৃতদেহ সবকিছু গঙ্গায় ভেসে যায়
কুর্মাদি[৩] প্রাণীরা তারা সে সকল খায়
রাসায়নিক বিষক্রিয়ার পর মরে যে সকল
স্বাভাবিক দূষণ মুক্তি হইল বিকল
কমেছে গঙ্গার গতি পারে না বহিতে
পলি পড়ে হইল পাহাড় নদীর চরেতে
মাঠেতে করিল চাষ জলে পড়ল টান
অতি যত্ন করে তারা পেল নাকো ধান
পাপী কাঁদে তাপী কাঁদে কাঁদে তারই ভাই
দুর্ভাবনায় কাটায় তারা গৃহেতে সবাই।

গায়ক ঃ আনন্দ চিত্রকর,
দক্ষিণ ২৪ পরগণার
সামালীতে শিল্পী গেয়েছিলেন।

গানের বিশ্লেষণ ঃ গঙ্গা দূষণ

১ আলো—সূর্য কিরণের তেজস্ক্রিয়তার কথা বলতে চেয়েছেন
২ হেজে — জলে পচে গিয়ে
৩ কুর্মাদি — কাছিম ইত্যাদি

গঙ্গা-দূষণও আধুনিক যুগের ঘটনা; সমস্যাও বটে। পটগীতিকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই মানবসৃষ্ট সমস্যার কারণ ও ভয়াবহ পরিণাম বিশ্লেষিত হয়েছে। কুফল বর্ণনা-প্রসঙ্গে গ্রামের বাসিন্দা এই গীতিকারের গানে জলাভাবে মাঠের শস্যহানির কথা স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়েছে। এখানে অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা বা অতিকথন চোখে পড়ে না। গীতটির কোথাও কোথাও অবশ্য ছন্দোপতন ঘটেছে। সেক্ষেত্রে গায়ক সুরের সামঞ্জস্যবিধান ঘটিয়ে— সুমধুর স্বর-বিস্তার করে, দর্শক-শ্রোতাদের খুশি করেন। সঙ্গীতের মাধ্যমে চিত্রকলাও ফুটিয়ে তোলা হয়। তবে চিত্র সহযোগে পটগীতি পরিবেশিত হয় বলে পটকে সজীব করে তোলাই পটগীতিকারের শ্রেষ্ঠ কাজ, বোধ হয়, এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। গঙ্গার দূষণে ও বালির চড়ার বাঁধনে গঙ্গার অপমৃত্যু দুঃখজনক ঘটনা। গায়কের আন্তরিক কণ্ঠস্বরে, নিশ্চয়ই দর্শক-শ্রোতার মানসে করুণ রসের সৃষ্টি করে। পয়ারের বিলম্বিত লয়ে, তাল-সহযোগে সঙ্গীতটি পরিবেশন করেন পটুয়া।

◆ সূত্র ঃ নবম অধ্যায় ◆

১. ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, লোকসাহিত্য(১ম), (১৯৬২), পৃঃ ২৩৮

২. " " পৃঃ ২৩৯

৩. " " পৃঃ ২৩৬

৪. " " পৃঃ ২৪১

৫. " " পৃঃ ২৪১

৬. শ্রীহর্ষ মল্লিক, প্রসঙ্গ লোকগীতি (১৯৮৬), পৃঃ ২৩

৭. অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, দেখা হয় নাই (১৯৭৩), পৃঃ ৩৫-৩৯

৮. সুকুমার রায়, ভারতীয় সঙ্গীত ইতিহাস ও পদ্ধতি (১৯৮৮), পৃঃ ১৫৭

৯. গুরুসদয় দত্ত, পটুয়া সঙ্গীত (১৯৩৯)

১০. ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী, বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস (দ্বিতীয় মুদ্রণ, এপ্রিল ১৯৯০), পৃ ঃ ২৯৩

১১. 'The Indian Painters, though illiterate in the Western sense are the most cultured of their class.' (Introduction, XIX, Ideals of the Indian Art,—H.B. Havel

১২. 'A very competent and independent witness Dr. Lefroy has testified from his long personal experience to the extraordinary aptitude with which the poorest and the most illeterate Hindu Peasant will engage in discussion in the deepest Philosophical and ethical questions.'

১৩. রায়বাহাদুর ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন ডি. লিট., প্রবর্তক/২২ বর্ষ/১ম খন্ড/৪র্থ সংখ্যা/শ্রাবণ/১৩৪৪ প্রবন্ধ/বাঙলার বিলুপ্ত সম্পদ — কথকতা।

১৪. রাজেশ্বর মিত্র, কথকতা, যোগসূত্র (অক্টোবর — ডিসেম্বর ১৯৯৩) পৃঃ ১১১

১৫. খগেন্দ্রনাথ মিত্র, পটুয়াসঙ্গীত, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪৬, পৃঃ ২৩১

১৬. গুরুসদয় দত্ত, পটুয়াসঙ্গীত, (১৯৩৯)

১৭. ডঃ ত্রিপুরা বসু, মেদিনীপুরের পটুয়াসঙ্গীত, অমৃতলোক ৫০, পৃঃ ৪৬

১৮. রমেশ বসু, বাংলার প্রাচীন চিত্র ও পট; বিচিত্রা, শ্রাবণ, ১৩৩৪, পৃঃ ২৪৭

১৯. পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত রাজ্য লোকসংস্কৃতি উৎসব' ৮৬তে লোকনাট্য সম্পর্কিত আলোচনাচক্রে পঠিত প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার।

২০. ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী, বাংলাব লোকসাহিত্যচর্চার ইতিহাস (১৯৯০), পৃঃ ৫০১

২১. সংস্কৃতি মঞ্চ (শারদ সংকলন'৯৪), পশ্চিমবঙ্গের লোকনাট্য

২২. ডঃ ধ্রুব দাস, ভারতের লোকনাট্য (১৯৯২)

২৩. দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, পটের ভাষা; মৃৎ সংস্কৃতি, (১৫ জুন, ১৯৯৩) পৃঃ ২৩

২৪. বিমলেন্দু চক্রবর্তী, লোকায়ত বাঙলার চিত্রশিল্পী ও চিত্রকলা (১৪০৩), পৃঃ ৩০

• পরিশিষ্ট (১) •

বাংলার বাইরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে পটচিত্র

পূর্বে আমাদের ধারণা ছিল, পটচিত্র শুধুমাত্র বাংলার নিজস্ব চিত্রসম্পদ। কিন্তু অনুসন্ধানে জানা গেছে পটচিত্র সর্বভারতীয় লোকশিল্প। আমাদের বাংলার গ্রাম-জনপদে, শহরে যেমন এর অনুশীলন এবং আদর লক্ষ্য করা যায়, তেমনি বাংলার সংলগ্ন ওড়িশা, আসাম, বিহার প্রভৃতি রাজ্যে, সুদূর গুজরাট, অন্ধ্র, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান প্রভৃতি ভারতের অন্য অঙ্গরাজ্যেও এর প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। পট পাওয়া গেছে রাজস্থানের যোধপুর-জয়পুর-উদয়পুর থেকে; মহারাষ্ট্রের পৈথান থেকে; মহারাষ্ট্রের ওয়ারঙ্গল নলগোন্ডা থেকে; দক্ষিণের তাঞ্জোর থেকে, ওড়িশার বিভিন্ন জেলা থেকে। এমনকি কয়েকটি স্থানের পট অতুলনীয় ঔজ্জ্বল্যে ভরা, যেমন নাথদ্বারের পারজী-কা-পড়, গুজরাট-রাজস্থানের জৈন পটগুলি। অনুসন্ধানের ফলে বহু আঞ্চলিক পট-নিদর্শন হাতে এসেছে, সেগুলি কাপড়ে আঁকা। যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হতো বলেই স্থায়ীকরণের উদ্দেশ্যে এবং জনসমক্ষে প্রদর্শিত হত বলেই কাপড়ে আঁকা হতো সেগুলি। প্রাচীন ভারতেও হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধগণ ধর্মপ্রচার, নীতিশিক্ষা ও চিত্তবিনোদনের জন্য ব্যাপক পটচিত্র ব্যবহার করতেন। অবশ্য নাম ও রচনাশৈলীতে মিল ও অমিল দুই-ই লক্ষণীয়। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার সব রাজ্যের পটুয়ারা বিশ্বাস করেন যে, তাঁরা দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার সন্তান। বাংলার পটুয়ারা যেমন এই 'মিথ্'-এ বিশ্বাসী, তেমনি সুদূর অন্ধ্র প্রভৃতি রাজ্যের পটুয়ারাও এতে বিশ্বাসী। বাংলার সংলগ্ন ওড়িশার পটুয়ারাও এই 'মিথ'-এ অবিশ্বাসী হবেন, এমন কোনো সম্ভাবনা নেই।

ওড়িশা বাংলা সংলগ্ন রাজ্য বলেই, সর্বাগ্রে সেখানকার পটের প্রচলন সম্পর্কে তথ্যাদি অনুসন্ধান বিশেষ জরুরী। তাছাড়া ওড়িশা বাংলা-সংলগ্ন রাজ্য হওয়ায়, এখানে পটচিত্র শিল্পের দ্বারা ব্যাপক পটচিত্রের চর্চা ও মিল অপ্রত্যাশিত বা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কারণ, বাংলার ও ওড়িশার মানুষদের নৃতাত্ত্বিক মিল বা প্রায় সমগোত্রীয়তা লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয়তঃ রাজনৈতিক কারণে—প্রশাসনিক সুবিধার্থে; পাঠান-মোঘল-ইংরেজ শাসকগণ কখনো ওড়িশার অনেকটা অংশকে বাংলার সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন, কখনো-বা বিযুক্ত করেছেন। যার ফলে এই দুই রাজ্যের শিল্প সংস্কৃতি প্রায় সমান কিংবা সমভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে। তৃতীয়তঃ মন্দিরময় ওড়িশার মন্দিরে-মন্দিরে বিশেষত জগন্নাথ মন্দিরে পটচিত্র বিক্রয়ের প্রথা অনুসৃত হওয়া স্বাভাবিক। ওড়িশার রাজধানী ভুবনেশ্বরে অবস্থিত 'ভুবনেশ্বর মিউজিয়াম'-এ প্রাচীন চিত্রাবলীর মধ্যে রক্ষিত আছে মোটা কাপড়ের ওপর অঙ্কিত দুটি জড়ানো পট চিত্র। রামায়ণের কাহিনী উপজীব্য বলে সেগুলিকে 'রামায়ণী পট' বলতে বাধা কোথায়? আর বস্ত্রখণ্ড অর্থাৎ পট্ট-এর ওপর অঙ্কিত বলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যে সময়ে পট আঁকা হতো বস্ত্রখণ্ডের ওপর, সে সময়েই কোনো এক পটশিল্পী লীলায়িত তুলিকার স্পর্শে এগুলি করেছেন। অর্থাৎ এগুলি সুপ্রাচীন সৃষ্টি। পটশিল্পী স্বয়ং কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তি ঐ-দু'খানি জড়ানো পটের নিচেই পটের বিষয়বস্তু লিখে দিয়েছেন ওড়িয়া

ও তেলেগু ভাষায়। ফলে পটচিত্রদ্বয় সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য ঠেকে না। তবে সেগুলির উদ্ভবস্থল বা সৃষ্টিস্থল অলিখিত বলে, উদ্ভবস্থল আমাদের কাছে এখনও অজ্ঞাত। তবে তার উদ্ভবস্থল সম্পর্কে অনুমানের একটু ক্ষীণ আলো জ্বলে ওঠে স্বাভাবিকভাবেই যখন আমরা ওড়িয়া ও তেলেগু ভাষায় নিচে লেখা তাদের বিষয়বস্তুর দিকে তাকাই। এই দিক থেকে অনুমান করা যায়, পটগুলি ওড়িশার দক্ষিণপ্রান্তবর্তী জেলা—গঞ্জাম জেলার কোন এক পটুয়ার রচিত। এসব জেলায় স্বাভাবিকভাবেই ওড়িয়া ভাষার পাশাপাশি কিছুটা দক্ষিণস্থ অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেগু ভাষার প্রচলন আছে। আমাদের অনুমান যদি সত্য হয়, তাহলে প্রায় নির্দ্বিধায় ভাবা যায় যে, সমগ্র ওড়িশায় পটচিত্রের প্রচলন ছিল, এই যুক্তিতে যে ওড়িশার উত্তর ও উত্তর-পূর্ব জেলাগুলির ওপর পটের পীঠস্থান বাংলার পটের জীবন্ত গতি-প্রবাহ আছড়ে পড়েছিল এবং পড়া স্বাভাবিক, যেহেতু উভয় প্রদেশের সংস্কৃতি অনেকটা সমভাবাপন্ন।

ওড়িশায় পটচিত্রের উদ্ভব নিয়ে বিস্তর মতভেদ আছে। নির্মলকুমার ঘোষ তথ্য-প্রমাণাদি দিয়ে এর প্রাচীনত্ব ও গুহাচিত্রের সঙ্গে-এর সম্পর্কের নিবিড়তা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।[১] শ্রী ঘোষ বলেছেন খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে সম্রাট খরবেলের সময়ে খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির গুহাচিত্র। অবশ্য কেউ কেউ খণ্ডগিরিকে উড়িয়া বৌদ্ধদের কীর্তি বলেছেন। খ্রীষ্ট্রীয় ৫ম ষষ্ঠ শতাব্দে রাজা দিশভরের আমলে বর্তমান কেওন্‌ঝড় জেলার 'রাবণছায়া' অঞ্চলের পাহাড়ী গুহা 'সীতাবিঙ্গি'র প্রাচীরের চিত্রাবলীই ওড়িশার পটচিত্রের আদিরূপ। তিনি বলেছেন যে, কালের পরিবর্তনের সঙ্গে উক্ত গুহাচিত্রাবলী যেন ক্রমে ক্রমে শীর্ণতর হয়ে ওড়িয়া পটচিত্রের রূপ ধারণ করেছে। এ সিদ্ধান্ত একেবারে উল্টাপাল্টা নয় বলে হয়তো সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না। আমাদের বাংলার পটের উদ্ভব সম্পর্কেও এমনতর ধারণা করা হয় যে, অজন্তা, ইলোরার গুহাচিত্রের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অবশ্য লিখেছেন যে বাঙালী পটুয়া "বাংলার পট অক্ষয় করে রেখেছে অজন্তায়।" নানা জনের মত থেকে এ সিদ্ধান্ত হয়তো আশা করা যায় যে, পটচিত্র গুহাচিত্রের অনুচিত্র। ওড়িশার পটচিত্রের উদ্ভব সম্পর্কে আবার কারো কারো ধারণা যে, ওড়িশায় বৌদ্ধধর্মের প্রবল ঢেউ আছড়ে পড়ার সময় পটচিত্রের প্রচলন শুরু হয়। বৌদ্ধভিক্ষুকগণ ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম-সংক্রান্ত পটচিত্র নিয়ে আসতেন, সেগুলিই ছিল ওড়িশার পটচিত্রের আদিপিতা। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধারণা পুরীর মন্দির বৌদ্ধধর্মীদের কীর্তি ও জগন্নাথ বৌদ্ধদেবতা। একসময় ওড়িশায় পটচিত্রের ওপর যেমন বৌদ্ধপটচিত্রের গভীর প্রভাব পড়েছিল স্বীকার করা হয়, তেমনি বাংলার পটচিত্রের ওপরও বৌদ্ধপটের প্রভাব পড়েছিল, এমন অনুমান হয়তো অমূলক নয়। আমাদের বাংলায় বৌদ্ধ প্রভাবপুষ্ট পটচিত্রও খুঁজে পাওয়া যায় যথেষ্ট। যেমন কারো কারো মতে বুদ্ধদেবের আক্ষরিক মূর্তি জগন্নাথের পট, উভয় রাজ্যেই পাওয়া যায়। এদিক থেকে বাংলায় পটচিত্রের সঙ্গে ওড়িশার পটচিত্রের বিষয়বস্তুর রীতিবৈশিষ্ট্য মিল খুঁজে পাওয়াও কষ্টকর নয়। নানা কারণে মিল থাকা স্বাভাবিক। কারণ প্রথমতঃ সুদূর অতীতের ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যায়, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজারাজড়ার আমলে কখনো বাংলার সীমা গেছে ওড়িশার কটক পর্যন্ত ছড়িয়ে, আবার কখনো ওড়িশা রাজ্যের সীমা বিস্তৃত হয়ে এসেছে একেবারে

গঙ্গার জলভাগ অবধি। বহু পূর্বে ওড়িশার রাজ্যসীমা ছিল ত্রিবেণী ও গঙ্গা অবধি। তেমনি গৌড়পতি দেবলদেবের সময় ও পালযুগে মোঘল ও ইংরেজ আমলে বাংলার রাজ্যের সীমা বিস্তৃত হয়েছিল কটক অবধি। দ্বিতীয়তঃ, জাতিতত্ত্ব বিচার করলে এবং এই উভয় রাজ্যের মানুষের নৃতাত্ত্বিক-গঠন বিশ্লেষণ করলে এমন কিছু পার্থক্যও ধরা পড়ে না। শুধু পটচিত্রের ক্ষেত্রে নয়, অন্যান্য শিল্পকলার শৈলী ও বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির ক্ষেত্রেও মিল বা শিল্প-সম্পর্ক পুরাতাত্ত্বিক রমাপ্রসাদ চন্দ লক্ষ্য করেছেন যুক্তি-তথ্য সাপেক্ষেই। তৃতীয়তঃ বাংলার সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ধর্মের অর্থাৎ মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ইত্যাদি প্রাচীন সাহিত্য, যেগুলি বাংলার নিজস্ব সাহিত্য সম্পদ, বাংলার বাউল পদাবলী ইত্যাদি সঙ্গীতের ধারা, বাংলার নিজস্ব নানাবিধ নৃত্যকলা এবং শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম ওড়িশার মানুষকে যুগে যুগে আকৃষ্ট করে এসেছে। বংশ বা লোকপরম্পরায় ঐতিহ্য যেমন অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে পটচিত্র, পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত পাটা চিত্র, পুঁথি চিত্র। পরম্পরা ধারায় তালপাতা বা ভুর্জপাতার পুঁথির মলাটে যে পাটাচিত্র অঙ্কিত হয় যা পটচিত্র বটেই তার অস্তিত্ব বাংলার মতো ওড়িশাতেও খুঁজে পাওয়া যায় যথেষ্ট। এবং পুঁথির পাতার ধারে ধারে চৌকো খোপেই আঁকা হতো পুঁথিচিত্র। যেগুলি ওড়িশাতেও পাওয়া যায়, যদিও সংখ্যায় ও প্রাচীনত্বে, উল্লেখ্য নয়। নির্মলকুমার ঘোষ তাঁর 'ভারত শিল্প' (১৯৮৩) গ্রন্থে সেরকম কয়েকটি পুঁথিচিত্রসম্বলিত পুঁথির উল্লেখ করেছেন। যেমন জয়দেবের গীতগোবিন্দ, ১৮ শতাব্দের 'বিদগ্ধ মাধব' ইত্যাদি। অনুসন্ধান করলে হয়ত সচিত্র আরও বহু পুঁথি খুঁজে পাওয়া যাবে।

একসময় ভারতের অন্যান্য তীর্থ-মন্দিরে যেমন পটচিত্র ছিল, অসংখ্য তীর্থযাত্রীর চাহিদা এতে মিটতো, তেমনি ভারতের প্রাচীন পুরীতীর্থে মন্দির প্রাঙ্গণে বিক্রি হতো অজস্র নানা ধরনের পটচিত্র। দেশ-বিদেশে কদরও ছিল যথেষ্ট। কিন্তু যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পটের স্থানে এলো ছাপা ছবি। লিথো ছাপা, যেগুলি সস্তায় বিক্রি হতে লাগলো, তখন কজনই-বা কিনতো মোটা কাপড়ের ওপর আঁকা পটচিত্র চড়া দামে। কাজেই পটুয়াদের দুরবস্থা উঠলো চরমে বিশ শতক থেকে। বহু পটচিত্রী পরিবর্তন করতে বাধ্য হলো তাদের পেশা। যাহোক, বহু পটচিত্রীর পট অঙ্কনের নেশা গেল না। নেশা যায়নি বলে পুরী শহরে চিত্রকর পাড়ায় কয়েক ঘরে, পুরীর পার্শ্ববর্তী রঘুরাজপুরে, তার আশেপাশে, ঢেঙ্কানল শহরের কাছে দীনবন্ধুপুর, মানপুর, সুবর্ণপুর গ্রামে, গঞ্জাল জেলার জয়পুর শহরে, মথুরা গ্রামে কিছু সংখ্যক পটশিল্পী এখনও পটচিত্র অঙ্কন করেন। রঘুরাজপুরের মহারাণা পদবিধারী পটুয়া পট অঙ্কন করেন। প্রথমে তাঁরা রেখাঙ্কন করেন, পরে বিভিন্ন রঙ ব্যবহার করেন। তাঁরা মোটা বস্ত্রখণ্ড ব্যবহার করেন। কাগজে ছাপাছবি বস্ত্রখণ্ডের ওপর আঁকা ছবির তুলনায় সস্তা। সোমনাথ চক্রবর্তী পুরীর পটচিত্রের গুণাবলী ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, "শুধু বিষয় বৈচিত্র্যই নয়, নান্দনিক দিক থেকে সে-সব পটচিত্র অনুপম সৃষ্টি।"[২]

পটের বিষয়বস্তু প্রায় সর্বত্র সমান। কিন্তু অঙ্কনরীতিতে কিছু পার্থক্য কোথাও কোথাও চোখে পড়ে। পুরীর পটশিল্পীর পটের বিষয়ের সঙ্গে ঢেঙ্কানলেব বিষয়গত মিল থাকলেও শৈলীতে কিঞ্চিৎ অমিল আছে। তবে পুরী ও রঘুরাজপুর কাছাকাছি বলে উভয়স্থানের

শিল্পীরা প্রায় একরীতি অনুসরণ করেন। প্রাচীনরীতি অনুযায়ী তাঁরা মোটা সুতীর কাপড়— ধর্মীয় ক্ষেত্রে নব বস্ত্রখণ্ড ব্যবহার করেন। তেঁতুল বিচির লেই ও খড়ি পাথরের গুঁড়ো একসঙ্গে মিশিয়ে ৩-৪ টুকরো কাপড়ে মাখিয়ে সেগুলোকে পিঠোপিঠি রাখা হয়, যাতে পটচিত্রের পটভূমি শক্ত ও টেকসই হতে পারে। শুকিয়ে গেলে পর কোঁচকানো স্থানগুলো ভারী শিলনোড়া বা বগড়া পাথরের টুকরোর সাহায্যে বস্ত্রখণ্ডের দু'দিকেই মসৃন করা হয়।

রঙ তৈরির উপকরণ এবং তৈরির রীতিও সাবেকী ধরনের। রঙিন মাটি, পাথর, গাছপালার লতা-পাতা থেকে রঙ তৈরি করে নেন সেখানে আজও পটুয়ারা। অবশ্য কখনও কখনও স্থানীয় চন্দনপুর হাট থেকে হরিতকী, গৌঁড়ি পাথর, শঙ্খচূর্ণ ইত্যাদি রঙের উপকরণ সংগ্রহ করে নেন। ঘন কালো রঙ তৈরি হয় হ্যারিকেনের ভূষোকালি থেকে, সাদা রঙ তৈরি হয় শঙ্খচূর্ণের সাহায্যে—শঙ্খচূর্ণ আগুনে ফুটিয়ে নরম ও মিহি করে নেওয়া হয়। নানা রঙের পাথর গুঁড়োকে শিলে বেটে খুবই মিহি করে নেওয়া হয়। বেলের আঠা ব্যবহার করা হয়। মোটা কিংবা সরু তুলির জন্য মেঠো বড় ইঁদুরের লোম কিংবা ছাগলের লোম বা কাঠবিড়ালীর লোম ব্যবহার করা হয়। বাংলায় যেমন প্রথমে রেখাঙ্কন করে নেওয়া হয়; পরে বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ রঙ লাগানো হয়; পটচিত্রের চারপাশে অলঙ্করণ রীতি অনুসৃত হয়, এক্ষেত্রে প্রায়ই অলংকৃত করা হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে পুরী মন্দিরের ত্রিমূর্তি— জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা, তাদের পটের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিষয় ছিল। জগন্নাথকে যদি বুদ্ধের আক্ষরিক মূর্তি বলে স্বীকার করা হয়, তাহলে বলতে হয় যে, ওড়িশায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রাবল্য থেকেই অর্থাৎ এখানে পট-প্রচলনের দিন থেকেই জগন্নাথ পটের প্রাচুর্য ঘটেছে। এই পট অঙ্কনের ক্ষেত্রে পটুয়ারা যেন বেশি সচেতন হয়ে উঠতেন। কারণ, জগন্নাথ ওড়িশায় জাগ্রত ও অতিপূজিত দেববিগ্রহ।। তাছাড়াও তাঁর পটচিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে বাস্তব ও সঠিক হতে হয় পটুয়াকে। কল্পনার দ্বারা মূর্তি আঁকা চলে না। কিংবা অবাস্তব রং ব্যবহার করা চলে না। বিভিন্ন তিথি ও উৎসবে তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন বেশবাস পরানো হয়। সেইসব বেশবাসের বিভিন্ন নাম। বাঁকাচূড়া বেশ, পদ্মবেশ, রাজ-রাজেশ্বর বেশ, গজ-উদ্ধারণ বেশ, রাধা দামোদর বেশ, কালীয়দমন বেশ ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন বেশে ভিন্ন রঙের বেশবাস বলে, জগন্নাথের পটের বৈচিত্র্য বেশি। জগন্নাথ পটের মতো ভক্তিপ্রধান বৈষ্ণব ধর্মপ্রভাবিত ওড়িশায় কৃষ্ণলীলা পটেরও চাহিদা প্রচুর এবং এক্ষেত্রে পটশিল্পীদের দক্ষতাও অতুলনীয়।

কৃষ্ণের জীবনের যেসব স্পর্শকাতর ঘটনা মানবমনে আবেগময় অনুভূতির সৃষ্টি করে— যেমন কৃষ্ণগোপালের ননীচুরি, গোপিনীদের বস্ত্রহরণ, কৃষ্ণ কর্তৃক গিরিগোবর্ধন ধারণ, রাধা কৃষ্ণের বংশীবাদন, কুরুক্ষেত্রে সারথ্য ইত্যাদি পটুয়াদের বিষয় নির্বাচন পটুতা প্রমাণ করে। তাছাড়া রামায়ণ মহাভারতের চরিত্র ও ঘটনাবলী একক পটচিত্রের বিষয়। বিশেষভাবে রামায়ণের চরিত্র ও ঘটনাবলী প্রধান বিষয় মর্যাদা লাভ করেছে। যেমন হরধনুভঙ্গ, ছদ্মবেশী রাবণের সীতার কাছে ভিক্ষা প্রার্থনা, রাম-সীতা রাজসভার সিংহাসনে, রামচন্দ্র ও চণ্ডাল গুহকের মিলন, হনুমান, ভরত আরো কত কি! রামায়ণের ভক্তিরস প্রাবল্য শৈব-বৈষ্ণব

ভাববাদী ওড়িশা জনপদবাসীর চাহিদা মেটাতে গিয়ে বোধ হয় রামায়ণের প্রাধান্য। সব ক্ষেত্রেই বাংলার প্রভাব লক্ষণীয়। নির্মলকুমার ঘোষ, রমাপ্রসাদ চন্দ এখানকার শিল্পশৈলীর সঙ্গে ময়ূরভঞ্জের খীচিং, কাংড়া, অজন্তা প্রভৃতি স্থানের চিত্ররীতির সমগোত্রীয়তা দেখতে পাননি, দেখেছেন বাংলা ঘরানার সম্পর্ক। প্রদ্যোৎ ঘোষ কালীঘাটের পটচিত্রের প্রভাব অনুমান করেছেন। তবে কালীঘাটের পটের বিষয়বস্তু ও অলঙ্করণের ক্ষেত্রে কিছুটা পার্থক্য লক্ষণীয়। কালীঘাট পটে ফুল-পাখি, প্রকৃতির দৃশ্য যেমন এককভাবে বিষয়মর্যাদা লাভ করেছে, এখানে সেগুলি অলংকরণে ও পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টির ক্ষেত্রে উপস্থাপিত করা হয়েছে। দীঘল বা জড়োয়া পটে পৌরাণিক বা লোকিক কোনো কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য সহযোগে ধারাবাহিকভাবে চিত্রিত হয়। একক পটে একটি চরিত্র বা মূর্তি রূপলাভ করে। কিন্তু অধুনা ওড়িশার পট পরিকল্পনায় পটুয়ারা একটু স্বাতন্ত্র্য এনেছেন। তাঁরা একই পটে মাঝখানে দৃষ্টিগ্রাহ্য আকারে আঁকছেন মূল চরিত্র বা মূর্তিকে এবং তার চারিদিকে ছোটো ছোটো খোপে বিন্যস্ত করছেন এবং মূল চরিত্রের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত—প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলীর চিত্ররূপ। এতে অনেকগুলি সুবিধা হয়। এর ফলে দর্শক জড়োয়া পটের স্বাদ বা তৃপ্তি অনুভব করছেন; তাঁদের কৌতূহলও তৃপ্ত হয়ে যাচ্ছে যথেষ্ট। এই নবতর রীতির অনুসৃতি অন্যত্র দেখা যায় না। একে পেশাগত বুদ্ধির একটি আবিষ্কার বলা যায়। নতুন কিছু করার উৎসাহে পটচিত্রের শিল্পীরা পটে কাপড়ের ব্যবহারকে নতুন আঙ্গিক রচনার কাজে লাগিয়েছেন। ঘন বুনোটের তসর, গরদ বা রেশমী জমিতে এখন এক ধরনের পট আঁকা হচ্ছে। কয়েক প্রস্থ কাপড় আঁটার প্রয়োজন হয় না এ ধরনের পটে। এক টুকরো রেশমী কাপড় যোগাড় করে কাঠের ফ্রেমে টানটান করে এঁটে রঙতুলি নিয়ে বসে যান। পটচিত্রের মতই ছবির বিষয়বস্তু ও শৈলী। তবে রঙটা আলাদা। প্রচলিত প্রথায় তৈরি জল রঙ রেশমের কাপড়ে ধরে না। এই জন্য আধুনিক ফ্যাব্রিক রঙ ব্যবহার করা হয়। দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখার উপযোগী করে রেশমী কাপড়ের পটে ওপর-নীচে দুটি কাঠের দণ্ড লাগানো থাকে। ঘর সাজানোতে লাগে বলে এর চাহিদাও প্রচুর।

তীর্থযাত্রীর দল, দেশ-বিদেশের পর্যটক, সরকারি অনুদানই এখন পটচিত্রকরদের ভরসা। পুরীর পটচিত্রকররা নতুন উৎসাহে কাজ করছেন। রীতি অবশ্য পুরনো। মেয়ে-পুরুষ হেলাফেলায় অনেক সময় তৈরি করে পুতুল কিংবা পট। ধ্রুপদী শিল্পের তুলিতেই ফুটে ওঠে লোকচিত্রের আর একটি আদল। আমাদের বাংলার পট ও পাটা চিত্রের ধাঁচে গুজরাটেও পট, যাকে বলা হয় অনুচিত্র—লক্ষ্য করা যায়। অনুচিত্রগুলি প্রাচীন পর্বতগাত্রস্থ গুহার অঙ্কিত চিত্রের ক্ষুদ্রতম রূপ। অনুচিত্রগুলি পুঁথির পাতায় দু'ধারে আয়তাকারবিশিষ্ট অংশস্থানে আঁকা হতো। সেগুলির বিষয়বস্তুতে যেমন ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়, তেমনি অঙ্কনশৈলীতেও ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। জৈন শাস্ত্র-পুঁথি কল্পসূত্রের বিষয়বস্তু মহাবীর জৈনের জীবনকথা বা অন্যান্য জৈন সাধুর জীবন কাহিনী সেসব অনুচিত্রে অঙ্কিত হয়েছে। সম্ভবত ১০৬৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত সর্বপ্রাচীন যে 'কল্পসূত্র'টি পাওয়া গেছে, তাতেও অনুচিত্র পাওয়া যায় যথেষ্ট। জৈন সন্ন্যাসী কালিকাচার্যের জীবনকথা সম্বলিত 'কালিকাচার্য কথা'য় অনুচিত্র পাওয়া যায়। অসামান্য যত্ন ও শ্রমে অঙ্কিত অনুচিত্রগুলি আমাদের বাংলার পটচিত্রকে স্মরণ করায়।

১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটের আওমেদাবাদে রচিত 'বসন্তবিলাস' কাব্যটি ৭৯টি অনুচিত্র সম্বলিত। এতে বসন্ত ঋতুর বর্ণময় সমাবেশের বর্ণনা যেমন কবিতার মধ্যে তেমনি অনুচিত্রের মধ্যেও বিবৃত। অঙ্কিত অনুচিত্রগুলি বাংলার ও অন্যান্য স্থানের জড়ানো পটচিত্রগুলিকে স্মরণ করায় কাহিনীর ক্রমিক বর্ণনা ও শৈলীর দিক থেকে। এখানেও বাংলার পটচিত্রের মতো মুখাবয়বের তিন চতুর্থাংশ চোখে পড়ে; চোখগুলি টানা টানা বড় আকারের; নাক দীর্ঘায়ত, চিবুকের সীমা রেখা ছাড়িয়ে যাওয়া। বুকের বিস্তার প্রশস্ত, অনেক ক্ষেত্রে বুকের অতি বিস্তার পুরুষ বা নারী চেনায় ভ্রম সৃষ্টি করে। আবার রাষ্ট্রকূট এবং পারমার গোষ্ঠীর সমকালে অঙ্কিত প্রাচীন এলোরার গুহার প্রাচীরে ও ছাদে অঙ্কিত চিত্রের সঙ্গে এর সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

লোকশিল্পবিশেষজ্ঞ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন 'গুজরাট অঞ্চলে এক ধরনের পটুয়া আছে, তাদের বলা হয় চিত্রকথী'। এরাও বাংলার সমব্যবসায়ীদের মত পট দেখিয়ে বেড়ায়; এই পটের আকৃতি অনেকটা প্রস্থে দেড় বা দুই হাত ও লম্বায় আট দশ হাত বা বেশি; তবে চিত্রের গঠনভঙ্গীর দিক থেকে এই ছবিগুলি যেমন স্বতন্ত্র, এর বর্ণবিন্যাসের কায়দাও একটু বিশিষ্ট। সাধারণত এই চিত্রকথিরা মহাভারতের উপাখ্যান নিয়েই চিত্র রচনা করে। এরাও চিত্র প্রদর্শনের সঙ্গে গানের সুরে ছড়া আবৃত্তি করে। জাতিতে এইসব চিত্রকথিরা ব্রাহ্মণ। বাংলার পটুয়াদের মতই গুজরাটের এই চিত্রকথিরাও তাদের জাত ব্যবসা ছেড়ে অন্য পেশা অবলম্বন করেছে।'[৩] মধ্যযুগীয় রাজস্থানী চিত্রের খ্যাতি অশেষ। সেই খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রের যুগ শুরু হয়েছিল ১৫ শতাব্দী থেকে। তবে তা ছিল অভিজাত স্তরের দরবারী। পারস্পরিক ধারায় অনুশীলিত লোকশিল্প পটচিত্রের সঙ্গে সে অভিজাত চিত্রপদ্ধতির পার্থক্য ছিল যথেষ্ট, থাকাও স্বাভাবিক। সে পটচিত্রের উৎপত্তি ঘটেছিল প্রাচীরচিত্র থেকে। অজন্তা, এলোরার গুহা চিত্রের আশ্রয় করে সৃষ্টি হয়। কালে কালে সেই চিত্রই পটচিত্রে ও অভিজাত চিত্রে পরিণতি লাভ করে। রাজস্থানের জয়পুরী চিত্রে পাওয়া যায়, ক্ষুদ্র অবয়ব অঙ্কনের ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম তুলির টান, অজস্র মিশ্র রঙের ব্যবহার; কম্পোজিসনের দিক থেকে গতিশীলতা, পারস্পরিক প্রকৃতির চিত্রণ, উজ্জ্বল মনোরম রঙের ব্যবহার, রাজস্থানী পট শিল্পেও পাওয়া যায় লোকশিল্পীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গী, বর্ণের উজ্জ্বলতা, বিষয়বস্তুর নাটকীয় সমাবেশ। এখানকার রাজস্থানের নাথদ্বারের 'পাবুজী-কা-পড়' পটগুলি দেখে মনে হয় এখানকার লোকশিল্প পটচিত্র, যেমন অন্যান্য প্রদেশে ঘটেছে, অভিজাত শিল্পীর আদি মাতা। তাছাড়াও এখানকার পটচিত্র দেখে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় গুজরাটের জৈন চিত্রাবলী ও দক্ষিণভারতের বিজয়নগরের ভিত্তিচিত্রের প্রভাব রয়েছে এগুলির ওপর।

বর্তমান উত্তর বিহারে মধুবনী চিত্রশিল্প উৎকৃষ্ট শিল্প হিসাবে যা পরিচিত, একসময় তা মৈথিলী চিত্রশিল্প নামে অভিহিত হতো। মৈথিলী চিত্রশিল্প নামটিতে প্রাচীনত্বের এবং উচ্চ মার্গীয় রীতির কিছুটা গন্ধ লেগে আছে মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে তা ছিল লোকশিল্প জাতের। সুতরাং মধুবনী শিল্পের ভিন্নতর বৈশিষ্ট্য ভাববার আর সুযোগ নেই। অর্থাৎ এটিও লোকশিল্প শ্রেণীর। লোকশিল্প শ্রেণীর—কেননা সে শিল্পে নিতান্ত হিন্দু লোকসাধারণের—

সর্বপ্রকার দেবদেবী, ধর্মীয় কথা কাহিনী রূপায়িত হতো, নিতান্ত জনসাধারণের দ্বারা এবং সাধারণের মনোরঞ্জন ও শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে। তাতে প্রাচীন মার্গীয় রীতির স্পর্শমাত্র লক্ষ্য করা যেতো না। সাধারণত গৃহবাসিনী স্ত্রী লোকেদেরই নিযুক্ত থাকতে শিল্পরসিক Heinz Mode যেমন দেখেছিলেন, তেমনি আজও সেখানকার স্ত্রী লোকেদের মধ্যে শিল্পচর্চার ধারা অনেকটা অব্যাহত আছে। একসময় বাংলায় বিশেষত কালীঘাটের পটুয়া পাড়ার গৃহস্থ ঘরের স্ত্রী লোকেরা পটচিত্র নির্মাণে বিশেষ ভূমিকা নিতেন, তবে সেক্ষেত্রে তারা পটের অংশবিশেষ নির্মাণে সহযোগিতা করতেন। কিন্তু মধুবনী ঘরানায় স্ত্রী লোকেদের ভূমিকা প্রবল। পটচিত্র নির্মাণে যেন তাদের একচেটিয়া অধিকার ও দক্ষতা। উপকরণ সংগ্রহ, রং প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি ব্যাপারে প্রধান ভূমিকায় ছিল তারা। তারাই সংগ্রহ করতো রঙিন মাটি নানা প্রকার ভেষজ ও আকরিক রং। প্রস্তুতকরণেও ছিল তারাই। অবশ্য কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে—যেমন অন্যান্য অঞ্চলে ঘটেছে—সেখানেও তাই ঘটেছে। পটচিত্রকে আরও আকর্ষণীয় করতে এবং শ্রমলাঘব করতে, বাজার থেকেই রাসায়নিক রং ক্রয় করে নেওয়া হয়। এবং তা আঁকা হয় কাগজের ওপর। তবে আজও সেখানকার গ্রামীণ জনজীবনের চিত্ররূপ ফুটে ওঠে পটচিত্রগুলিতে। গাছপালা, পশুপাখি, হলকর্ষণ পটচিত্রে জীবন্ত হয়ে ওঠে। আজও ধর্মীয় ও লোকায়ত চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে রং ব্যবহার, বিন্যাসভঙ্গি ও সমতা লক্ষ্য করা যায়। তাদের দেবদেবী ও মানবমানবীর পোষাকপরিচ্ছদ, গাত্রবর্ণ, পটভূমি প্রায় একরূপ।

Heinz Mode[৪] দেখেছিলেন উত্তর বিহারে ও বিহার সংলগ্ন বাংলা প্রান্তবর্তী অঞ্চলে এক শ্রেণীর হিন্দু লোকচিত্রশিল্পীকে, যাঁরা তৈরি করতেন মালা, সেই সঙ্গে এক ধরনের কাগজের casket যার ওপর আঁকা হতো প্রায়ই মিশ্র রঙের সাহায্যে সর্প দেবতা মনসার আকারের প্রতিমূর্তি যা বিশেষত পূর্ব বাংলার পটচিত্রের অন্যতম বিষয়বস্তু। উত্তর বিহার অঞ্চলের এই সর্পবেষ্টিত সর্পদেবতা বিষহরির। পটচর্চার রহস্য অনুধাবনে মনে হয় মনসাপট, যা সে অঞ্চলের মানুষেরা সর্পদেবতাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখে শ্রদ্ধা ভক্তির পরিচয় দিতেন, হয়ত তার ওপর বাংলার মনসাপট প্রভাব বিস্তার করেছিল। এবং মনসামঙ্গল কাহিনী ছিল তার মূল কারণ।

◆ সূত্র ঃ পরিশিষ্ট (১) ◆

১. ভারতশিল্প (১৯৮৩) পৃঃ ৫৮ ঃ নির্মলকুমার ঘোষ
২. নীলাচলের পটচিত্র ঃ দেশ, ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৮৬
৩. বাংলার লোকশিল্প (১৯৬১) পৃঃ ৫৪ ঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
৪. Indian Folk art (1985) Heinz Mode / Subodh Chandra

• পরিশিষ্ট (২) •

বিভিন্ন জায়গার পটুয়াদের নাম, ঠিকানা এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

হবিচক- নানকারচক-মুরাদপুর ফোক আর্ট পটুয়া সংঘ

গ্রাম- হবিপুর, পোষ্ট - নন্দপুর, থানা-চন্ডীপুর, জেলা - মেদিনীপুর, প্রযত্নে নিরঞ্জন চিত্রকর।

(১) বিজয় চিত্রকর, গ্রাম - নানকারচক, পোঃ নন্দপুর। বয়স ৪৮ বছর। ৩০ বছর ধরে পট আঁকছেন ও গান করছেন। ৫টি শংসাপত্র পেয়েছেন—মহকুমা তথ্য অফিস, বিড়লা, মামুদপুর, চন্ডীপুর, কালিকাখালি থেকে।

(২) নিরঞ্জন চিত্রকর, গ্রাম - হবিপুর, পোঃ - নন্দপুর। বয়স - ৫৫ বছর, ৪০ বছর ধরে গান রচনা করছেন ও পট আঁকছেন। শংসাপত্র ৩০টি — রাজ্য পুরষ্কার, জেলা পুরষ্কার, মহকুমা পুরষ্কার এবং বিভিন্ন গ্রামের অনুষ্ঠানে পুরষ্কার।

(৩) রব্বান চিত্রকর, গ্রাম - মুরাদপুর, পোঃ- ফুলবাড়ী। বয়স ৬০ বছর। ৪৫ বছর ধরে পট আঁকছেন ও গান করছেন। ২টি শংসাপত্র — মহকুমা তথ্য অফিস ও চন্ডীপুর থেকে।

(৪) গুলজান চিত্রকর, গ্রাম - হবিচক, পোঃ- নন্দপুর। বয়স ৪০ বছর। ৩০ বছর ধরে পট আঁকছেন এবং গান করছেন।

(৫) ঝর্ণা চিত্রকর, গ্রাম - হবিচক, পোঃ - নন্দপুর। বয়স ৪০ বছর। ২০ বছর ধরে পট আঁকছেন ও গান করছেন। ২ টি শংসাপত্র — বিড়লা, চন্ডীপুর থেকে।

(৬) জয়নাল চিত্রকর, গ্রাম - নানকারচক, পোঃ — নন্দপুর। বয়স ৫০ বছর। ৩০ বছর ধরে পট আঁকছেন ও গান করছেন।

(৭) জবারাণী চিত্রকর, গ্রাম - হবিচক, পোঃ- নন্দপুর। বয়স ৩০ বছর। ৫ বছর ধরে পট আঁকছেন ও গান করছেন। ১টি শংসাপত্র বিড়লা মিউজিয়াম থেকে পেয়েছেন।

(৮) তপন চিত্রকর, গ্রাম হবিচক, পোঃ- নন্দপুর, বয়স ২৬ বছর। ১০ বছর ধরে পট আঁকছেন ও গান করছেন। বাণীপুর থেকে ১টি শংসাপত্র পেয়েছেন।

(৯) সুপ্রিয়া চিত্রকর, গ্রাম - নানকারচক, পোঃ - নন্দপুর,। বয়স ৩১ বছর। ৫ বছর ধরে পট আঁকছেন ও গান করছেন।

(১০) দিলবাহার চিত্রকর, গ্রাম - মুরাদপুর, পোঃ - ফুলবাড়ী, বয়স ৫০ বছর। ৩০ বছর ধরে পট আঁকছেন ও গান করছেন;

(১১) জামসেদ চিত্রকর, গ্রাম - নানকারচক, পোঃ - নন্দপুর। বয়স - ২০ বছর, ৫ বছর ধরে পট আঁকছেন ও গান করছেন।

(১২) মমিন চিত্রকর, গ্রাম - গিলখালি, পোঃ - নন্দপুর, বয়স ৪৫ বছর। ২৫ বছর ধরে পট আঁকেন ও গান করেন। ২টি শংসাপত্র চন্ডীপুর ও মুরাদপুর থেকে।

(১৩) রাইমা চিত্রকর, গ্রাম - নানকারচক, পোঃ - নন্দপুর। বয়স ৩৬ বছর। ১০ বছর ধরে পট আঁকছেন ও গান করছেন। ২টি শংসাপত্র - বিড়লা মিউজিয়াম ও বিজ্ঞানভবন থেকে।

(১৪) গুলজান চিত্রকর, গ্রাম - নানকারচক, পোঃ - নন্দপুর। বয়স - ৪৫ বছর, ৫ বছর ধরে পট আঁকেন ও গান করেন।

(১৫) ফুলজান চিত্রকর, গ্রাম - নানকারচক, পোঃ- নন্দপুর। বয়স ৩৫ বছর। ১০ বছর ধরে পট আঁকছেন ও গান করছেন।

(১৬) ফজলু চিত্রকর, গ্রাম - নানকারচক, পোঃ - নন্দপুর। বয়স ২০ বছর, ৫ বছর ধরে পট আঁকছেন ও গান করছেন। ৩টি শংসাপত্র- রাজ্য পুরষ্কার, মহকুমা ও হাঁসচড়া থেকে।

(১৭) ধনঞ্জয় চিত্রকর। বয়স ৭০ বছর। ৫০ বছর ধরে পট আঁকছেন ও গান করছেন।

(১৮) নুর মহম্মদ চিত্রকর, বয়স ৫৩ বছর। ৩০ বছর ধরে পট আঁকছেন ও গান করছেন। মুরাদপুর রামকৃষ্ণ মেলা, চন্ডীপুর ক্ষুদিরাম মেলা থেকে শংসাপত্র পেয়েছেন।

(১৯) বামেদ চিত্রকর, বয়স ৪৫ বছর, ৩০ বছর ধরে পট আঁকছেন ও গান করছেন। মুরাদপুর রামকৃষ্ণ মেলা থেকে শংসাপত্র পেয়েছেন।

(২০) জব্বর চিত্রকর, বয়স ৬০ বছর, ৪০ বছর ধরে পট আঁকছেন ও গান করছেন।

(২১) খোকন চিত্রকর, বয়স ২০ বছর। ৫ বছর ধরে পট আঁকছেন ও গান করছেন।

(২২) জামাল চিত্রকর, বয়স ৪৮ বছর, ৩২ বছর ধরে পট আঁকছেন ও গান করছেন।

(২৩) সমীর চিত্রকর, বয়স ৩২ বছর। ১৬ বছর ধরে পট আঁকছেন ও গান করছেন।

(২৪) গুরুপদ চিত্রকর, বয়স ৫৫ বছর। ৩০ বছর ধরে পটআঁকছেন ও গান করছেন। মুরাদপুর, চন্ডীপুর ও মধুপুর থেকে শংসাপত্র পেয়েছেন।

(২৫) ময়না চিত্রকর, বয়স ৩৫ বছর, ৫ বছর ধরে পট আঁকছেন ও গান করছেন।

(২৬) গোলাপ চিত্রকর, বয়স ৫০ বছর, ২৫ বছর ধরে পট আঁকছেন ও গান করছেন।

(২৭) মনোরঞ্জন চিত্রকর, বয়স ৮০ বছর, ৬৫ বছর ধরে পট আঁকছেন ও গান করছেন।

(২৮) ময়না চিত্রকর ছোট, বয়স ২৭ বছর, ৫ বছর ধরে পট আঁকছেন ও গান করছেন।

(২৯) রতন চিত্রকর, বয়স ৫০ বছর, ৩২ বছর ধরে পট আঁকছেন ও গান করছেন।

(৩০) নিমাই চিত্রকর, বয়স ৩৫ বছর, ৫ বছর ধরে পট আঁকছেন ও গান করছেন।

(৩১) সোনা চিত্রকর, বয়স ২৫ বছর, ৫ বছর ধরে পট আঁকছেন ও গান করছেন।

(৩২) আহমদিয়া চিত্রকর, বয়স ২৮ বছর, পট আঁকা ও গান করা ৭ বছর ধরে।

(৩৩) হানিফ চিত্রকর, বয়স ৩৮ বছর, ২০ বছর ধরে পট আঁকছেন ও গান করছেন।

(৩৪) মবানী চিত্রকর, ২৩ বছর বয়স, ৭ বছর ধরে পট আঁকছেন ও গান করছেন।

(৩৫) রহিমা চিত্রকর, ৩২ বছর বয়স। ৫ বছর ধরে পট আঁকছেন ও গান করছেন। বিড়লা মিউজিয়াম থেকে শংসাপত্র পেয়েছেন।

(৩৬) নুরজাহান চিত্রকর, বয়স ৩০ বছর, ৬ বছর ধরে পট আঁকছেন ও গান করছেন।

(৩৭) খতেজা চিত্রকর, বয়স ২২ বছর, ৫ বছর ধরে পট আঁকছেন ও গান করছেন। বিড়লা মিউজিয়াম থেকে শংসাপত্র পেয়েছেন।

থানা - দাসপুর, জেলা - মেদিনীপুর

(১) কানন চিত্রকর, গ্রাম ও পোঃ - নাড়াজোল, বয়স ৪৮ বছর, ৩৫ বছর ধরে পট আঁকছেন ও গান করছেন। বিভিন্ন স্তরে বহু শংসাপত্র পেয়েছেন।

(২) আয়রন চিত্রকর, গ্রাম ও পোঃ - নাড়াজোল, বয়স ২৮ বছর, ১০ বছর ধরে পট গান করছেন।

(৩) গৌরী চিত্রকর, গ্রাম - নির্ভয়পুর, পোঃ- শংকরপুর, বয়স ৬৫ বছর, ৫৫ বছর ধরে পট আঁকছেন, গান রচনা করছেন ও গান গাইছেন। রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক, ব্রোঞ্জমূর্তি এবং বিভিন্ন শংসাপত্র পেয়েছেন।

(৪) ইসমাইল চিত্রকর, গ্রাম ও পোঃ - নাড়াজোল, বয়স ৩৪ বছর, ২২ বছর ধরে গান রচনা করছেন, পট আঁকছেন ও গান করছেন। মহকুমা থেকে ১টি শংসাপত্র পেয়েছেন।

(৫) ময়না চিত্রকর, গ্রাম - নির্ভয়পুর, পোঃ শংকরপুর। ৩০ বছর বয়স, ১৫ বছর ধরে গান রচনা করছেন, গাইছেন, আঁকছেন। ৩টি বিভিন্ন স্থান থেকে শংসাপত্র পেয়েছেন।

(৬) জয়দেব চিত্রকর, গ্রাম - নির্ভয়পুর, পোঃ - শংকরপুর, বয়স ৩০ বছর। ১৫ বছর ধরে পট আঁকছেন ও গান করছেন। রাজ্যস্তরে ১টি শংসাপত্র পেয়েছেন।

(৭) মন্টু চিত্রকর (বড়), গ্রাম - নির্ভয়পুর, পোঃ - শংকরপুর। বয়স ৩৬ বছর, ২৬ বছর ধরে গান রচনা করছেন, পট আঁকছেন ও গান রচনা করছেন। ৩টি বিভিন্ন স্থান থেকে শংসাপত্র পেয়েছেন।

(৮) ভাটু চিত্রকর, গ্রাম - নির্ভয়পুর, পোঃ - শংকরপুর। ৪০ বছর বয়স, ২০ বছর ধরে গান রচনা করছেন, পট আঁকছেন ও গান গাইছেন। রাজ্যস্তর থেকে শংসাপত্র পেয়েছেন।

(৯) বনমালী চিত্রকর, গ্রাম ও পোঃ নাড়াজোল, বয়স ৩৫ বছর, ১৫ বছর ধরে পট আঁকছেন ও গান করছেন।

(১০) আলিমুদ্দিন চিত্রকর, গ্রাম ও পোঃ - নাড়াজোল, বয়স ২৮ বছর, ৫ বছর ধরে পট গান করছেন।

(১১) ইউসুফ চিত্রকর, গ্রাম ও পোঃ- নাড়াজোল, বয়স ৩৫ বছর, ১০ বছর ধরে পট আঁকছেন ও গান করছেন।

(১২) জুম্মান চিত্রকর, গ্রাম ও পোঃ - নাড়াজোল, বয়স ৪৫ বছর, ২২ বছর ধরে পট আঁকছেন ও গান করছেন।

(১৩) হারু চিত্রকর, গ্রাম ও পোঃ নাড়াজোল, বয়স ২৩ বছর, ৫ বছর ধরে পট আঁকছেন ও গান করছেন।

(১৪) সবিতা চিত্রকর, গ্রাম ও পোঃ নাড়াজোল, বয়স ২৬ বছর, ১৪ বছর ধরে পট আঁকছেন ও গান করছেন। ১টি রাজ্যস্তরের শংসাপত্র ও মেলা থেকে আর্থিক পুরস্কার।

থানা - ডেবরা, জেলা - মেদিনীপুর

(১) ফুলজান চিত্রকর, গ্রাম - বাঘাগেড়া, পোঃ সেধিনারায়ণ, বয়স ৪০ বছর, ২৫ বছর ধরে পট আঁকছেন ও গান করছেন। জেলাস্তর থেকে শংসাপত্র পেয়েছেন।

(২) রাম চিত্রকর, গ্রাম - বাঘাগেড়া, পোঃ - সেধিনারায়ণ, বয়স ৫০ বছর। ৩৫ বছর ধরে পট আঁকছেন ও গান করছেন। রাজ্যস্তর ও জেলাস্তর থেকে শংসাপত্র পেয়েছেন।

(৩) পিয়ার চিত্রকর, গ্রাম - বাঘাগেড়া, পোঃ - সেধিনারায়ণ, ৬০ বছর বয়স, ৪০ বছর ধরে পট আঁকছেন ও গান করছেন। রাজ্যস্তর থেকে শংসাপত্র পেয়েছেন।

থানা - পিংলা, জেলা - মেদিনীপুর, গ্রাম ও পো ঃ - নয়া

(১) অজয় চিত্রকর, (২) মণি চিত্রকর (৩০), (৩) অমর চিত্রকর,

(৪) স্বর্ণ চিত্রকর, (৫) দুখুশ্যাম চিত্রকর (অষ্টম অধ্যায়ে বিশদ পরিচয় আছে)

(৬) ননীগোপাল চিত্রকর (অষ্টম অধ্যায়ে বিশদ পরিচয়)

(৭) গুরুপদ চিত্রকর ''

(৮) আনন্দ চিত্রকর ''

(৯) শ্যামসুন্দর চিত্রকর ''

(১০) মন্টু চিত্রকর ''

(১১) যমুনা চিত্রকর ''

(১২) করুণা চিত্রকর ''

(১৩) শম্ভু চিত্রকর, (১৪) রানি চিত্রকর, (১৫) মধু চিত্রকর

(১৬) মালেক চিত্রকর, (১৭) খাদু চিত্রকর, (১৮) রাধা চিত্রকর

(১৯) পুতুল চিত্রকর

থানা - তমলুক, জেলা- মেদিনীপুর, গ্রাম - কাঁকড়দহ, পোঃ ডিমারীহাট

(১) বচন চিত্রকর, বয়স ৫৫ বছর।

(২) বাবলু চিত্রকর, বয়স ৩৫ বছর। রাজ্য ও জেলাস্তরে বিভিন্ন পুরষ্কার।

(৩) শম্ভু চিত্রকর, বয়স ২১ বছর।

(৪) সুকুমার চিত্রকর, বয়স ৩৪ বছর।

(৫) গোপাল চিত্রকর, বয়স ২৪ বছর।

(৬) সুভাষ চিত্রকর, বয়স ৬০ বছর।

(৭) ভূতনাথ চিত্রকর, বয়স ৬৫ বছর।

(৮) মন্টু চিত্রকর, বয়স ৪৮ বছর।

(৯) পুলিন চিত্রকর, বয়স ৭৫ বছর।

থানা - নন্দকুমার, জেলা - মেদিনীপুর

অজিত চিত্রকর ওরফে নেমাজী মিস্ত্রী, গ্রাম - ঠেকুয়াচক, পোঃ - কুমোরচক।

বীরভূমের যে সব গ্রামে পটুয়ার বাস

রামপুরহাট থানা — আয়াস, বোনতা, বসোয়া, বিষ্ণুপুর, চাঁদপাড়া, সাহাপুর বা সা'পুর।

নলহাটি থানা — কলিঠা, ঝাউপাড়া, সরধা,

মুরারই থানা — জানকীনগর, কামালপুর, রুদ্রনগর,

সিউড়ি থানা — পুরন্দরপুর, পানুরিয়া, ইটাগুড়িয়া, জুনিদপুর

ময়ুরেশ্বর থানা — ষাটপলসা, তারাচি, কানাচি, তালগুা, শিবগ্রাম, সমাচার, মদীয়ান, মালঞ্চি, দাদপুর ও কুন্ডলায়।

নানুর — পাকুড়হাঁস।

লাভপুর থানা — দাঁড়কায়।

বোলপুর থানা — সুপুর ও বল্লভপুর।

সাঁইথিয়া থানা — মেজেরা, দিঘা, ভ্রমরকুল, কুসুমযাত্রা, বাগডোলা, জুই, মইরাপুর।

দুবরাজপুর থানা — পছিয়াড়া, কুলতোড়ে।

(বর্তমানে এই গ্রামগুলিতে পটুয়ার সন্ধান করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হতাশ হতে হবে। পটুয়ার সন্ধান মিলবে না)

বীরভূমের কয়েকজন পটুয়া

কালাম পটুয়া, বয়স ৩৫ বছর। গ্রাম - চাঁদপাড়া, থানা-রামপুরহাট, তপশিলি উপজাতিভুক্ত কালাম পটুয়ার বাবার নাম ভোলানাথ পটুয়া, মেয়ের নাম শ্রাবণী পটুয়া।

চাঁদপাড়া গ্রামের অন্য পটুয়াদের নাম-লাক্ষি পটুয়া, রামু পটুয়া, থাকু পটুয়া, ফটিক পটুয়া।

নসুপতি পটুয়া — চাঁদপাড়া, রামপুরহাট। পেশায় অবসরপ্রাপ্ত এই শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা ইংরাজিতে এম. এ.। সম্ভবত নসুপতি-ই পশ্চিমবঙ্গের পটুয়াদের মধ্যে প্রথম ডিগ্রিধারী শিক্ষিত। এঁদের পরিবারের কথা পৃথকভাবে বলবার মতই। নসুপতি বাবুর ভাই সেলিম পটুয়া বর্তমানে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ছেলে মুকুল পটুয়া দুর্গাপুরে শিক্ষকতা করেন, মেয়ে মর্জিনা পটুয়া এল আই সি অফিসে কর্মরত। সুতরাং সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পটুয়া সমাজের এই পরিবারটিই যে সর্বোচ্চ শিক্ষিত — এ কথা বলা চলে।

নসুপতি পটুয়ার পিতা ধনপতি পটুয়ার (৮৫) বক্তব্য অনুযায়ী, তাঁদের পিতা রাসবিহারী পটুয়া বর্ধমান জেলা থেকে আসেন সাপের বাঁশি নিয়ে। তৎকালীন জমিদারকে সাপের উৎপাত থেকে বাঁচাবার জন্যই একজন সাপুড়েকে আনার প্রয়োজন হয়। তাই জমিদার শেষপর্যন্ত রাসবিহারী পটুয়াকে একখন্ড জমি দান করে এখানে বসতি করান।

মেদিনীপুর এবং বীরভূম জেলার বাইরে মুর্শিদাবাদের গোকর্ণ, বড়োএঞা প্রভৃতি গ্রামে, পুরুলিয়া জেলার মুজরামুড়া গ্রামে, বাঁকুড়া জেলার লোয়াড়ি, বেলিয়াতোড় প্রভৃতি গ্রামে পটুয়ারা বসবাস করেন। এর বাইরে অন্যত্রও কিছু পটুয়া আছেন।

• পরিশিষ্ট (৩) •

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থপঞ্জি

১. পটুয়া সঙ্গীত, গুরুসদয় দত্ত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৯
২. পটুয়া, গুরুসদয় দত্ত, ৬০ বি, মির্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৯৩০
৩. লোকায়ত বাংলা। সুনীল চক্রবর্তী, কলিকাতা, ১৯৬৯
৪. ভারতের চিত্রকলা, অশোক মিত্র, কলিকাতা, ১৩৬৩
৫. পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (অখন্ড), বিনয় ঘোষ, কলিকাতা, ১৩৬৩
৬. বৃহৎ খন্ড (প্রথম খন্ড)। দীনেশচন্দ্র সেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২১
৭. বাঙ্গালীর ইতিহাস ঃ আদি পর্ব। নীহাররঞ্জন রায়। কলিকাতা, ১৩৫৬
৮. পদাবলী পরিচয়, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন, কলিকাতা
৯. বাংলার লোকসাহিত্য (১ম), আশুতোষ ভট্টাচার্য। কলিকাতা, ১৯৫৪
১০. শিল্পচর্চা। নন্দলাল বসু, ১৯৫৭
১১. চিত্রদর্শন। কানাই সামন্ত। ১৮৮১ শকাব্দ। ১৯৫৯
১২. বাংলার লোকশিল্প। কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। ১৯৬১
১৩. আলিম্পন, দুর্গা মুখোপাধ্যায়, ১৯৬১
১৪. পশ্চিমবঙ্গের শিল্পচেতনা। আশিস বসু। ১৯৬২
১৫. লোকসাহিত্য (২য়)। আশরাফ সিদ্দিকী। ১৯৬৩
১৬. আল্পনা। বিষ্ণু শর্মা। ১৩৬৭
১৭. উত্তর রাঢ়ের লোকসঙ্গীত। দিলীপ মুখোপাধ্যায়। ১৯৭০
১৮. বীরভূমের যমপট ও পটুয়া। দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৭২
১৯. বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি। শংকর সেনগুপ্ত। ১৯৭২
২০. দেখা হয় নাই। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৭৩
২১. বাংলার লোকসংস্কৃতি। ওয়াকিল আহমদ। ১৯৭৪
২২. শিল্প ভাবনা। ভোলানাথ ভট্টাচার্য। ১৯৭৫
২৩. পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প। পঃ বঃ সরকার। ১৯৭৬
২৪. পাল যুগের চিত্রকলা। সরসী কুমার সরস্বতী। ১৯৭৮
২৫. পট-পুতুলের বাংলা। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৭৯
২৬. বঙ্গলক্ষ্মীর ঝাঁপি। অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৭৯
২৭. বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব। বিনয় ঘোষ, ১৩৮৬ (১৯৭৯)
২৮. বাংলার লোকসংস্কৃতি। আশুতোষ ভট্টাচার্য। ১৯৮২
২৯. বাংলাদেশের লোকশিল্প। বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। ১৯৮২
৩০. প্রসঙ্গ লোকগীতি। শ্রীহর্ষ মল্লিক। ১৯৮৫
৩১. প্রসঙ্গ লোকচিত্রকলা। শ্রীহর্ষ মল্লিক। ১৯৮৬
৩২. বাংলার চিত্রকলা, অশোক ভট্টাচার্য। ১৯৯৪
৩৩. ওপেনটি বাইস্কোপ। শোভন সোম। ১৯৯৩
৩৪. ভারত শিল্প, নির্মল ঘোষ। ১৯৮৩
৩৫. মৃৎ সংস্কৃতি, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৯৩
৩৬. প্রসঙ্গ ঃ লোকমাধ্যম, সঞ্জীব সরকার সম্পাদিত। ১৯৮৬
৩৭. পট পটুয়া পটগীতি, ডঃ বারিদবরণ ঘোষ। ১৯৯২

৩৮. লোকায়ত বাঙলার চিত্রশিল্পী ও চিত্রকলা, বিমলেন্দু চক্রবর্তী। ১৪০৩
৩৯. বাঙলার লোকসংস্কৃতি। বরুণকুমার চক্রবর্তী ও দিব্যজ্যোতি মজুমদার সম্পাদিত, ১৯৯৬
৪০. ভারতীয় শিল্পধারা, দেবপ্রসাদ ঘোষ। ১৯৮৬
৪১. দক্ষিণ ২৪ পরগণার লোকশিল্প, সত্যরঞ্জন মন্ডল। মে, ১৯৮৪
৪২. মুর্শিদাবাদ চর্চা, মুর্শিদাবাদের পটুয়া ঃ জীবন চর্চা ও শিল্প চর্চা, পুলকেন্দু সিংহ। ১৩৯৫
৪৩. সংগ্রহশালা ও লোকশিল্প, ডঃ বিজনকুমার মন্ডল। ১৯৯৯
৪৪. কলকাতা কালচার, বিনয় ঘোষ, ১৩৬০ (১৯৫৩)
৪৫. চৈতন্য পরিক্রমা, বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত। ১৩৯৩
৪৬. পশ্চিমবঙ্গ দর্শন ঃ মেদিনীপুর, তরুণদেব ভট্টাচার্য।
৪৭. ভারতীয় সঙ্গীত ইতিহাস ও পদ্ধতি, সুকুমার রায়। ১৯৮৮
৪৮. পট চিত্র-গীতি, সুশীল কুমার ধাড়া ও গোপীনন্দন গোস্বামী। ১৯৮৬
৪৯. ভারতের লোকনাট্য, ডঃ ধ্রুব দাস। ১৯৯২
৫০. শিল্পায়ন (২য় সং)। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৩৬৬
৫১. মেলা ও উৎসবের দর্পণে বাংলার লোকসাহিত্য, ডঃ সুনীত কুমার মুখোপাধ্যায়, ১৯৯৭।
৫২. শান্তিপুর ঃ সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস, ডঃ পূর্ণেন্দু নাথ। ১৪০৩
৫৪. ডাকাতের মেয়ে রাগুতি, অনিমেষকান্তি পাল, ১৯৯৯
৫৫. লোকসংস্কৃতি সমীক্ষার পদ্ধতি (২য় সংস্করণ) ড. দুলাল চৌধুরী। ১৯৯৮
৫৬. ব্যবহারিক নৃবিজ্ঞান (১ম সংস্করণ) : ড. আর. এম. সরকার। ১৯৮৩
৫৭. Cultural oscillation, Binay Bhattacharjya, 1980
৫৮. Bazar Paintings of Calcutta, W. G. Archer, London, 1953
৫৯. Folk ritual paintings of Bengal, Sudhir Ranjan Das, 1953.
৬০. The Ritual Art of the Bratas of Bengal, Sudhansu Kumar Roy, Calcutta, 1961
৬১. Kalighat Drawings, W.G.Archer, 1962
৬২. Designs in Traditional Arts of Bengal, Kalyan Kumar Ganguly, 1963
৬৩. Kalighat Paintings, W.G.Archer, 1971
৬৪. East Indian Manuscript paintings, S.K.Saraswati, Chhabi, Golden Jubilee volume, 1971
৬৫. Traditional Art & Crafts of West Bengal, Binoy Ghosh, 1981
৬৬. Kalighat Pats & annals and appraisal, Prodyot Ghosh, 1373
৬৭. The two great Indian Artists, Editor-Prasanta Daw, 1978
৬৮. Folk arts and crafts of Bengal : The collected papers, Gurusaday Dutt, 1990
৬৯. Indian folk Art, Heinz Mode, Subodh Chandra, 1985
৭০. Cultural Anthropology, N. K. Bose, 1961

প্রাসঙ্গিক পত্রিকাপঞ্জি

১. পটুয়ার প্রাচীন ইতিহাস, গুরুসদয় দত্ত, বাংলার শক্তি, পৌষ ১৩৪৫
২. পটুয়া সঙ্গীত, গুরুসদয় দত্ত, বাংলার শক্তি, চৈত্র ১৩৪৫
৩. বাঙ্গলার পট, দেবপ্রসাদ ঘোষ, অন্যমনে, চৈত্র ১৩৭৮

৪. মেদিনীপুরের চিত্রকর সম্প্রদায় ও মাটির পুতুল, তারাপদ সাঁতরা, অন্যমনে, চৈত্র ১৩৭৮
৫. বাংলার পট, পটুয়া ও পটগীতি, জয়ন্ত চক্রবর্তী, দেশ, মাঘ ৮, ১৩৭২
৬. বাংলার পটুয়া সমাজের সংগঠন ও চরিত্র, বিনয় ভট্টাচার্য, ডেভিড ম্যাককাচ্চন স্মৃতি বক্তৃতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২৩ এপ্রিল, ১৯৭২
৭. ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা। ক্ষিতিমোহন সেন, বিশ্বভারতী, চৈত্র ১৩৫৬
৮. পট ও পটুয়া, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, কলাভবন বুলেটিন, বিশ্বভারতী, নভেম্বর ১৯৬৯
৯. পূর্ব বাংলার গাজীর পট। আশুতোষ ভট্টাচার্য, ঐ
১০. একটি চিত্রিত পাণ্ডুলিপি ও বাংলার পট, দেবপ্রসাদ ঘোষ, সারস্বত, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৬ (১৯৬৯)
১১. পট, আশিস বসু, ভারত কোষ, ৪র্থ খন্ড, ১৯৭০
১২. আজকের কালীঘাট পটুয়া ঃ সমীক্ষা, ভোলানাথ ভট্টাচার্য, কৌশিকী, শারদীয়া ১৩৭৮ (১৯৭১)
১৪. বাংলার পটকথা, প্রণব রায়, কৌশিকী, ২য় বর্ষ, ৮ম-৯ম সংখ্যা, ১৩৭৯ (১৯৭২)
১৫. কুমারটুলীর লেখা ও চাল, ভোলানাথ ভট্টাচার্য, কৌশিকী, শারদীয়া ১৩৭৯ (১৯৭২)
১৬. রূপসী বাংলার চিত্রকর, শোভন সোম, উত্তরসূরি, মাঘ-আষাঢ় সংখ্যা, ১৩৭৮-৭৯ (১৯৭২)
১৭. অন্বিষ্ট, বিশেষ পট সংখ্যা, ১৯৭৩
১৮. মেদিনীপুর জেলার তিনটি গ্রামের পটিদার পাড়া, প্রভাত কুমার দাস, সমকালীন, পঞ্চবিংশ বর্ষ, ফাল্গুন ১৩৮৪
১৯. পট-পটুয়াদের ভবিষ্যৎ, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সমতট ৩৫, জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৭৮
২০. কালীঘাটের পট, কল্যাণী মহাপাত্র, লোকচিত্রকলা, ১ম বর্ষ, শরৎ সংখ্যা, ১৩৮৬ (১৯৭৯)
২১. বিষ্ণুপুরী তাস, কল্যাণী মহাপাত্র, লোকচিত্রকলা, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩৮৬ (১৯৭৯)
২২. পট-চিত্র, চলচ্চিত্র ও কমিকস, শ্রীহর্ষ মল্লিক, চিত্রকল্প - ২৪, ফেব্রুয়ারী ১৯৮১
২৩. পট ও পটুয়া প্রসঙ্গে ঃ সমীক্ষা, প্রতিবর্ত গ্রুপ অব কালচারাল স্টাডিজ, সংকলন ঃ প্রশান্ত কুমার সেন, প্রতিবর্ত, বর্ষ ১, সংখ্যা ১, ১৯৮২
২৪. হোম, লোকশিল্প বিশেষ সংখ্যা, ৬, মার্চ - ১৯৮২
২৫. বিলুপ্তির পথে বীরভূমের পটশিল্প ঃ দুঃখে দিন কাটছে শ্রমিকদের, বঙ্গলোক, ১৪/৫/৯৬
২৬. নিষিদ্ধ পল্লীর ঘুম ভাঙছে, সংবাদ প্রতিদিন, ২৬/৪/৯৭
২৭. কালীঘাটের পট, শ্রীধর মিত্র, শারদীয় আলিপুর বার্তা, ১৪০১
২৮. পোটোপাড়ার পট বদল, রবিশঙ্কর দত্ত, সান্ধ্য আজকাল, ১/৭/৯৪
২৯. মেদিনীপুরের পটুয়াসঙ্গীত, ডঃ ত্রিপুরা বসু, অমৃতলোক-৫০
৩০. পটের দুর্গা, নির্মল কর, দৈনিক বর্তমান, ১৩/১০/৯৬
৩১. কোরিয়ার মেয়ে বাংলার গ্রামে পটুয়াদের 'বোন', দীপঙ্কর চক্রবর্তী, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭/৪/৯৫
৩২. বাংলার পটুয়ারা ভালো নেই, দেবদত্ত গুপ্ত, সঞ্জয় সাহা, যুগান্তর, ২৩/২/৯৪
৩৩. পট আঁকার কথা মুন্সিরা জেনে ফেললে ঝামেলা, দীপককুমার বড় পণ্ডা, যুগান্তর, ২৩/২/৯৪
৩৪. মেদিনীপুরের নিরঞ্জন পটুয়া, আলপনা ঘোষ, সাপ্তাহিক বর্তমান, ৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৪
৩৫. মৃৎ শিল্পীরা টিঁকে থাকতে ধর্ম পাল্টাচ্ছেন। দীপককুমার বড় পন্ডা, যুগান্তর, ৩/৫ ৯৪
৩৬. পট ও পটুয়া ঃ ফরাসী বিপ্লব থেকে আগস্ট বিপ্লব, গুরুপ্রসাদ মহান্তি, যুগান্তর, ৭/১১/৯৩
৩৭. নামাজ পড়েন বিশ্বকর্মার নবম সন্তান, পিনাকীনন্দন চৌধুরী, আনন্দবাজার পত্রিকা,

২০/১১/৯৩
৩৮. বাংলার পট ও পটুয়া, নাজেস আফরোজ, আজকাল, ৭/৩/৯৩
৩৯. বাংলার পটের কোনও চাহিদা নেই, দেবাশিস চন্দ, ঐ
৪০. বিপননের ব্যবস্থা নেই। শোভন সোম, ঐ
৪১. পট ও পটুয়া, তপন কর, সোনামাণিক, এপ্রিল'৯৩
৪২. তোমার মায়ার অন্ত নেই। দিব্যজ্যোতি মজুমদার, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪/৪/৯৩
৪৩. সরকারি উদাসীনতার দরুণ কালীঘাটের পটশিল্প অবলুপ্তির পথে, দৈনিক ওভারল্যান্ড, ৭/৫/৯৩
৪৪. অথ বটতলা সম্বাদ, দেবদত্ত গুপ্ত, দৈনিক বসুমতী, ৮/৩/৯২
৪৫. পটের আড়ালে, রবিশঙ্কর বল, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪/৬/৯০
৪৬. শুধু পটে লিখা, অশোককুমার কুন্ডু, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫/১০/৮৯
৪৭. পটের গান—নয়াগ্রাম, সুজাতাপাম্বী সরকার, দেশ, ১৮/৬/৮৮
৪৮. জৈন পরিবারে সরস্বতী পূজা ও একটি পটচিত্র, সুধীর চক্রবর্তী, দেশ, ২৩/১/৮৮
৪৯. ছবিতে ব্যঙ্গবিদ্রূপ কৌতুক, পরিতোষ সেন, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭/৭/৮৮
৫০. রাজনৈতিক কার্টুন, সম্পাদকীয়, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭/৭/৮৮
৫১. নীলাচলের পটচিত্র, সোমনাথ চক্রবর্তী, দেশ, ১৩/১২/৮৬
৫২. পট কথা, ময়না সেন, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫/১০/৮৯
৫৩. গ্রামোন্নয়ন (পটুয়া গান সংখ্যা), দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর' ৯৬, সম্পাদনা অমৃতলাল পাড়ুই
৫৪. বাঁকুড়ার পটেরি, রূপাই সামন্ত, ছত্রাক, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৮২
৫৫. বানপট ঃ গান এবং পালা, অদিতিনাথ সরকার, যোগসূত্র, অক্টো-ডিসেম্বর, ১৯৯৩, সম্পাদক বিনয় ঘোষ
৫৬. পশ্চিমবঙ্গের লোকনাট্য, ডঃ ধ্রুব দাস, সংস্কৃতি মঞ্চ, শারদ সংকলন '৯৪
৫৭. বাংলার লোকশিল্প পট ও পটুয়া, দীপককুমার বড় পণ্ডা, শারদীয়া সমাজশ্রী, ১৩৯৯
৫৮. চন্ডীপুরের পটুয়ারা হাপুও গাইছেন না, দীপককুমার বড় পণ্ডা, যুগান্তর, ৩/৮/৯৪
৫৯. ভাই রাজাতো আমার কি, দীপককুমার বড় পণ্ডা, যুগান্তর, ৯/৩/৯৪
৬০. দক্ষিণ ২৪ গরগণার মৃৎশিল্পীদের ল্যাজেগোবরে অবস্থা, দীপককুমার বড় পণ্ডা, সাপ্তাহিক আলিপুর বার্তা, ১০/৬/৯৫
৬১. কেশিয়াড়ী গ্রামের পটুয়ারা, দীপককুমার বড় পণ্ডা, দৈনিক তীরভূমি, ১৩/৮/৮৯
৬২. পটের গান, দীপককুমার বড় পন্ডা, ১৫/১০/৮৯
৬৩. মুল্লীরা গ্রামে-গঞ্জে হিন্দু বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। দীপককুমার বড় পণ্ডা, দৈনিক চেতনা, ৪/৫/৮৯
৬৪. নগ্ন সরস্বতী ঃ শিল্পীর স্বাধীনতা ঃ হতভাগ্য পটুয়ারা, দীপককুমার বড় পণ্ডা, আলিপুর বার্তা, ১৯৯৫
৬৫. পট, দীপককুমার বড় পণ্ডা, লোকসংস্কৃতি ঘোষ, ১৯৯৫
৬৬. পটুয়া, ডঃ চিত্তরঞ্জন মাইতি, লোকসংস্কৃতি কোষ, ১৯৯৫
৬৭. পটচিত্র-শৈলী বিচার, অশোক ভট্টাচার্য, লোকশ্রুতি ১০, জানুয়ারি, ১৯৯৩
৬৮. চলো যাই পটের দেশে, দিগ্বিজয় পটুয়া, পথ ও প্রান্তর, চৈত্র ১৪০৩
৬৯. বাঁকু পটুয়ার জগৎ, সুধীর চক্রবর্তী, দেশ, ২০ এপ্রিল ১৯৯১

৭০. সংযোগ সঞ্চারণ এবং লোকসংস্কৃতি, ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত
৭১. অনসর পট এবং রঘুরাজপুরের পটশিল্প, অলয় ঘোষাল, সাপ্তাহিক বর্তমান, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৯৮
৭২. কালীঘাটের পটুয়াদের নূতন মূল্যায়ন শুরু হয়েছে, ডঃ জ্যোতীন্দ্র জৈন, দেশ, ৮ অগষ্ট, ১৯৯৮
৭৩. পটের গ্রাম নয়া, কমলেশ কামিলা, শারদীয়া ভ্রমণ, ১৪০২
৭৪. চিত্রকর পুটয়াদের জীবন-জীবিকা ও সামাজিক পরিবর্তনের ধারা, দীপককুমার বড় পণ্ডা, লোকশ্রুতি ১৪, আগস্ট, ১৯৯৮
৭৫. নান্দনিক তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে পটের শৈল্পিক গুণাবলী, দীপককুমার বড় পণ্ডা, একবিংশ, এপ্রিল-জুন, ১৯৯৯
৭৬. Subhas Sarkar & Raktim Dutta, High & Dry, The Statesman, 26. 04. 1998
৭৭. Kalighat Patas, B. N. Mukherjee, Album of Art Treasures, Indian Museum, 1987
৭৮. The Patuas of Kalighat—A look into their tradition and change, R.M. Sarkar, Man in India, December 1994

• পরিশিষ্ট (৪) •

বিশেষজ্ঞদের মতামত

(১)

পটুয়ারা একটি অন্তরিত গোষ্ঠী নয়—গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার ধারায় এঁরা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত এবং জাতি অধ্যুষিত সমাজদর্শনের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁদের প্রভাব সবিশেষ বিস্তৃত হয়েছে। হিন্দুসমাজের অন্যতম সদস্য হিসেবে পটুয়ারা তাঁদের পটচিত্রের বিষয়বস্তুর জন্য হিন্দুশাস্ত্রের নানা ধর্মীয় ঘটনাকে উপস্থাপন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের শিল্পীমন হিন্দুশাস্ত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যার কঠোরতাকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে সায় দেয়নি। আপন চিন্তাধারার বিকাশে এগুলির উপস্থাপন ভিন্ন পথে পরিচালিত হয়েছিল। এই ঘটনাটিতে তদানীন্তন ব্রাহ্মণ পরিচালিত সমাজ অসন্তুষ্ট হল এবং দেশজ চিন্তাধারায় বিকশিত পটুয়াদের জনপ্রিয়তাকে উক্ত সমাজ হৃষ্ট চিত্তে গ্রহণ করতে পারল না। এমনিভাবে পটুয়ারা ব্রাহ্মণ পরিচালিত সমাজে অচ্ছুৎ বলে ঘোষিত হল। কঠোর অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং সামাজিক যন্ত্রণা পটুয়াদের দিশেহারা করে দিয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে কঠোর সংগ্রামে ব্রতী হয়েও যখন পটুয়ারা বৃহত্তর হিন্দুসমাজের মধ্যে নিজেদের মর্যাদা রক্ষা করতে পারল না তখনই মুসলমান ধর্মের পরিমণ্ডলে তারা আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। কিন্তু লক্ষণীয় যে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মত এরা সম্পূর্ণভাবে ধর্মান্তরিত হয়ে যায় নি। দীর্ঘকালের ঐতিহ্যমন্ডিত হিন্দু শাস্ত্র সম্পর্কিত বিষয়ের পট অঙ্কন হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার নানা ঘটনার বিষয় পটের মাধ্যমে উপস্থাপনের প্রয়াসকে এরা ত্যাগ করতে পারে নি। একদিকে প্রাচীন ঐতিহ্য এবং অপর দিকে আর্থিক ও সামাজিক বিপর্যয় এই বিশেষ শিল্পীগোষ্ঠীর সম্মুখে বহুমুখী সমস্যার সৃষ্টি

করেছিল। উল্লেখযোগ্য যে সেই সমস্যার কাছে শিল্পীমানসিকতা নতিস্বীকার করেনি বরং তাকে 'চ্যালেঞ্জ' জানিয়ে তারা সামগ্রিক জীবনকে দ্বিমুখী ধারায় প্রবাহিত করে দিয়েছিল। হিন্দু এবং মুসলিম ধর্মের দু'টি ধারাকে পটুয়ারা তাদের শিল্পী মনের প্রেক্ষাপটে সমন্বিত করে দেওয়ার আন্তরিক প্রয়াসটিকে বিশেষভাবে কার্যকর করে তুলেছিল। আজও সেই প্রয়াস একইভাবে কাজ করে চলেছে। সমাজ-সাংস্কৃতিক জীবনের মহাপ্রতিকূলতায় পটুয়া সমাজের এই প্রয়াসটিই একটি সার্থক সাংস্কৃতিক অভিযোজন।

ডক্টর দীপককুমার বড় পণ্ডা তাঁর পটুয়া জীবনচর্যা ভিত্তিক নব পুস্তকটিতে উপরোক্ত বিষয় সমূহের মূল্যায়নে প্রয়াসী হয়েছেন। আলোচনার প্রথম থেকেই তিনি পটশিল্প ও পটুয়াজীবনকে একীভূত করে পর্যবেক্ষণ করার প্রতি যত্নবান। লক্ষ্য করার বিষয় যে তাঁর রচনাটিতে তাত্ত্বিক গবেষণার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রসমীক্ষার একটি সার্থক যোগসূত্র রচিত হয়েছে। পটুয়া জীবনকে এই পুস্তকে অত্যন্ত কাছে থেকে ক্ষেত্র সমীক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে অবলোকন করার প্রচেষ্টা গৃহীত হয়েছে। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অঞ্চলে যেখানে পটুয়া সম্প্রদায় দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে চলেছে সেই সব অংশে এই জনগোষ্ঠীর প্রাচীন ও বর্তমান জীবনচর্যার ধারাটিকে নানা তত্ত্ব ও তথ্যের সাহায্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় যে এই মূল্যায়ন প্রচেষ্টায় পটুয়া সম্প্রদায় বৃহত্তর জাতিগোষ্ঠীর কার্যকরী পশ্চাৎপটে নিরীক্ষিত হয়েছে। পটশিল্পের উৎস এবং ক্রমিক বিকাশ, এর আর্থসামাজিক পটভূমি, পরিবর্তনের ধারা যেমন এই পুস্তকে বিশ্লেষিত হয়েছে তেমনি একটি গণসম্প্রদায় হিসেবে পটুয়াদের উৎপত্তি, তাদের জীবনের নানা উত্থান-পতন যুগান্তব্যাপী দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ঘটনাবলীর প্রতি প্রভূত দৃষ্টিদানও করা হয়েছে। এখানেই বোধ করি এই পুস্তকটির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। পটুয়া জনগোষ্ঠীর পৌরাণিক উপকথা (mythology), ঐতিহাসিক, নান্দনিক এবং সমাজবিজ্ঞান ভিত্তিকতার, পারস্পরিক ক্রিয়া বিক্রিয়ার এক বন্দোবস্ত চেতনাকে অতি যত্নসহকারে দৃষ্টান্তের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে বাংলায় পটুয়াদের আলোচনার পশ্চাৎপটে তাদের আঞ্চলিক বিভিন্নতার বিষয়ও চিত্রিত হয়েছে । এর সঙ্গে খুব স্বাভাবিকভাবেই এসেছে গ্রামভিত্তিক পটুয়া ও পটশিল্পের নগরায়ণ। অবস্থার চাপে পড়ে গ্রামীণ পটুয়ারা তাদের শিল্পসম্ভার নিয়ে শহরমুখী হতে বাধ্য হয়েছে এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই তাদের চিন্তা ও কর্মধারার মধ্যে এই পরিবর্তনের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। পরিপূর্ণ দেশজ চিন্তাধারায়, ও দেশজ উপকরণের মাধ্যমে এই পটুয়ারা যে বিশেষ ধরনের তুলির আঁচড় কেটেছেন তার মৌলিকত্ব সারাবিশ্বে অভিনন্দিত হয়েছে। বিশ্ব শিল্পপরিমণ্ডলে এই অতি সাধারণ প্রায় নিরক্ষর গ্রামীণ মানুষদের শিল্পচেতনা যে বিশেষ দিকটির উত্থাপন করেছে তার সার্বিক পরিচয় পেতে গেলে পট শিল্পের বিন্যাস ও বিস্তৃতি এবং পটুয়াগোষ্ঠীর জীবনচর্যার ঘটনাবিচিত্রাকে একই সাথে অনুধাবন জরুরী বলেই বিবেচিত হয়। বর্তমান পুস্তকটি সেই বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের সঙ্কল্পে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

রেবতীমোহন সরকার
সম্পাদক ঃ ম্যান ইন ইন্ডিয়া
অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত), নৃতত্ত্ব বিভাগ,
বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা

(২)

ডঃ দীপককুমার বড় পণ্ডা পট চর্চার ইতিহাসে তাঁর 'পটুয়া সংস্কৃতি ঃ পরম্পরা ও পরিবর্তন' গ্রন্থটিকে সযত্নে উপহার দিয়েছেন। তাঁর গবেষণার বৈশিষ্ট্য হলো প্রত্যক্ষ সমীক্ষালব্ধ তথ্যকে সুবিন্যস্ত করে উপস্থাপনা। তিনি গ্রন্থটির ভূমিকায় তাঁর গবেষণার পথ ও পদ্ধতি সুচিহ্নিত করেছেন, যা অনেকের গবেষণায় অনুল্লিখিত থাকে। লোকসংস্কৃতি গবেষণায় এই পদ্ধতি নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ডঃ বড় পণ্ডা অত্যন্ত সতর্ক এবং একনিষ্ঠ গবেষক। মেদিনীপুর ও বীরভূম জেলার গ্রামে গ্রামে তিনি দিনের পর দিন সমীক্ষা করেছেন পটুয়াদের জীবনযাত্রা এবং পট বিষয়ক তথ্য। পটকে তিনি লোকশিল্প হিসেবে চিহ্নিত করে পটের প্রাচীন ইতিহাস যেমন সযত্নে সংকলন করেছেন, তেমনি পটশিল্পের শৈলী ও নান্দনিক সৌন্দর্যতত্ত্ব বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন।

আলোচ্য গ্রন্থে ডঃ বড় পণ্ডা পটে প্রতিফলিত সমাজচিত্র সুন্দরভাবে তুলেছেন। পটুয়াদের জীবনযাত্রা অত্যন্ত সহজ ও সরল। বাউলদের মত এদের সমাজেও সাংস্কৃতিক বা জাতিগত দোলনশীলতা পরিলক্ষিত। বাউলদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সমীকৃত। অনেকক্ষেত্রে অনেক পটুয়ার দু'টো নাম বর্তমান। অনেকেই মসজিদে নামাজ পড়েন আবার অনেকেই হিন্দু আচার-বিধান জানেন। কিন্তু উভয়েই ছবি আঁকেন মনসার বা রাম-রাবণের অথবা মহিষাসুরমর্দ্দিনী দুর্গার। প্রকরণ একই। গানের একই বিষয় এবং রীতি এক। এই দোলনশীল গোষ্ঠীবদ্ধতা পটুয়া ও বাউলদের সমাজবদ্ধতার বহুত্ববাদকে প্রতিষ্ঠিত করে। নৃতত্ত্বে যাকে "বাফার কম্যুনিটি" বলে, সমাজ বিজ্ঞানে তাকে "সাংস্কৃতিক দোলনশীলতা" বলা যায়। চিত্রকরদের অন্তরঙ্গ পরিচিতিও লেখক এই গ্রন্থে দিয়েছেন।

পটচিত্র এবং গান যে সাংস্কৃতিক সংযোগের একটা শক্তিশালী মাধ্যম, সে কথা ডঃ বড়পণ্ডা সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। রৈখিক সংযোগের প্রত্যক্ষতা পটচিত্রে প্রকট। প্রত্যক্ষ গণসংযোগ লোকশিক্ষা বিস্তারেও সহায়ক। বাংলার গ্রামে গ্রামে যুগ থেকে যুগান্তর পট এবং অন্যান্য দৃশ্যমান শিল্পকলা লোকশিক্ষা বিস্তারে সহায়তা করেছে। এখনও করছে। ডঃ বড় পণ্ডা সে কথাও উল্লেখ করেছেন। পটে দুর্গা বা অন্যান্য দেবদেবীর পূজার রীতি ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন। ঘটে, পটে, প্রতিমায় দেবতার অর্চ্চনা বাংলায় সুপ্রাচীন। 'পটশিল্পের ভবিষ্যৎ' আলোচনা প্রসঙ্গে গবেষক ডঃ বড় পণ্ডা পটুয়াদের অর্থনৈতিক সংকট এবং সমাজের পট পরিবর্তন ও সাংস্কৃতিক রসতৃষ্ণার পরিবর্তনের কথাও বলেছেন। সমাজ পরিবর্তন অনিবার্য। চলচ্চিত্র ও দূরদর্শন আমাদের দৃশ্য-শ্রব্য সাবেকী ঐতিহ্যের এবং রুচিবোধের বিপুল পরিবর্তনসাধন করেছে। কম্প্যুটার এবং ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি আগামী শতাব্দীতে যে বিপুল বৈপ্লবিক পরিবর্তন সারা পৃথিবীতে আনবে তারই প্রেক্ষাপটে পটচিত্র ও পটের গান টিকে থাকবে কিনা —এ নিয়ে গভীর সংকটের প্রশ্ন আমাদের সামনে রয়েছে। গ্রামের 'চন্ডীমন্ডপ সংস্কৃতি' যতই ভেঙ্গে পড়বে, জীবনের গতিশীলতা যতই বাড়বে লোকসংস্কৃতি ততই পরিবর্তিত হবে। নবরূপে নব নব শিল্পের উদ্ভাবনও ঘটবে। তাই সুনিশ্চিত কোন ভবিষ্যৎবাণী বলাও অসম্ভব।

এই গ্রন্থের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো ভালো ডকুমেন্টেশন বা তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। কোন কোন গ্রন্থ কোন কোন বিষয়ের অনন্য তথ্যচিত্র হয়ে ওঠে। এই গ্রন্থ প্রসঙ্গেও সেকথা বলা চলে। পটুয়াদের নাম, গ্রাম, হারানো পটের গ্রাম, পটুয়াদের ঠিকানা, পটের

গানের সংকলন, বিভিন্ন রাজ্যের পটের ও পটুয়ার পরিচিতি, কুলপঞ্জী ইত্যাদি এই গ্রন্থটিকে আকর গ্রন্থের মর্যাদা দেবে। বাংলার পটুয়া ও পটের ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক আলোচনার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থের সারস্বত ভূমিকা সুদূরপ্রসারী। গ্রন্থটির ব্যাপক প্রচার কামনা করি। লোকসংস্কৃতির গবেষক ডঃ দীপককুমার বড় পণ্ডার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

দুলাল চৌধুরী

সিনিয়র রিসার্চ ফেলো অ্যাণ্ড প্রোজেক্ট ডিরেক্টর
ডিপার্টমেন্ট অব কালচার, মিনিস্ট্রি অব এইচ আর ডি,
গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া, নিউদিল্লি

(৩)

বাংলার পটশিল্প ও পটুয়াদের সম্পর্কে ইতিপূর্বে অনেক লেখা হয়েছে। ড. দীপককুমার বড় পণ্ডা সেই ধারাটি অক্ষুণ্ণ রেখেই নতুন তথ্য, বর্ণনা ও ব্যাখ্যা যোগ করেছেন। তাঁর ক্ষেত্রসমীক্ষার পরিবধিও বেশ বিস্তৃত। ফলে অনেক পূর্বতন ব্যাখ্যার সীমা ছাড়িয়ে নতুন কিছু সংবাদ ও ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। তাতে পটকেন্দ্রিক আলোচনায় একটি নতুন মাত্রা যোগ হল বলে মনে হয়।

ডঃ বড় পণ্ডা তাঁর গ্রন্থের অধ্যায়ক্রমে লোকশিল্পের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণীবিভাগ, পটশিল্পের প্রাচীনত্ব, তার শ্রেণীবিভাগ, প্রস্তুতি কৌশল, শিল্পশৈলী ও নন্দনতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে সে শৈলীর মান যেমন আলোচনা করেছেন, তেমনি লক্ষ করেছেন পটচিত্রে বর্ণিত সমাজচিত্র এবং কৌতুকধর্মিতার সূত্রে সমাজের নিন্দনীয় দিকগুলির প্রতি পটকর্তাদের ব্যঙ্গ ও তিরস্কার।

পটকর্তাদের নৃতাত্ত্বিব, সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থানের আলোচনায় তাঁদের পট বা চিত্রের 'দর্শন' সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা হয়। অর্থাৎ পটুয়াদের বিশিষ্ট জীবনবোধ ও নান্দনিক চেতনা সম্পর্কে আমরা অবহিত হতে পারি। লোকসংস্কৃতির আলোচনা যে শুধু বর্ণনাত্মক নয়, তার অতিরিক্ত, অর্থাৎ নান্দনিক-রূপতাত্ত্বিক বিচার ও সামাজিক পরিবেশ ব্যাখ্যার সমন্বয়, তা এই গ্রন্থে প্রাধান্য পেয়েছে। আবার পটশিল্প যে চিত্র শিল্পের পরম্পরার একটি স্তর, সে আলোচনাও রয়েছে।

পট পটুয়া ও পটের গান সম্পর্কে এই পরিশ্রমী, তথ্যনিষ্ঠ বিস্তৃত আলোচনা, পটশিল্প, পটুয়াদের জীবন, তাঁদের সামাজিক অবস্থান, পটের গান, ইত্যাদি প্রসঙ্গে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রয়াস। লোকসংস্কৃতির চর্চায় এই গবেষণা গ্রন্থটি একটি মূল্যবান সংযোজন রূপে বিবেচিত হওয়া উচিত।

আশাকরি এই তরুণ গবেষকের এই মূল্যবান কাজটি গবেষক ও পাঠকমহলে সাদরে গৃহীত হবে।

সৌমেন সেন

অধিকর্তা
লোকসংস্কৃতি গবেষণা ও সংগ্রহালয় প্রকল্প,
উত্তর-পূর্ব পার্বত্য বিশ্ববিদ্যালয়।